রঙ-বেরঙ

রঙ-বেরঙ

পলাশ বরন পাল
শেখর গুহ

জ্ঞান বিচিত্রা প্রকাশনী
১১ জগন্নাথবাড়ি রোড, আগরতলা-৭৯৯০০১

Rong-berong

Palash Baran Pal & Shekhar Guha

প্রথম প্রকাশ

কলকাতা বইমেলা, জানুয়ারি ২০১০

প্রকাশক

দেবানন্দ দাম

জ্ঞানবিচিত্রা প্রকাশনী

১১ জগন্নাথবাড়ি রোড, আগরতলা-৭৯৯০০১

ফোন : (০৩৮১) ২৩২ ৩৭৮১ / ২৩২ ৬৩৪২

প্রচ্ছদ

শেখর গুহ

বর্ণবিন্যাস

লেখকদ্বয়

মুদ্রণ

এস ডি প্রিন্টার্স

৩২এ পটুয়াটোলা লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

কলকাতা অফিস ও বিক্রয়কেন্দ্র

জ্ঞান বিচিত্রা

১৬ ডাঃ কার্তিক বোস স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০০৯

ফোন : (০৩৩) ২৩৬০ ৪৯৮১

ISBN : 978-81-8266-184-4

একশো আশি টাকা

সুদেষ্ণা, রাহুল ও রাকেশ-কে : শেখর

অধ্যাপক দীপংকর লাহিড়ী, আমার দীপংকর কাকু-কে : পলাশ

ভূমিকা

খুব ছোটো বয়স থেকেই আমরা বুঝতে পারি যে এ দুনিয়া বড়োই রঙিন। ঘন নীল আকাশ, সেখানে ইতস্তত ভেসে বেড়ায় সাদা বা কালো মেঘ, সবুজ ঘাসে ছাওয়া জমিতে সবুজ পাতায় ভরা গাছ, তাতে লাল-হলুদ-নীল রঙের কতো না ফুল-ফল, পশু-পাখি পোকা-মাকড়ের গা থেকে শুরু করে মানুষের পোশাকেও কতো বিচিত্র রঙ এ সব দেখতে দেখতে আমাদের চোখ এতোই অভ্যস্ত হয়ে যায় যে কীসের জন্য বিভিন্ন জিনিশের বিভিন্ন রঙ তা নিয়ে সচরাচর আমরা মাথাই ঘামাই না। কিন্তু বিজ্ঞানীদের কাজই হলো সব কিছুর কারণ খুঁজে বার করা। গত তিন-চারশো বছরের চেষ্টায় মানুষ এখন বুঝতে পেরেছে জিনিশের রঙ কোথা থেকে আসে, আর এই রঙ ব্যাপারটাই বা কী। এই বইয়ে আমরা রঙের বৈচিত্র্য নিয়ে আলোচনা করবো, যথাসাধ্য চেষ্টা করবো সহজ ভাষায় বিষয়টির ওপর আলোকপাত করতে।

একটা জিনিশের রঙ কী, তা অবশ্যই নির্ভর করবে জিনিশটা কী দিয়ে গড়া তার ওপর। কিন্তু সেটাই সব নয়। কোন আলোতে জিনিশটা দেখা হচ্ছে, সেটাও জিনিশের রঙ পাল্টে দিতে পারে কেননা আমরা সব কিছু দেখতে পাই আলোর সাহায্যে, আর আলোর নিজেরই একটা রঙ আছে।

তা ছাড়াও, জিনিশটা কে দেখছে তার ওপরেও জিনিশটার রঙ খানিকটা নির্ভর করে বইকি! মানুষ একভাবে দেখে, অন্য প্রাণী অন্য রকম। মানুষের চোখের গঠন এমন যে তা বিভিন্ন রঙের তফাত ধরতে পারে। কিন্তু সব মানুষের চোখের গঠনও এক রকম হয় না চোখে তেমন গণ্ডগোল থাকলে সব রঙ আলাদা করে বোঝা যায় না। অর্থাৎ রঙ বিষয়টি বুঝতে শুধু যে পদার্থবিদ্যার প্রয়োজন তা নয় --- রসায়ন, জীববিদ্যা, শারীরবিদ্যা, এমনকি মনোবিজ্ঞানেরও খানিকটা আলোচনা কাজে লাগাতে হয়।

এই জটিল ও বিচিত্র বিষয়টি সম্পর্কে খানিকটা বোধ তৈরি করাই এই বইয়ের উদ্দেশ্য। আমরা খুব গভীরে যাওয়ার চেষ্টা করিনি। কিছুটা ধারণা তৈরি করে দেওয়া, সেই সঙ্গে বিজ্ঞানের প্রাসঙ্গিক বিষয়গুলো সম্পর্কেও কিছুটা পরিচয় ঘটানো --- এই ছিলো আমাদের লক্ষ্য। ইশকুলে সাত-আট ক্লাস পর্যন্ত যে বিজ্ঞান পড়ানো হয়,

তার চেয়ে খুব বেশি বিজ্ঞানের পূর্বপ্রস্তুতি না থাকলেও চলবে। দরকার শুধু বিজ্ঞান-অনুসন্ধিৎসু মন।

না, শুধু বিজ্ঞানই বা কেন? তার সঙ্গে প্রযুক্তির কথা তো আসবেই, কারণ প্রকৃতিতে নানা রকমের রঙ দেখেই তো আমরা তৃপ্ত নই, সেই সব রঙ কী করে নিজেরা বানিয়ে নিতে পারি, বা ধরে রাখতে পারি, সে ব্যাপারেও মানুষের আগ্রহ চিরন্তন। কিন্তু সেখানেও শেষ নয়। রঙের সঙ্গে জড়িয়ে আছে আমাদের ভালো-মন্দ, পছন্দ-অপছন্দ, সুন্দর-অসুন্দর ইত্যাদি নানা জিনিশের ধারণাও। অতএব রঙের কথা ভাবতে বসলে সে সব কথাও বলতে হবে বৈকি! সব মিলিয়ে তাই এ এক বিচিত্র ও বিপুল বিষয়।

গোটা বইয়েই আমরা চেষ্টা করেছি যতোদূর সম্ভব সাম্প্রতিকতম তথ্য পরিবেশন করার। কিন্তু শেষ কথা তো বলা যায় না কোনো কিছুর ক্ষেত্রেই — প্রতি বছরেই কতো রকম অগ্রগতি আমাদের জ্ঞানের পরিধি বাড়িয়ে দিচ্ছে। এই যেমন, "আলোকচিত্রের রঙ" অধ্যায়ে উল্লিখিত হয়েছে উইলার্ড বয়েল ও জর্জ স্মিথ-এর সিসিডি ক্যামেরা আবিষ্কারের কথা। তাঁরা যে এ জন্য ২০০৯-এর নোবেল পুরস্কার জয় করলেন পদার্থবিদ্যায়, সে কথা বলা হয়নি, কারণ সে পুরস্কার ঘোষণার কয়েক মাস আগেই বইটির পাণ্ডুলিপি লেখা শেষ করেছি আমরা। এ রকম নতুন নতুন যা কিছু ঘটছে, সে সম্বন্ধে আগ্রহ জাগাতেও এ বইটি সহায়ক হবে আশা করি।

● — ○ — ● — ○ — ●

বইটির কয়েকটি অধ্যায়ের প্রাথমিক রূপ প্রকাশিত হয়েছিলো কিছু পত্রপত্রিকায়। সেই পর্যায়ে প্রতিটি লেখাকে স্বয়ংসম্পূর্ণ রাখার একটা তাগিদ ছিলো। একসঙ্গে গ্রথিত করতে গেলে এর ফলে কিছু পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। পূর্বপ্রকাশিত সমস্ত লেখারই পরিমার্জন করা হয়েছে, কিন্তু বিষয়বস্তুর পুনরাবৃত্তি এড়াবার চেষ্টা করিনি আমরা। বরং প্রতিটি অধ্যায়কে মোটামুটি স্বয়ংসম্পূর্ণ রাখার দিকেই লক্ষ্য রেখেছি, কারণ আমাদের মনে হয়েছে, এতে পাঠকের সুবিধেই হবে।

এ বইয়ের ছবিগুলি প্রায় সবই পলাশ বরন পালের হাতে আঁকা বা গড়া। প্রতিটি অধ্যায়ের শেষে যে সব ছড়া আছে, সেগুলি সবই শেখর গুহর লেখা। যে হরফ ব্যবহৃত হয়েছে, তা পলাশ বরন পালের উদ্ভাবন। এবং গোটা বইটাই আমাদের নিজেদের হাতে কম্পিউটারে লেখা। ফলে আমাদের ইচ্ছেমতো বানানও ব্যবহার করা গেছে। ঘোষিত নানা বানানবিধির তুলনায় আমরা খানিকটা বেশি ও-কারযুক্ত বানানের পক্ষপাতী। আমরা 'যতো' 'ততো' 'কতো' ইত্যাদি লিখি, ক্রিয়াপদের শেষে যেখানে 'ও' উচ্চারণ হয়, সেখানেও ও-কার দিই। আমাদের ব্যবহৃত হরফে 'অ্যা' উচ্চারণ বোঝাবার জন্য একটি চিহ্ন আছে — পেটকাটা 'এ' (এবং পেটকাটা এ-কার) — সেগুলোও আমরা ব্যবহার করেছি।

দু-একটি প্রসঙ্গ নিয়ে বিমান নাথের সঙ্গে আলোচনায় আমরা উপকৃত হয়েছি। বইটি প্রকাশ করতে সম্মত হয়ে দেবানন্দ দাম আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। বইয়ের একটি পূর্বতর বয়ান আগাগোড়া পড়ে অনেক মূল্যবান মন্তব্য করেছেন দিলীপ চৌধুরী। তাঁর কাছেও আমরা আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ।

পলাশ বরন পাল
শেখর গুহ

সেপ্টেম্বর ২০০৯

সূচিপত্র

ছবির তালিকা

(যে সব ছবির পাশে "রঙিন" লেখা আছে, সেগুলো লেখার মধ্যে যেখানে পরিবেশিত হয়েছে সাদা-কালো রঙে, তার পৃষ্ঠাসংখ্যা এখানে দেওয়া হয়েছে। রঙিন ছবিগুলো সবই সন্নিবেশিত হয়েছে আলাদা কয়েকটি বিশেষ পাতায়, ৪৮ ও ৪৯ পৃষ্ঠার মাঝখানে।)

ছকের তালিকা

রঙ-বেরঙ	রঙ-বেরঙ	রঙ বেরঙ	রঙ-বেরঙ	রঙ-বেরঙ	রঙ-বেরঙ
রঙ-বেরঙ	রঙ-বেরঙ	রঙ-বেবঙ	বঙ-বেরঙ	রঙ-বেরঙ	রঙ-বেরঙ
রঙ-বেরঙ	রঙ-বেরঙ	রঙ-বেরঙ	বঙ-বেরঙ	রঙ-বেরঙ	রঙ-বেরঙ
রঙ-বেরঙ	রঙ-বেরঙ	রঙ-বেরঙ	বঙ-বেরঙ	রঙ-বেবঙ	বঙ-বেরঙ
বঙ-বেরঙ	বঙ-বেরঙ	রঙ-বেরঙ	বঙ বেরঙ	রঙ-বেরঙ	রঙ-বেরঙ
রঙ-বেরঙ	রঙ-বেরঙ	রঙ-বেবঙ	বঙ-বেরঙ	বঙ-বেবঙ	রঙ-বেরঙ
রঙ-বেরঙ	রঙ-বেরঙ	বঙ-বেরঙ	রঙ-বেরঙ	বঙ বেবঙ	রঙ-বেরঙ
রঙ-বেরঙ	রঙ বেবঙ	রঙ-বেরঙ	রঙ বেরঙ	বঙ-বেরঙ	বঙ-বেরঙ
রঙ-বেরঙ	রঙ-বেরঙ	রঙ-বেরঙ	বঙ-বেরঙ	রঙ-বেবঙ	রঙ-বেরঙ
রঙ-বেরঙ	বঙ বেবঙ	বঙ-বেবঙ	বঙ-বেবঙ	রঙ-বেরঙ	রঙ-বেরঙ
বঙ-বেবঙ	বঙ বেরঙ	বঙ-বেবঙ	রঙ-বেরঙ	রঙ-বেবঙ	রঙ-বেবঙ
রঙ-বেবঙ	রঙ-বেরঙ	**রঙ-বেরঙ**		রঙ-বেরঙ	রঙ-বেরঙ
রঙ-বেবঙ	বঙ-বেরঙ			রঙ-বেবঙ	বঙ-বেরঙ
বঙ-বেরঙ	বঙ-বেরঙ	রঙ-বেবঙ	বঙ-বেবঙ	বঙ-বেরঙ	বঙ-বেরঙ
রঙ-বেবঙ	বঙ-বেরঙ	রঙ বেবঙ	বঙ-বেরঙ	রঙ-বেরঙ	রঙ-বেরঙ
রঙ-বেবঙ	বঙ-বেবঙ	বঙ-বেরঙ	বঙ-বেরঙ	রঙ-বেরঙ	রঙ-বেরঙ
রঙ-বেরঙ	রঙ বেরঙ	রঙ-বেবঙ	রঙ-বেরঙ	বঙ-বেরঙ	বঙ-বেরঙ
রঙ-বেরঙ	রঙ-বেরঙ	বঙ-বেরঙ	বঙ-বেরঙ	রঙ-বেরঙ	বঙ-বেরঙ
রঙ-বেরঙ	রঙ-বেরঙ	বঙ-বেবঙ	বঙ-বেরঙ	বঙ-বেরঙ	রঙ-বেরঙ
রঙ-বেরঙ	রঙ-বেরঙ	রঙ-বেরঙ	রঙ-বেরঙ	রঙ-বেরঙ	রঙ-বেরঙ
রঙ-বেরঙ	রঙ-বেরঙ	রঙ-বেরঙ	রঙ-বেবঙ	রঙ-বেরঙ	বঙ-বেরঙ
রঙ-বেরঙ	রঙ-বেরঙ	রঙ-বেরঙ	রঙ-বেরঙ	রঙ-বেরঙ	রঙ-বেরঙ
রঙ-বেরঙ	রঙ-বেরঙ	রঙ-বেরঙ	রঙ-বেরঙ	রঙ-বেরঙ	রঙ-বেরঙ
রঙ-বেরঙ	রঙ-বেরঙ	রঙ-বেরঙ	রঙ-বেরঙ	রঙ-বেরঙ	রঙ-বেরঙ

১ : কাকে বলে রঙ

শেখর গুহ

একেকটা খাবার খেতে একেক রকমের। চিনি মিষ্টি, লঙ্কা ঝাল, লেবু টক আর নিম যে তেতো — নানা জিনিষ খাওয়ার অভিজ্ঞতায় আমরা সকলেই তা জানি। কিন্তু 'স্বাদ কাকে বলে' সে প্রশ্ন করলে অল্প কথায় সহজ ভাবে তার উত্তর দেওয়া হয়তো অনেকের কাছেই মুশকিল মনে হবে। আবার যদি প্রশ্ন করা হয়, বাঁশির আওয়াজ আর ঢাকের আওয়াজের মধ্যে তফাতটা ঠিক কীসের, সেটার উত্তর দিতে গেলেও বোঝাতে হবে আওয়াজ বলতে কী বোঝায় -- যে শব্দ আমরা কানে শুনি সেটা কীভাবে সৃষ্টি হয় এবং তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্যগুলিই বা কী, ইত্যাদি নানা কথা। ঠিক তেমনই, 'রঙ' বলতে কী বোঝাচ্ছে, মানে এক রঙের সঙ্গে অন্য একটা রঙের তফাতটা আসছে কেন এবং কোথা থেকে, তা বুঝতে গেলে আলো সম্পর্কে একটু বিশদ আলোচনায় যাওয়া দরকার।

লাল, হলুদ, কমলা, নীল, সাদা, কালো ইত্যাদি নানা রঙে ভরা আমাদের দুনিয়া। একটা লাল জিনিষ যখন আমরা দেখি তখন সে জিনিষটার গা থেকে লাল রঙের আলো এসে পড়ে আমাদের চোখে। তেমনই হয় নীল, সবুজ ইত্যাদি অন্য নানা রঙের জিনিশের বেলাতেও। আর কোনো জিনিশের দিকে তাকালে যদি জিনিষটার থেকে কোনোই আলো আমাদের চোখে না আসে, তখন সেটা আমাদের চোখে কালো দেখায়। অর্থাৎ সত্যি বলতে 'কালো' কোনো রঙ নয় — কালো মানে হলো অন্য সব রঙের অভাব। কিন্তু সাধারণ কথায়, আর ছবি আঁকার রঙের বাক্সেও কালোকে একটা রঙ বলেই ধরা হয়। সেই প্রথা অনুযায়ী আমরা এখানেও মাঝেমাঝে কালোকেও রঙের পর্যায়েই ফেলবো।

আর সাদার বেলা কী হবে? লাল, নীল, সবুজের মতো সেটাও কি একটা রঙ?

সেটা বুঝতে গেলে আমাদের ফিরে যেতে হবে ১৬৭৮ সালে। ইংল্যান্ডের আইজ্যাক নিউটন ওই সময় নাগাদ একটা পরীক্ষা করে দেখিয়েছিলেন যে সূর্যের সাদা রঙ আসলে লাল থেকে বেগুনি অবধি নানান রঙের আলোর একটি খিচুড়ি মিশ্রণ। সব রঙগুলি যখন
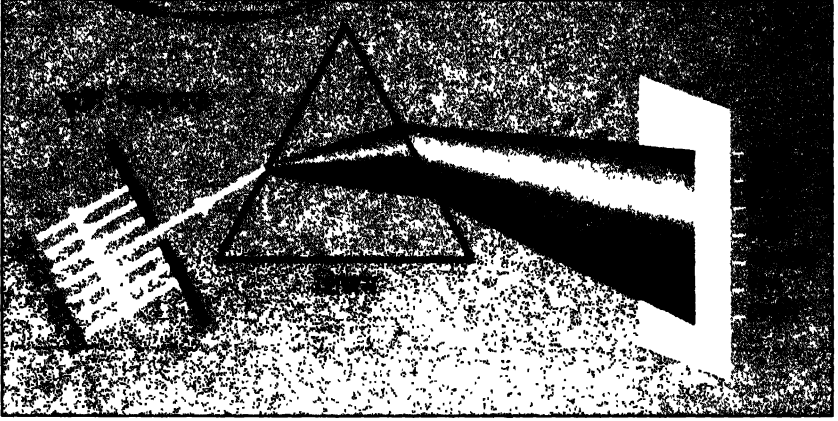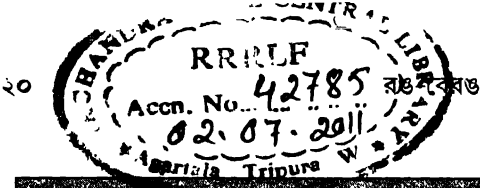
১ নং ছবি॥ *নিউটনের পরীক্ষা সাদা আলোতে নানা রঙ। (এ ছবিটি রঙে দেখা যাবে ৪৮ ও ৪৯ পৃষ্ঠার মাঝখানে রঙিন ছবির জন্য নির্ধারিত আলাদা পাতায়।)*

একসঙ্গে থাকে তখন আমাদের চোখে তা সাদা দেখায়। কিন্তু একটা তিনকোণা কাচের প্রিজম দিয়ে সাদা আলোকে আলাদা করা যায় নানা রঙে। নিউটনের সেই বিখ্যাত পরীক্ষাটা ১ নম্বর ছবি দিয়ে আমরা বুঝতে পারি। মনে করা যাক ছবির ত্রিভুজটা দিয়ে বোঝানো হচ্ছে কাচের প্রিজম, আর তার উপরে এক দিক থেকে এসে পড়ছে সাদা আলোর রশ্মি। প্রিজমটাতে পড়ে সাদা আলোর রশ্মি যে শুধু বেঁকে যায় তাই নয় -- তা আবার ভাগও হয়ে যায় লাল, কমলা, হলুদ, সবুজ, আকাশি, নীল আর বেগুনি রঙে। যে দিক থেকে সাদা আলোটা আসছে তার উল্টোদিকে একটা সাদা পর্দা বা শক্ত কাগজ রাখলেই তার উপরে সে সব রঙগুলি দেখা যায়।

রঙগুলি আলাদা আলাদা করে বেশ ভালোই বোঝা গেলেও তাদের সীমানাগুলি কিন্তু খুব স্পষ্ট হয় না কোথায় যে লাল একদম শেষ হয়ে কমলার শুরু, অথবা কোথায় সবুজ শেষ আর আকাশি শুরু তা একেবারে নিশ্চিত করে বলা মুশকিল একটা রঙ যেন পরের রঙটাতে মিশে যায়। কিন্তু পর্দাটার গায়ে যেখানে রঙিন আলো এসে পড়েছে সেখানে যথেষ্ট ছোটো একটা ফুটো করলে দেখা যাবে যে ফুটোটা দিয়ে বেরিয়ে আসা আলোটা মোটামুটি একই রঙের। মনে করা যাক যেখানে পর্দার গায়ে লাল আলো পড়েছে সে জায়গায় ফুটোটা করা হয়েছে, ২ নম্বর ছবির মতো। পর্দার অন্যদিকে আলোর যে রশ্মিটা দেখা যাবে সেটা তখন হবে শুধুই লাল। সে রশ্মিটাকে আবার আর একটা প্রিজমের উপরে ফেলে নিউটন দেখেছিলেন যে সে লালটা আবার অন্য নানা রঙে ভাগ
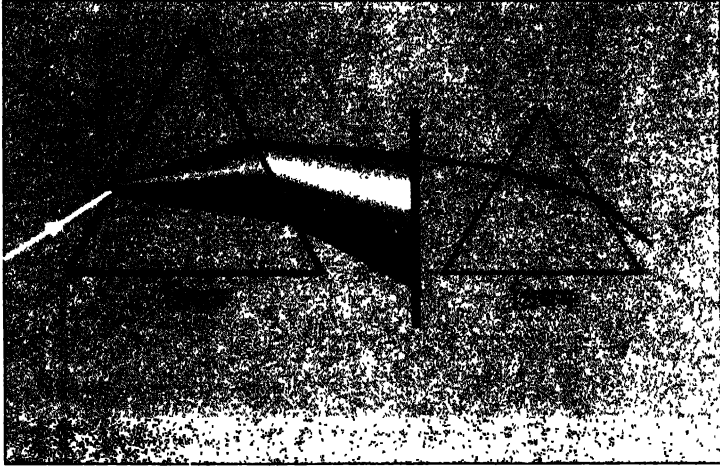
২ নং ছবি॥ *একটা রঙের আলো দ্বিতীয় প্রিজমের উপর ফেললে তা বেঁকবে, কিন্তু আর নতুন রঙে ভাঙবে না। (এ ছবিটি রঙে দেখা যাবে ৪৮ ও ৪৯ পৃষ্ঠার মাঝখানে রঙিন ছবির জন্য নির্ধারিত আলাদা পাতায়।)*

হয়ে যায় না, লালটা লালই থাকে। তেমনি বর্ণালির অন্য রঙগুলিও একবার সাদা থেকে ভাগ হওয়ার পরে আবার অন্য নানা রঙে ভাগ হয়ে যায় না। অবশ্য মনে রাখতে হবে যে তার জন্য পর্দার ওই ফুটোটা যথেষ্ট ছোটো হওয়া দরকার। ফুটোটা বড়ো হলে তো তার মধ্যে দিয়ে নানান রঙই বেরিয়ে আসতে পারবে তাই সেগুলি দ্বিতীয় প্রিজম দিয়ে আবার আলাদা করা যাবে।

আরো একটা পরীক্ষা নিউটন করেছিলেন। সাদা আলোকে যখন একটা প্রিজম দিয়ে নানা রঙে ভাগ করে পর্দার উপর দেখানো গেলো, তখন পর্দাটা সরিয়ে সেখানে উল্টো করে আর একটা প্রিজম রেখে তিনি দেখালেন যে দ্বিতীয় প্রিজমটা ওই সব রঙগুলিকে একসঙ্গে মিশিয়ে আবার সাদা আলোতে পাল্টে দেয়। ৩ নম্বর ছবিতে এটা দেখানো হয়েছে।

এই পরীক্ষাগুলি নিঃসন্দেহে প্রমাণ করলো যে প্রিজমটা বা প্রিজমগুলি রঙ তৈরি করে না -- কেবল সাদা আলোর মধ্যে থাকা বিভিন্ন রঙকে আলাদা করে, অথবা আলাদা নানা রঙকে মিশিয়ে সাদা আলো ফিরিয়ে দেয়। সাদা আলোর ভিতরে লাল থেকে বেগুনি এই রঙের সমাহারকে বলা হয় আলোর বর্ণালি।

আগে জেনেছিলাম, কালো হলো রঙের অভাব। এখন জানলাম, সাদা হলো সব রঙের সমাবেশ। তাহলে আমরা আর একটু এগোলাম। কিন্তু রঙ কাকে বলে সে প্রশ্নের
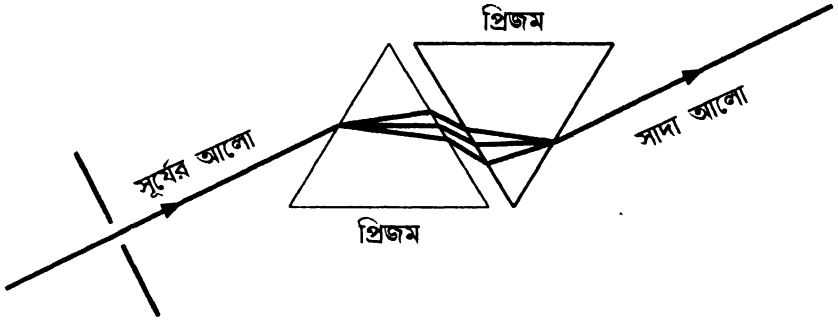
৩ নং ছবি ॥ *দুটি প্রিজম এভাবে ধরলে দুটোর ফলাফলে কাটাকুটি হয়ে শেষ পর্যন্ত সাদা আলোই বেরিয়ে আসছে।*

উত্তরটা তো এখনো দেওয়া হলো না। লাল রঙের সঙ্গে নীল রঙের তফাতটা কী? তা বোঝার জন্য আলোর চালচরিত্র বিষয়ে আরো একটু জানা দরকার।

আলো কী দিয়ে গড়া সে প্রশ্নের উত্তর মানুষ অন্তত দু হাজার বছর ধরে খুঁজেছে। প্রাচীন গ্রিস আর মধ্যযুগের আরবদেশে ও ইরানে এ নিয়ে অনেক বিজ্ঞানী চিন্তা করেছেন। এখন থেকে সাড়ে তিনশো বছরেরও আগে ইউরোপের নানা দেশের বিজ্ঞানীরা বুঝলেন যে আলোর গতিবিধি হলো ঢেউয়ের মতো। ফরাসীদেশে রেনে দেকার্ত (১৬৩৭ খ্রিষ্টাব্দে লেখা বইয়ে), ইংল্যান্ডে রবার্ট হুক (১৬৬০-এর দশকে), আর হল্যান্ডে খ্রিস্টিয়ান হাইগেন্স (১৬৯৩ খ্রিষ্টাব্দে) আলোর এই 'তরঙ্গতত্ত্ব'-কে সমর্থন করেছিলেন।

সব বিজ্ঞানী কিন্তু এই 'তরঙ্গতত্ত্ব' সহজে মেনে নেননি। তার একটা বড়ো কারণ হলো আইজ্যাক নিউটনের প্রভাব। নিউটন মনে করেছিলেন আলোর গতি ঢেউয়ের মতো নয় — ঝাঁকে ঝাঁকে ছুঁড়ে দেওয়া ঢিল বা কণার মতো। এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় আলোর রশ্মি যায় একটা সরল রেখা ধরে, তাই নিউটনের কাছে ওই 'কণাতত্ত্ব'-টাই ঠিক বলে মনে হয়েছিলো।

কিন্তু ১৮০১ সালে ইংল্যান্ডের আর এক অসামান্য মেধাবী ও বহুবিষয়ে কীর্তিমান বিজ্ঞানী টমাস ইয়াং বিশদ পরীক্ষানিরীক্ষা চালিয়ে দেখালেন যে সত্যিই আলোর নানা ধর্ম ঢেউয়ের মতোই। পুকুরের নিস্তরঙ্গ জলে একটা ঢিল ফেললে যেমন গোল ঢেউ ছড়িয়ে আসে, আলোর প্রকৃতিও যেন তেমনই। সব ঢেউয়েরই নিজস্ব কয়েকটা বৈশিষ্ট্য আছে। যেমন একটা বৈশিষ্ট্য হলো ঢেউটার গতিবেগ — মানে একটা নির্দিষ্ট সময়ে
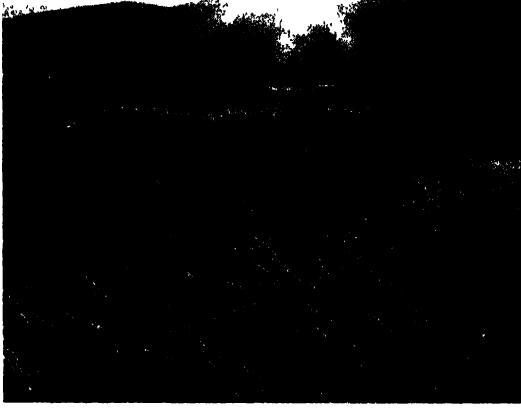
৪ নং ছবি॥ *ধানখেতে ঢেউ।*

ঢেউটা কতোদূর অবধি যেতে পারে। তেমনি ঢেউয়ের আর একটা বৈশিষ্ট্য হলো সেটার তরঙ্গদৈর্ঘ্য।

তরঙ্গদৈর্ঘ্য মানে কী? পুকুরের জলের উপর যখন হাওয়া বয় তখন জলটা আর 'নিস্তরঙ্গ' থাকে না বাতাসের মৃদু আলোড়নে জলের উপর বয়ে চলে ছোটো ছোটো ঢেউ। কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের লেখায় আমরা পড়েছি 'এমন ধানের উপর ঢেউ খেলে যায় বাতাস কাহার দেশে'। বাতাসে খেলানো এ রকম ঢেউয়ের ছবি তুললে সেটা দেখাবে মোটামুটি ৪ নম্বর ছবির মতো। অর্থাৎ ঢেউয়ের প্রকৃতি হলো উঁচু-নিচু-উঁচু-নিচু হতে হতে এগিয়ে চলা। ঢেউয়ের একটা চূড়া থেকে তার পরের চূড়াটার মধ্যে যে দূরত্ব সেটাই হলো ঢেউটার তরঙ্গদৈর্ঘ্য, যেমন দেখানো হয়েছে ৫ নম্বর ছবিতে।

আলোর প্রকৃতি যে নিঃসন্দেহে ঢেউয়ের মতো ইয়াং শুধু সেটা দেখিয়েই ক্ষান্ত হলেন না, আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য কতো বড়ো, সেটাও তিনিই প্রথম মেপে দেখালেন। নিউটনের প্রিজমের পরীক্ষাতে সেই যে সাদা আলোকে নানা রঙে ভাগ করা হয়েছিলো, ইয়াং মেপে দেখালেন যে সেই এক একটা রঙের আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য এক এক রকম — অর্থাৎ সাদা আলোতে মিশে রয়েছে নানান তরঙ্গদৈর্ঘ্যের ঢেউ। সব রঙের আলোর ঢেউয়ের তরঙ্গদৈর্ঘ্যই কিন্তু আমাদের ধরা-ছোঁয়ার জিনিশের তুলনায় ঢের ঢের ছোটো। কতোটা ছোটো, এবারে তা একটু কল্পনা করা যাক।

একজন পূর্ণবয়স্ক মানুষের হাত মোটামুটি এক মিটার মতো লম্বা। হাতের আঙুল চওড়ায় তার তুলনায় একশো ভাগ মতো ছোটো — অর্থাৎ এক সেন্টিমিটারের কাছাকাছি। এক সেন্টিমিটারের দশ হাজার ভাগের এক ভাগ হলো এক মাইক্রোমিটার — অর্থাৎ এক মিটারের দশ লক্ষ ভাগের এক ভাগ। খুব ছোটো মাপ বোঝাতে আমরা

৫ নং ছবি॥ *জল বা অন্য কোনো বস্তুর মধ্যে দিয়ে যখন ঢেউ এগিয়ে যায়, তখন জলের বস্তু আন্দোলিত হয় সেই ঢেউয়ের আড়াআড়ি দিকে। ছবিতে মোটা দাগ দিয়ে দেখানো হয়েছে একটি ঢেউ। একটু পরে সেই ঢেউটা এগিয়ে গেছে, তার পরিবর্তিত অবস্থান দেখানো হয়েছে সরু দাগ দিয়ে। এই পরিবর্তনটি সাধিত হয়েছে কীভাবে? তীরচিহ্ন-দেওয়া দাগ দিয়ে দেখানো হয়েছে, 'ক' বিন্দুর জল উঠে গেছে, 'খ' বিন্দুর জল নেমে গেছে। ঢেউ কিন্তু নিচে বা উপরে যায়নি, গেছে ডানদিকে।*

বলে থাকি 'এক চুলের মতো'। বাসে ট্রামে খুব ভিড় হলে একটু বাড়িয়ে বলি, 'এক চুলও জায়গা নেই'। সাধারণত মানুষের মাথার চুল ২০ থেকে ২০০ মাইক্রোমিটার মতো মোটা হয়। বয়স্ক মানুষদের চুল যখন পাতলা হয়ে আসে, তখন তা মোটামুটি ওই ২০ মাইক্রোমিটার মতো হয়, সুস্থ সতেজ চুল তার দশ গুণ পর্যন্ত মোটা হতে পারে। বয়স্ক মানুষের পাতলা সূক্ষ্ম চুলেরও চল্লিশ ভাগের এক ভাগ যতোটা মোটা, আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য হলো তার কাছাকাছি --- অর্থাৎ আধ মাইক্রোমিটারের আশেপাশে।

এক মাইক্রোমিটারের ১০০০ ভাগের ১ ভাগকে বলা হয় ১ ন্যানোমিটার। আধ মাইক্রোমিটার মানে তাহলে ৫০০ ন্যানোমিটার। ন্যানোমিটারের হিসাবে মানুষের চোখ যে আলো দেখতে পায় তাদের তরঙ্গদৈর্ঘ্য মোটামুটি ৪০০ থেকে ৭০০ ন্যানোমিটার। ৪০০ থেকে ৪৫০ ন্যানোমিটারের আলোর রঙ আমরা দেখি বেগুনি। ৪৫০ থেকে ৫০০ ন্যানোমিটার দেখায় নীল আর আকাশি। ৫০০ থেকে ৫৭৫ লাগে সবুজ। ৫৭৫ থেকে ৫৯০ ন্যানোমিটার পর্যন্ত হলুদ। ৫৯০ থেকে ৬২০ ন্যানোমিটার অবধি কমলা, আর ৬২০ থেকে ৭০০ ন্যানোমিটার পর্যন্ত লাল। রঙের এই বাহার দেখানো হয়েছে ৬ নম্বর ছবিতে। এই এতো রকমের রঙ সব একসাথে মিশে থাকলে সেটা দেখায় সাদা। আর যেখানে কোনো রঙই নেই, আলোর সেই অনুপস্থিতিটা আমাদের চোখ দেখে কালো 'রঙ' হিসেবে।

একটা কথা বোধহয় এইখানে বলে নেওয়া উচিত : আমরা বলছি, দৃশ্যমান আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্যের পরিধি হলো ৪০০ থেকে ৭০০ ন্যানোমিটার। মোটামুটি কাজ চালানোর জন্য সেটা ঠিকই, এবং অনেক বিজ্ঞানের বইতেও সেটাই লেখা হয়। কিন্তু আন্তর্জাতিক এক কমিশন (Commission Internationale de l'Éclairage, সংক্ষেপে CIE) মানুষের চোখের সাড়া থেকে স্থির করেছে যে দৃশ্যমান আলোর

তরঙ্গদৈর্ঘ্যগুলি পড়ে ৩৮০ এবং ৭৮০ ন্যানোমিটার সীমানার মধ্যে। কিন্তু ৪০০ ন্যানোমিটারের চেয়ে ছোটো বা ৭০০-র চেয়ে বড়ো তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলো মানুষের চোখে এতোই কম সাড়া জাগায় যে তা আর ধর্তব্যের মধ্যেই পড়ে না। এ বইতে আমরা তাই মনে রাখার সুবিধার জন্য ৪০০ থেকে ৭০০, এই চলতি মতটাই ব্যবহার করেছি।

৪০০ থেকে ৭০০ ন্যানোমিটার পরিধির বাইরে পড়া তরঙ্গদৈর্ঘ্যের ঢেউ মানুষের চোখে সাড়া জাগায় না বটে, কিন্তু তা বলে সে রকম ঢেউ নেই তা ভেবে বসলে ভয়ানক ভুল হবে। ৭০০ ন্যানোমিটারের চেয়ে বড়ো তরঙ্গদৈর্ঘ্যের ঢেউকে ফেলা হয় অবলোহিত রশ্মির পর্যায়ে, অন্তত প্রায় ৫০,০০০ ন্যানোমিটার তরঙ্গদৈর্ঘ্য পর্যন্ত। তার চেয়েও বড়ো তরঙ্গদৈর্ঘ্যের ঢেউ পড়ে মাইক্রোওয়েভ ও রেডিও তরঙ্গের দলে।

দৃশ্যমান গণ্ডীর বাইরেও যে আলোর মতো ধর্ম-ওয়ালা তরঙ্গ আছে তা বোঝা গেছিলো স্কটল্যান্ডের পদার্থবিদ জেমস ক্লার্ক ম্যাক্সওয়েলের তত্ব থেকে। বিদ্যুৎ ও চুম্বকের নানা ধর্ম নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষায় যেসব ফল দেখা গেছিলো, ম্যাক্সওয়েল কয়েকটি সমীকরণ দিয়ে সেগুলির মধ্যে সমন্বয় স্থাপন করেন। সেই 'ম্যাক্সওয়েল সমীকরণ'-গুলি থেকে অবধারিত ভাবে দেখা গেলো যে বিদ্যুৎ ও চুম্বকের গতির সঙ্গে জড়িত রয়েছে এক ধরণের তরঙ্গ। বিভিন্ন মাধ্যমে সে তরঙ্গ বিভিন্ন গতিতে চলে — এবং কোনো মাধ্যম ছাড়াও এগিয়ে চলতে পারে। আলোর গতিবেগ কতো তা আগেই মাপা হয়েছিলো। দেখা গেলো যে ম্যাক্সওয়েলের হিসাব করা সে 'তড়িৎ-চুম্বকীয়' তরঙ্গের গতিবেগ আগে মাপা আলোর গতিবেগের সমান। তখন এটাই মেনে নেওয়া হলো যে আলোও মূলত তড়িৎ-চুম্বকীয় তরঙ্গ। বোঝা গেলো মহাশূন্যের বস্তুহীন ফাঁক পেরিয়ে কীভাবে দূরের জ্যোতিষ্ক থেকে আলো পৃথিবীর গায়ে এসে পড়ে। জার্মানির বিজ্ঞানী হাইনরিখ হার্ৎস ১৮৮৭ খ্রিষ্টাব্দে তাঁর পরীক্ষায় তড়িৎ-চুম্বকীয় তরঙ্গের অস্তিত্ব হাতেনাতে প্রমাণ করে ম্যাক্সওয়েলের তড়িৎ-চুম্বকীয় তরঙ্গ-তত্বটা দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত

৬ নং ছবি ॥ *কোন তরঙ্গদৈর্ঘ্যের জন্য কী রঙ আমরা দেখি, তা দেখানো হয়েছে এই ছবিতে। তলায় লেখা সংখ্যাগুলো হচ্ছে ন্যানোমিটারে তরঙ্গের দৈর্ঘ্য। (এ ছবিটি রঙে দেখা যাবে ৪৮ ও ৪৯ পৃষ্ঠার মাঝখানে রঙিন ছবির জন্য নির্ধারিত আলাদা পাতায়।)*

করলেন। হার্ৎসের দেখানো তরঙ্গের দৈর্ঘ্য ছিলো ৪ মিটার মতো — তা পড়ে 'রেডিও' তরঙ্গের আওতায়। ১৮৯০'র দশকে বাঙলার জগদীশচন্দ্র বসু কয়েক মিলিমিটার তরঙ্গদৈর্ঘ্য-ওয়ালা 'মাইক্রোওয়েভ' নিয়ে কাজ করে দেখান যে সে তরঙ্গেরও প্রায় সব ধর্মই চোখেদেখা আলোর মতোন।

যন্ত্রের সাহায্যে সহজেই এই ধরনের রশ্মিকে শনাক্ত করা যায়। আমাদের ঘরে ঘরে যে রেডিও বা টেলিভিশন যন্ত্র থাকে তা সম্প্রচার-কেন্দ্র থেকে পাঠানো অদৃশ্য রেডিও তরঙ্গকেই ধরে। আজকাল হাতে হাতে ঘোরে ক্যামেরা লাগানো টেলিফোন। টেলিভিশনের রিমোট-কন্ট্রোল যন্ত্রও এখন বহুল প্রচলিত। ওই ক্যামেরার দিকে তাক করে সে যন্ত্রটার যেকোনো বোতাম টিপলেই ক্যামেরার পর্দায় দেখা যাবে যে যন্ত্রটা থেকে আলো বেরোচ্ছে — যদিও খালি চোখে সে আলোটা দেখাই যায় না।

অন্যদিকে, ৪০০ ন্যানোমিটারের চেয়ে ছোটো তরঙ্গদৈর্ঘ্যের ঢেউকে বলা হয় অতিবেগুনি রশ্মি। সূর্য থেকে যে আলো আমরা পাই, তার মধ্যে অতিবেগুনি অংশও থাকে। আমাদের চোখ তার সন্ধান না পেলেও আমাদের চামড়া বুঝতে পারে সেই অতিবেগুনির উপস্থিতি। চামড়া শুষে নিতে পারে সেই অদৃশ্য আলো, এবং তাতে চামড়ার ক্ষতি হয়। তরঙ্গদৈর্ঘ্য যদি ১০ ন্যানোমিটারের চেয়েও ছোটো হয়ে যায়, তাহলে সেই রশ্মিকে বলা হয় 'এক্স-রে' বা 'রঞ্জন-রশ্মি'। এই ১০ ন্যানোমিটারেরও হাজার ভাগের এক ভাগ, অর্থাৎ ০.০১ ন্যানোমিটারের চেয়েও ছোটো তরঙ্গদৈর্ঘ্যের রশ্মিরও খোঁজ মেলে পদার্থবিদদের যন্ত্রে। তাকে বলা হয় 'গামা রশ্মি'। এ সব কিছুই আমাদের চোখে ধরা পড়ে না, তাই এদের রঙ কী রকম, সে প্রশ্নও ওঠে না।

তাহলে "রঙ কাকে বলে" এ প্রশ্নের উত্তর শেষমেশ কী দাঁড়াচ্ছে? ৪০০ থেকে ৭০০ ন্যানোমিটারের সীমানার মধ্যে বিভিন্ন তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলো আমাদের চোখে পড়ার ফলে আমাদের মনে যে অনুভূতির সৃষ্টি হয়, তাকেই আমরা বলি রঙ।

কেউ কি জানো কোন জিনিশে গড়া আলোর অঙ্গ?
রঙের ধারা বুঝতে গেলেই আসবে সে প্রসঙ্গ।
দেখিয়ে গেছেন নানান মিঞা --
ম্যাক্সওয়েল, হার্ৎস, বসু, ইয়াং ---
আলো হলো তড়িৎ এবং চুম্বকী তরঙ্গ।

২ : আলো শুষে রঙ

শেখর গুহ, পলাশ বরন পাল

মনে করা যাক ফুটবল খেলা জমে উঠেছে। সজোরে সেন্টার ফরোয়ার্ড বল হাঁকিয়েছে গোলের দিকে। কিন্তু গোলরক্ষকও তৈরি — বলের গতি দেখেই সে বুঝে নিয়েছে যে ওটা ধরা যাবে না। তাই সে কোনোমতে এক পা এগিয়ে দিলো — তার পায়ে লেগে বলটা চলে গেলো অন্যদিকে — গোলটা আর হলো না। একটু পরে বিপক্ষ দল আবার এগিয়ে এলো গোলের কাছে — আবার চেষ্টা হলো গোল দেওয়ার। এবারে কিন্তু বলটা এলো অনেক আস্তে — গোলরক্ষক অনায়াসে লুফে নিলো। তারপর গড়িয়ে ফিরিয়ে দিলো নিজের দলের এক খেলোয়াড়কে। খানিক বাদে তৃতীয় চেষ্টা — আবার বল এলো গোলের কাছে। এবারে গোলরক্ষক নিজেই পা হাঁকালো বলে — যতো জোরে এসেছিলো তার চেয়েও বেশি জোরে বলটা ফিরে গেলো মাঝমাঠে।

রঙের কথা বলতে গিয়ে খেলার মাঠের এইসব ঘটনার অবতারণা করা হলো কেন? তার কারণ যখন কোনো জিনিশের উপর আলো পড়ে, তখন সে জিনিশটার অণু-পরমাণুগুলির সঙ্গে আলোর শক্তির আদানপ্রদান ঘটে অনেকটাই ওই গোলরক্ষকের বল আটকানোর মতো করে। আমাদের ধরা-ছোঁয়ার জগতের সব কিছুই তো অণু-পরমাণু দিয়ে তৈরি, তাই যে কোনো জিনিশের উপরই আলো পড়লে কী হয় তা বুঝতে গেলে আমাদের জানতে হয় জিনিশটার অণু-পরমাণুগুলি ও আলোর মধ্যে কী ধরণের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া চলে।

আলো যখন এক জায়গা থেকে আর এক জায়গাতে যায়, তখন তার গতিবিধি হয় একেবারে ঢেউয়ের মতো — অর্থাৎ সেটা ক্রমাগত বেড়ে-কমে এগিয়ে চলে। কিন্তু সে আলোই যখন কোনো অণু বা পরমাণুর সংস্পর্শে আসে, তখন তার প্রকৃতি হয় ওই জোরহাঁকানো ফুটবলের মতো — অবশ্য যদি ওই ফুটবলটা সাধারণ মাপের চেয়ে বহু বহু কোটিভাগ ছোটো বলে কল্পনা করা যায়। একদিক থেকে আসা বল যেমন গোলরক্ষকের পায়ে বা গায়ে লেগে অন্যদিকে চলে যেতে পারে, তেমনি কোনো অণু বা পরমাণুর উপর একদিক থেকে আলো পড়ে অন্য নানাদিকে ছড়িয়ে যায়। বিজ্ঞানীদের

কাছে এই ঠিকরানোটার গালভরা নাম হলো 'বিক্ষেপণ'। আবার গোলরক্ষক যেমন গোলে তাক করা বল লুফে নিয়ে আটকে রাখতে পারে, তেমনি অণু বা পরমাণুও কোনো কোনো শক্তির আলো শুষে নিতে পারে। এই শুষে নেওয়াটার বৈজ্ঞানিক নাম হলো 'অবশোষণ'। কোনো জিনিশ যদি বিভিন্ন রঙের আলোকে বিভিন্ন পরিমাণে বিক্ষেপণ অথবা অবশোষণ করে তাহলে সেই জিনিশটা সাদা আলোতে রঙিন দেখাবে। প্রায় সব জিনিশেরই রঙ ব্যাখ্যা করা যায় হয় বিক্ষেপণ নয়তো অবশোষণ দিয়ে। তাই এদের কথা এ বইতে এরপর বহুবার আসবে। এখানে আমরা শুধু পরমাণুতে কিভাবে বিভিন্ন রঙের আলোর অবশোষণ ঘটে তার প্রারম্ভিক আলোচনাটা করবো। এখানে কোনো বিশেষ জিনিশের রঙ নিয়ে কিছু বলা হবে না, তাই প্রথমবার পড়ার সময়ে এ আলোচনাটা বাদ দিলেও ক্ষতি নেই।

অণু-পরমাণু বলতে কী বোঝায় তা প্রথমে একটু ঝালিয়ে নেওয়া যাক। আমাদের ধরাছোঁয়ার এই জগৎটার সব বস্তুগুলি আদতে কী দিয়ে গড়া তা নিয়ে বহুদিন ধরে মানুষ চিন্তা করেছে। খ্রিস্টপূর্ব ৪৬০ সালে গ্রিসদেশে জন্মেছিলেন ডেমোক্রিটাস নামে এক দার্শনিক। তিনি প্রস্তাব করেন যে জগতের সব কিছুই 'অ্যাটম' বা 'পরমাণু' নামে অতিক্ষুদ্র কণা দিয়ে তৈরি। ডেমোক্রিটাসের যুক্তিটা ছিলো এইরকম — যেকোনো জিনিশই যদি ক্রমাগত ছোটো থেকে আরো ছোটো অংশে ভাগ করা হতেই থাকে, তাহলে একটা সময় নিশ্চয়ই আসবে যার পরে জিনিশটা আরো ছোটো কোনো অংশে আর ভাগ করা যাবে না। কেননা তা না হলে ছোটো হতে হতে জিনিশটা তো একসময়ে শূন্যেই মিলিয়ে যাবে। সেই শূন্য দিয়ে তো আর কোনোকিছু গড়া যায় না, তাই যেকোনো জিনিশই সে জিনিশটার 'অবিভাজ্য অংশ' বা 'পরমাণু' দিয়ে তৈরি।

অষ্টাদশ শতকে বিজ্ঞানীরা তাঁদের পরীক্ষায় এই 'পরমাণুবাদ'-টার নানান সমর্থন পেলেন। তাঁরা দেখলেন যে সব জিনিশই হাইড্রোজেন, হিলিয়াম, লিথিয়াম, বেরিলিয়াম ইত্যাদি শ-খানেক মৌল পদার্থের পরমাণু দিয়ে তৈরি। সোনা, লোহা, রুপো, তামা, গন্ধক, পারা ইত্যাদি হলো মৌল পদার্থ। বাতাসে মিশে থাকা নাইট্রোজেন, অক্সিজেন, আর্গন ইত্যাদি গ্যাসও মৌল পদার্থের তালিকায় পড়ে। মৌল পদার্থগুলি নানাভাবে মিলে তৈরি করে যৌগ পদার্থ। যেমন, হাইড্রোজেন আর অক্সিজেনের রাসায়নিক মিলনে তৈরি হয় জল, কার্বন আর অক্সিজেন মিলে তৈরি করে কার্বন ডাই-অক্সাইড। জল, কার্বন ডাই-অক্সাইড — এগুলো হলো যৌগ পদার্থ। একটা যৌগ পদার্থ ভাঙতে ভাঙতে গেলে সবচেয়ে ছোটো যে অংশটা পদার্থটার বৈশিষ্ট্য বজায় রাখে সেটাকে বলে পদার্থটার 'অণু'। যে কোনো যৌগ পদার্থের অণুগুলি বিভিন্ন মৌল পদার্থের পরমাণু নির্দিষ্ট সংখ্যায় জুড়ে জুড়ে তৈরি। জলের অণু তৈরি হাইড্রোজেনের দুটি আর অক্সিজেনের একটি পরমাণু জুড়ে। কার্বন ডাই-অক্সাইডের অণুতে থাকে একটি কার্বন ও দুটি অক্সিজেনের পরমাণু। হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন ইত্যাদি মৌল পদার্থের পরমাণুগুলিও দুটো দুটো

১২ · ০৯
১০ · ২০

০

৭ নং ছবি॥ *হাইড্রোজেন পরমাণুতে কী কী শক্তির ইলেকট্রন থাকতে পারে। ওপরের দিকে শক্তিস্তবগুলো খুব ঘেঁষাঘেঁষি করে আছে বলে অনেক লাইন একসঙ্গে মিলে মোটা দেখাচ্ছে। সেখানে আর বিভিন্ন স্তরের শক্তির পরিমাণগুলো লেখা হয়নি।*

করে জুড়ে 'দ্বিপারমাণবিক' অণু তৈরি করে। অণু বা পরমাণুগুলি যে কতো ছোটো তা সাধারণ জিনিশের মাপ দিয়ে অনুমান করা মুশকিল। এক চামচ জলের ওজন মোটামুটি ৫ গ্রাম - তার মধ্যে আঁটতে পারে প্রায় ১৬৭ কোটি কোটি কোটি সংখ্যক জলের অণু!

বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে বিজ্ঞানীরা বুঝতে শুরু করলেন যে পরমাণুগুলি সত্যিকরে ঠিক 'অবিভাজ্য' নয়। পরমাণুর ভিতরে থাকে প্রোটন, নিউট্রন আর ইলেকট্রন নামে আরও ছোটো ছোটো সব কণা। বিভিন্ন জিনিশের পরমাণুতে থাকে বিভিন্ন সংখ্যক ইলেকট্রন। পরমাণুর কেন্দ্রতে প্রোটন ও নিউট্রনগুলি গা ঘেঁষাঘেষি করে থাকে সেখানটার নাম হলো নিউক্লিয়াস। নিউক্লিয়াসকে ঘিরে ঘুরপাক খায় ইলেকট্রনগুলি, অনেকটা যেমন সূর্যকে কেন্দ্র করে ঘুরে চলে গ্রহগুলি। যে কোনো চলমান জিনিশেরই একটা চলার শক্তি থাকে। ঘূর্ণিপাক খাওয়া ইলেকট্রনগুলির সেই শক্তিটা তো থাকেই, তার উপরে থাকে প্রোটনের আকর্ষণে বিদ্যুৎশক্তি। ১৯১৩-সালে ডেনমার্কের বিজ্ঞানী নীলস বোর প্রস্তাব করেন যে পরমাণুতে ইলেকট্রনগুলির শক্তি কেবল নির্দিষ্ট ধাপে ধাপেই বাড়তে পারে। মই বা সিঁড়ির ধাপগুলি যেমন পরপর সমান ব্যবধানে থাকে, পরমাণুর শক্তির ধাপগুলি কিন্তু তেমন সমান ব্যবধানে থাকে না। হাইড্রোজেনের পরমাণু হলো সবচেয়ে সরল -- ওতে আছে কেবল একটিমাত্র প্রোটন আর একটিমাত্র ইলেকট্রন। তাই হাইড্রোজেনের পরমাণুতে ইলেকট্রনের শক্তির ধাপগুলি কী মাপের তা হিসাব করা মোটামুটি সহজ। ৭ নম্বর ছবিতে সাজানো কয়েকটি সরলরেখা দিয়ে শক্তির সেই ধাপগুলি দেখানো হয়েছে।

যে কোনো কিছুই মাপতে গেলে সে মাপটার একটা 'একক' ঠিক করা দরকার। যেমন, দূরত্ব মাপার একক হলো মিটার, ওজন মাপার একক হলো গ্রাম আর সময় মাপার একক হলো সেকেন্ড। শক্তি মাপার জন্য নানান রকম একক ব্যবহার করা হয়। যেমন, খাদ্যের শক্তি মাপার একক হলো ক্যালোরি। পরমাণুতে ইলেকট্রনের শক্তি মাপার জন্য ব্যবহার করা হয় 'ইলেকট্রন-ভোল্ট' নামে একটা একক। হাইড্রোজেনের পরমাণুতে

ইলেকট্রনটা যখন নিউক্লিয়াসের সবচেয়ে কাছের কক্ষপথটায় থাকে, তখন সেটার মোট শক্তি সবচেয়ে কম। ইলেকট্রনটা যখন এইরকম সবচেয়ে কম শক্তির অবস্থায় থাকে তখন পরমাণুটাকে 'নিরুত্তেজিত' বলা হয়। কোনো না কোনো ভাবে পরমাণুটা যদি যথেষ্ট পরিমাণে শক্তি পায়, তাহলে ইলেকট্রনটা লাফ দিয়ে পরের কক্ষপথটাতে, অর্থাৎ পরের শক্তির ধাপটায় চলে আসতে পারে। সেই ধাপটায় ইলেকট্রনটা গেলে বলা হয় যে পরমাণুটা 'প্রথম উত্তেজিত অবস্থা'-য় উঠেছে। হাইড্রোজেনের পরমাণুতে নিরুত্তেজিত অবস্থা আর প্রথম উত্তেজিত অবস্থার মধ্যে ইলেকট্রনটার শক্তির ফারাক হলো ১০ · ২০ ইলেকট্রন-ভোল্ট। আর তার পরের ধাপগুলো? দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ উত্তেজিত অবস্থায় ইলেকট্রনটার শক্তি নিরুত্তেজিত অবস্থার শক্তির চেয়ে যথাক্রমে ১২ · ০৯, ১২ · ৭৫ এবং ১৩ · ০৬ ইলেকট্রন-ভোল্ট বেশি। পরমাণুর এইরকম ধাপে ধাপে শক্তি বাড়ার ধারণাটাকে বলা হয় 'কোয়ান্টাম তত্ত্ব'।

১৯০৫ সালে জার্মানির বিজ্ঞানী আলবার্ট আইনস্টাইন দেখিয়েছিলেন যে আলো যখন কোনো বস্তুর ওপরে পড়ে, তখন সে বস্তুটার অণু বা পরমাণুর সঙ্গে আলোটার এমনভাবে শক্তির আদানপ্রদান চলে যেন ইলেকট্রন বা অন্যান্য বস্তুকণার মতো আলোও কণা দিয়ে তৈরি। মরুভূমির বালিতে বাতাস বইলে ঢেউ ওঠে, কিন্তু খুঁটিয়ে দেখলে বোঝা যায় যে সে ঢেউটা মূলত অজস্র বালুকণা দিয়ে গড়া। অনেকটা তেমনই, আলোর রশ্মিও গড়া অজস্র অবিভাজ্য আলোকণা দিয়ে। প্রতিটি আলোকণা বহন করে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ শক্তি। সে শক্তিটা কী মাপের তা হিসাব করার সূত্রটাও প্রণয়ন করেন আইনস্টাইন। সেই সূত্র অনুযায়ী, কোনো একটা আলোকরশ্মির তরঙ্গদৈর্ঘ্য যতো ন্যানোমিটার, ১২৪০-কে সেই সংখ্যাটা দিয়ে ভাগ দিলে পাওয়া যাবে ইলেকট্রন-ভোল্টের মাপে সে আলোর আলোকণার শক্তির পরিমাণ। অর্থাৎ, ৪০০ ন্যানোমিটার তরঙ্গদৈর্ঘ্যের বেগুনি রঙের আলোর কণার শক্তি হলো ১২৪০ ÷ ৪০০, মানে ৩ · ১০ ইলেকট্রন-ভোল্ট। আবার ৬৫০ ন্যানোমিটার তরঙ্গদৈর্ঘ্যের লাল আলোর কণা বহন করে ১২৪০ ÷ ৬৫০, অর্থাৎ মোটামুটি ১ · ৯১ ইলেকট্রন-ভোল্ট শক্তি। এক্স রশ্মি, বা বাংলায় যার নাম রঞ্জন রশ্মি, তার তরঙ্গদৈর্ঘ্য ১০ ন্যানোমিটার থেকে ০ · ০১ ন্যানোমিটারের মধ্যে, অর্থাৎ তার এক একটি কণার শক্তি মোটামুটি ১২০ থেকে ১২০,০০০ ইলেকট্রন-ভোল্টের মধ্যে। গামা রশ্মির এক একটি কণার শক্তি আরো বেশি। এমন শক্তিশালী কণার নামের সঙ্গে বিখ্যাত এক পালোয়ানের নামের যে মিল থাকবে, তাতে আর আশ্চর্য কী?

অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও বলে রাখা উচিত যে সত্যি-সত্যি গামা পালোয়ানের নামে গামা রশ্মির নাম হয়নি, হয়েছে গ্রিক বর্ণমালার একটি বর্ণের নামে। রঞ্জন রশ্মি নামটার ইতিহাস আরো অদ্ভুত। যে বিজ্ঞানী আবিষ্কার করেছিলেন এই রশ্মি, তাঁর নাম ছিলো ভিলহেল্ম কনরাড রয়েন্টগেন। অজানা অচেনা অজ্ঞাত এই রশ্মির তিনি নাম দেন এক্স রশ্মি, যেহেতু বীজগণিতের অঙ্কে অজানা কোনো সংখ্যা থাকলেই তাকে সাধারণত

x অক্ষরটি দিয়ে অভিহিত করা হয়। অনেকে অবশ্য আবিষ্কর্তার নামে এই রশ্মিকে রয়েন্টগেন রশ্মিও বলতে লাগলেন। এই নাম যখন বাংলায় বিজ্ঞানলেখকেরা লিখতে শুরু করলেন, শেষের gen অংশটির উচ্চারণ 'জেন' ধরে নিলেন অনেকে। ফলে নামটা দাঁড়ালো 'রয়েঞ্জেন'-জাতীয় কিছু। তা থেকে 'রঞ্জন' হতে আর কতোক্ষণ। যদিও 'রঞ্জন' মানে রাঙানো, অর্থাৎ রঙিন করা, এবং এ রশ্মি চোখে দেখা যায় না বলে রঙের কোনো প্রশ্নই নেই, তবু নামটা চলে গেলো বাংলায়।

যাক সে সব কথা, আবার ফিরে আসা যাক পরমাণুর প্রসঙ্গে। নিউক্লিয়াসকে ঘিরে ইলেকট্রন যখন ঘুরপাক খায়, তখন তার থেকে আলো বা অন্য কোনো রশ্মি বেরোয় না। কিন্তু যখন কোনো ইলেকট্রন কোনো একটা শক্তির ধাপ থেকে অপেক্ষাকৃত কম শক্তির ধাপে ঝপাং করে লাফ দিয়ে পড়ে, তখন পরমাণুটার মোট শক্তি তো কিছুটা কমে যায়।

পদার্থবিদরা অজস্র পরীক্ষা থেকে সিদ্ধান্তে এসেছেন যে শক্তি অবিনশ্বর। শক্তির নানা রূপ আছে – যেমন গতিশক্তি, তাপশক্তি বা বিদ্যুৎশক্তি। শক্তি এক রূপ থেকে অন্য রূপে পাল্টায় — যেমন বিদ্যুৎশক্তিকে পাখার গতিশক্তিতে পাল্টে নিয়ে আমরা গরমের দিনে হাওয়া খাই। কিন্তু মোট শক্তি বাড়েও না, কমেও না — বা এক কথায়, শক্তি সংরক্ষিত হয়। তাহলে পরমাণুর ওই কমে যাওয়া শক্তিটা যায় কোথায়?

সেটা যায় আলোতে পরিণত হয়ে। পরমাণুটার শক্তি ঠিক যতোটা কমলো, ঠিক ততোটা শক্তির আলোকণা পরমাণুটা থেকে বেরিয়ে আসে। হাইড্রোজেনের পরমাণুতে ইলেকট্রন দ্বিতীয় উত্তেজিত অবস্থার ধাপটা থেকে প্রথম উত্তেজিত অবস্থার ধাপটায় ঝাঁপ দিলে যে আলোকণাটা বেরিয়ে আসবে তার শক্তি হবে ১২ · ০৯ − ১০ · ২০ = ১ · ৮৯ ইলেকট্রন-ভোল্ট, অর্থাৎ সে আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য হবে ১২৪০ ÷ ১ · ৮৯ = ৬৫৬ ন্যানোমিটার।

আবার এটার উল্টো ব্যাপারটাও ঘটতে পারে। মনে করা যাক হাইড্রোজেন গ্যাসের একটা পাত্রে ৬৫৬ ন্যানোমিটার তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলো এসে পড়লো। সে আলোতে রয়েছে ১ · ৮৯ ইলেকট্রন-ভোল্ট শক্তির আলোকণা। গ্যাসের পাত্রটাতে সব পরমাণুগুলিই যে নিরুত্তেজিত অবস্থায় থাকবে তা তো নয়, ধাক্কাধাক্কির ফলে কিছু পরমাণু উত্তেজিত অবস্থাতে থাকে। গোলরক্ষক যেমন তার দিকে হাঁকানো ফুটবলটা লুফে নিয়েছিলো, তেমনই ওই ১ · ৮৯ ইলেকট্রন-ভোল্ট শক্তির আলোকণা শুষে নিয়ে পরমাণুটা প্রথম থেকে· দ্বিতীয় উত্তেজিত ধাপে উঠে যেতে পারে। এইভাবে শক্তির ধাপ অনুযায়ী বিভিন্ন অণু বা পরমাণু বিভিন্ন রঙের আলো শুষে নেয়।

অণু বা পরমাণুতে আলো শুষে নেওয়ার কাজটা যে কেবল ইলেকট্রনই করে তা অবশ্য নয়। একাধিক পরমাণু কাছাকাছি এসে যখন অণু তৈরি করে অথবা পরস্পরের সঙ্গে জুড়ে জুড়ে তরল বা কঠিন পদার্থের রূপ নেয়, তখন যে কোনো একটি পরমাণুর নিউক্লিয়াস আশেপাশের অন্য পরমাণুর নিউক্লিয়াসের সঙ্গে জোট মিলিয়ে
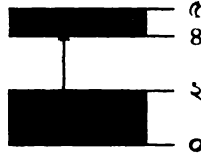
৮ নং ছবি॥ *একটি পদার্থে ইলেকট্রনের শক্তির সম্ভাব্য পরিমাণ। পট্টিগুলোর ডানদিকে লেখা হয়েছে বিভিন্ন স্তরের শক্তির পরিমাণ, ইলেকট্রন-ভোল্টের মাপে। পট্টির সংখ্যা এবং শক্তির পরিমাণ বিভিন্ন বস্তুর ক্ষেত্রে বিভিন্ন হবে। খাড়া যে তীরচিহ্ন আছে, তা ব্যাখ্যা করা হয়েছে লেখার মধ্যে।*

তালে তালে কাঁপতে থাকে। এই কাঁপুনিটির নির্দিষ্ট তাল আছে সেটা নির্ভর করে নিউক্লিয়াসগুলির ওজনের উপর। ইলেকট্রনের শক্তির যেমন নানান ধাপ থাকে, নিউক্লিয়াসের কাঁপুনির শক্তিও তেমনি ধাপে ধাপে বাড়ে। কোনো একটা রঙের আলোর শক্তির সঙ্গে যদি সেই ধাপগুলির ব্যবধানটা মিলে যায় তাহলে নিউক্লিয়াসের কাঁপুনিও আলো শুষে নিতে পারে।

বাতাসের মতোন গ্যাসীয় মাধ্যমে অণু বা পরমাণুগুলি একে অন্যের তোয়াক্কা না করে ছোটাছুটি করে বেড়ায়। কঠিন পদার্থে, এমনকি জলের মতো তরল জিনিশেও, পরমাণুগুলি পরস্পরের সঙ্গে বাঁধা পড়ে কাছাকাছি চলে আসে। সেই অবস্থায়, অর্থাৎ কঠিন বা তরল পদার্থে ইলেকট্রনেরা কী কী শক্তির ধাপে থাকতে পারে সেটাও কোয়ান্টাম তত্ত্ব দিয়ে হিসেব করা যায়। কঠিন পদার্থে আর একটা ব্যাপারও ঘটে পরমাণুগুলি পরপর সাজানোর মধ্যে একটা সামঞ্জস্য বা সুসমতা থাকে, যেমন থাকে সাজানো ফুলের বাগানে বা সিনেমা থিয়েটারের হলে সারি সারি রাখা চেয়ার গুলির মধ্যে। সেটাও ইলেকট্রনের শক্তির অবস্থাকে প্রভাবিত করে। এই সব নানান প্রভাব ধরে নিয়ে হিসাব করলে দেখা যায় যে কঠিন পদার্থে ইলেকট্রনের শক্তির অবস্থাগুলি এক-একটা বিশেষ মাপের না হয়ে এক-একটা চৌহদ্দির মধ্যে পড়ে। ছবিতে সেটা দেখানো হয় মোটা ফিতে বা পট্টির মতোন করে --- পরমাণুর শক্তির মতোন সরু রেখা দিয়ে নয়। ৮ নম্বর ছবিতে সে রকম ইলেকট্রনের শক্তির পট্টি দেখানো হয়েছে।

এর সঙ্গে রঙের কী সম্পর্ক, তা একটু বোঝার চেষ্টা করা যাক ছবিটার দিকে তাকিয়ে। ছবিতে যে দুটো পট্টি দেখানো হয়েছে, তার নিচেরটার ব্যাপ্তি ২ ইলেকট্রন-ভোল্ট, ওপরেরটার ১ ইলেকট্রন-ভোল্ট। মাঝখানে ফাঁক ২ ইলেকট্রন-ভোল্টের। অর্থাৎ, নিচের পট্টির একেবারে নিচটাকে যদি শূন্য শক্তি বলে ধরে নিই, তাহলে সেই পট্টিতে ইলেকট্রনের শক্তি শূন্য থেকে ২ ইলেকট্রন-ভোল্টের মধ্যে হতে পারে, আর ওপরের পট্টিটাতে শক্তি হতে পারে ৪ থেকে ৫ ইলেকট্রন-ভোল্টের মধ্যে। কোনো পদার্থের মধ্যে শক্তির পট্টিগুলো যদি এই রকম হয়, তাহলে তার উপর আলো পড়লে কী হবে?

পট্টি দিয়ে যা বোঝানো হয়, তা হলো ইলেকট্রনের শক্তি কতো কতো হওয়া সম্ভব। সম্ভাব্য সমস্ত শক্তির ইলেকট্রনই যে পদার্থের মধ্যে বসে রয়েছে, এমন ভাববার কোনো কারণ নেই। ধরে নেওয়া যাক, আমরা এমন একটি পদার্থ নিয়েছি যার জন্য নিচের পট্টিটা পুরোটাই ভর্তি, অর্থাৎ শূন্য থেকে ২ ইলেকট্রন-ভোল্ট পর্যন্ত শক্তির ইলেকট্রনে পদার্থটি ঠাসা। ওপরের পট্টি পুরোটাই খালি, সেখানে নতুন ইলেকট্রন এলে তার জায়গা হবে।

এইবার যদি বাইরে থেকে একটা আলোকণা এসে পড়ে ওই জিনিশটার উপর? নিচের পট্টি ঠাসাঠাসি ভর্তি, তাই কোনো ইলেকট্রন যদি এই আলোকণা শুষে নিতে চায়, তাকে বাড়তি শক্তি নিয়ে চলে যেতে হবে ওপরের পট্টিতে। কিন্তু দুই পট্টির মধ্যে ফাঁক ২ ইলেকট্রন-ভোল্টের, সেখানটা নিষিদ্ধ এলাকা। তাই আলোকণার শক্তি যদি অন্তত ২ ইলেকট্রন-ভোল্ট না হয়, তাহলে এই পদার্থটি তা শুষে নিতে পারবে না। ২ ইলেকট্রন-ভোল্টের বেশি হলে পারবে, এবং ফলত একটি ইলেকট্রন নিচের পট্টি ছেড়ে ওপরের পট্টিতে চলে যাবে, ছবিতে খাড়া তীরচিহ্ন দিয়ে যা দেখানো হয়েছে।

২ ইলেকট্রন-ভোল্ট শক্তি হয় ৬২০ ন্যানোমিটারের আলোর কণার। তাহলে আমরা যা বললাম, তার মর্মার্থ হলো, ৬২০ ন্যানোমিটারের চেয়ে ছোটো তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলো এই পদার্থের ওপর পড়লে তা শোষিত হবে, তার চেয়ে বড়ো তরঙ্গদৈর্ঘ্য হলে শোষিত হবে না। অর্থাৎ এই পদার্থের ওপরে যদি সাদা আলো পড়ে, তাহলে তার নীল অংশটা পুরোপুরি শুষে নেবে এই পদার্থ, সবুজ-হলুদও শুষে নেবে। কিন্তু লাল শুষতে পারবে না, সেটা প্রতিফলিত হবে। সেই প্রতিফলিত আলো দেখে আমরা বলবো, পদার্থটাকে লাল দেখাচ্ছে। পট্টিগুলো কতো শক্তির ইলেকট্রন ধরতে পারে, কতোগুলো পট্টি আছে, ইত্যাদির ওপর নির্ভর করবে কোন কোন তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলো শুষে নেবে সেই পদার্থ। যা যা শুষতে পারবে না, সেগুলোর সংমিশ্রণই তার রঙ।

লাল গোলাপ ফুলের পাপড়িতে থাকে এমন সব রাসায়নিক পদার্থ যা বর্ণালির নীল, সবুজ ও হলুদ অংশগুলি শুষে নেয়। লাল আলো তাতে শুষে যায় না বলে গোলাপের উপর সাদা আলো পড়লে পাপড়ি থেকে প্রতিফলিত আলোতে কেবল লাল অংশটুকুই থাকে – তাই সে গোলাপটা দেখায় লাল।

কিন্তু সেই লাল গোলাপটাই যদি নীল, সবুজ বা হলুদ রঙের আলোতে এনে দেখা যায় তখন সেটা দেখাবে কালো। রাতে শোয়ার সময়ে অনেকে ঘরে নীল রঙের 'রাতবাতি' জ্বালিয়ে রাখে। সেই নীল আলোতে লাল সবুজ বা হলুদ জামার রঙ আলাদা করা মুশকিল হবে, সেগুলি সবই দেখাবে কালো রঙের। লাল জিনিশ লাল ছাড়া অন্য সব রঙের আলো শুষে নেয় — ফিরিয়ে দেয় শুধু লাল আলো। শুধু নীল রঙের আলো থাকলে তার সবটাই লাল জিনিশের গায়ে শুষে যাবে, তাই তা থেকে কোনো আলোই চোখে আসবে না। কোনো আলো আসছে না বলে জিনিশটা দেখাবে কালো।

তার মানে, একটা জিনিশের দিকে তাকালে তার কী রঙ আমরা দেখি তা যেমন জিনিশটার নিজস্ব কোনো একটা বৈশিষ্ট্যের উপরে (যেমন গোলাপের পাপড়িতে থাকা কোনো একটা বিশেষ পদার্থের উপরে) নির্ভর করে, তেমনই করে কোন রঙের আলোতে জিনিশটা দেখা হচ্ছে তার উপরেও। তবে কার কী রঙ, এ প্রশ্ন করলে সাধারণত সাদা আলো ফেললে তার কী রঙ দেখা যায়, সেটাই বোঝানো হয়।

পরমাণুর ইলেকট্রনে শুধাই, কেমন স্বভাব তোর?
বললে সে যে, ধাপে ধাপেই বাড়ে কেবল শক্তি মোর।
আলো-কণার ধাক্কা খেলে
লম্ফ দেবো উপর তলে!
এসব যতো নিয়ম কানুন বাৎলে গেছেন নীলস বোর।

৩ : আকাশ কেন নীল

পলাশ বরন পাল

আকাশের রঙ কী তা জিজ্ঞেস করলে আমরা সকলেই উত্তর দেবো 'নীল', কিন্তু আকাশের রঙ মোটেই সব সময়ে নীল থাকে না। যখন মেঘ-টেঘ করে তখনকার কথা ধরছি না, কারণ তখন তো আকাশের রঙটা দেখি না, দেখি মেঘের রঙ। নির্মেঘ পরিষ্কার আকাশের রঙই কি সব সময়ে নীল? রাতের আকাশ মোটেই নীল দেখায় না, দেখায় কালচে বা ধূসর। সূর্যাস্ত বা সূর্যোদয়ের সময়েও নীলের চেয়ে লাল রঙই বেশি চোখে পড়ে।

এ সব বাদ দিয়ে ভরা দিনের আকাশের কথাও যদি ভাবি, তাহলেও কি আকাশের রঙ নীল? এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার আগে আকাশের দিকে একবার তাকিয়ে নেওয়াই ভালো। আগেই ঠিক করে নিয়েছি যে এমন সময়ের কথা বলা হচ্ছে যখন মেঘ নেই, সূর্য উঠে গেছে অনেকক্ষণ অথচ অস্ত যেতে বেশ দেরি আছে। সূর্য আকাশের যেখানে রয়েছে, তার খুব কাছাকাছি অঞ্চলে তাকালে আকাশের রঙ মোটেই নীল দেখায় না, দেখায় মোটামুটি সাদা। সূর্যের থেকে যতো দূরে তাকানো যায়, ততো নীল রঙের প্রাধান্য বাড়ে। তার মানে, ফস করে 'আকাশের রঙ নীল' না বলে দিয়ে একটু খুঁটিয়ে আমরা বলতে পারি -- সূর্য যেদিকে আছে, তার কাছাকাছি না তাকালে দিনের আকাশ নীল দেখায়। এবং তারপরেই নিজেদেরকে প্রশ্ন করতে পারি, কেন?

তার আগে আর একটা প্রশ্ন করা যাক - দিনের আকাশে তাকালে সব দিকেই আলো দেখা যায় কেন? সূর্য যেদিকে রয়েছে সেদিক থেকে সূর্যের আলো আসছে, সেটুকু বোঝা সহজ। কিন্তু অন্যান্য দিক থেকে আলো আসছে কী করে?

আসলে, সব দিক থেকেই যে আলো আমরা দেখি, সে আলো সূর্যেরই। যেদিকে সূর্য সেদিক থেকে এই আলো আসছে সরাসরি। অন্য যে কোনো দিক থেকে এই আলো সোজা আসছে না। বাতাসে নানা রকমের গ্যাস আছে, সেই সব গ্যাসের অণুগুলো ঘুরে বেড়াচ্ছে আমাদের বায়ুমণ্ডলে। তাদের কারুর সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে ঠিকরে পড়ছে সূর্যের আলো, আমাদের দিকে তার যে অংশটা আসছে সেইটাকেই আমরা দেখতে পাচ্ছি।
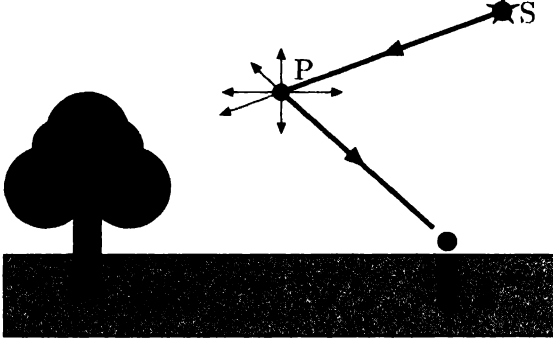
৯ নং ছবি॥ *বায়ুর কোনো অণুতে ধাক্কা খেয়ে সূর্যের আলো এসে পৌঁছোচ্ছে দর্শকের চোখে, তাই* AP *অভিমুখে তাকালেও আকাশে আলো দেখা যায়।*

ব্যাপারটা আরেকটু খোলসা করে বোঝার জন্য ৯ নম্বর ছবির দিকে তাকানো যাক। মাটিতে A দাগ দেওয়া যে জায়গাটা, সেখানে দাঁড়িয়ে একজন আকাশ দেখছে। সেখান থেকে S বিন্দুর দিকে তাকালে দেখা যাবে সূর্য। সেদিক থেকে সূর্যের আলো সরাসরি আসছে, অর্থাৎ সেদিক থেকে যে আলো আসছে তার রঙ সাদা।

A বিন্দুর দর্শক যদি P বরাবর তাকায়? সেদিকে সূর্য নেই। কিন্তু বাতাসের নানা গ্যাসের অণু সব দিকেই আছে। ধরা যাক P বিন্দুতে এই রকম একটি অণু আছে, তাতে ধাক্কা লেগে ছিটকে যাচ্ছে আলো। সব দিকেই ছিটকাতে পারে, ৯ নম্বর ছবিতে যেমন দেখানো হয়েছে। তার মধ্যে খানিকটা A বিন্দুর দিকেও আসবে। A বিন্দুতে যে দর্শক দাঁড়িয়ে আছে, তার চোখে এসে পড়বে সে আলো। সে দেখবে, P থেকে আসছে আলোটা, সেই জন্য P-এর দিকে তাকালে সে আলো দেখতে পাবে, তার কাছে সেই দিক বরাবর আকাশ আলোকিত মনে হবে। শুধু ছবির P বিন্দুর দিকটি নয়, আকাশের যে কোনো দিকের সম্পর্কেই এ কথা প্রযোজ্য। অর্থাৎ, যেদিকে সোজা তাকালে সূর্য, সে দিক ছাড়া বাকি সব দিক থেকেই আমাদের চোখে আলো পৌঁছোচ্ছে বাতাসের কোনো অণুর গায়ে ধাক্কা লেগে, ছিটকে। তাই আকাশের সব দিকই আলোকিত দেখাচ্ছে দিনের বেলায়।

সূর্যের থেকে যে আলো P বিন্দুতে বা অন্য যে কোনো বিন্দুতে সরাসরি পৌঁছোচ্ছে, তার রঙ সাদা। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষে আইজাক নিউটন দেখিয়েছিলেন, সাদা আলোতে মিলেমিশে থাকে অনেক রকমের রঙ। বেগুনি আলোও থাকে, নীলও থাকে, সবুজ হলুদ কমলা লাল ইত্যাদিও থাকে। সব মিলিয়ে সাদা।

আলো আসলে এক রকমের ঢেউ। দুটো আলো দু রঙের যদি হয়, তার মানে একটার মধ্যে ঢেউগুলোর যা দৈর্ঘ্য অন্যটার মধ্যে সে রকম নয়। বেগুনি আলোর ঢেউ

সবচেয়ে ছোটো ছোটো। তার চেয়ে লম্বা ঢেউয়ের আলো হলে সে আলো নীল দেখায়, তারপর আরো লম্বা ঢেউ হলে ক্রমশ সবুজ হলুদ কমলা রঙ। লাল আলোর ঢেউ সবচেয়ে লম্বা, তার চেয়ে লম্বা ঢেউ হলে তা আর চোখে দেখা যায় না।

আলো সম্পর্কে এই কথাকটা মাথায় রেখে আকাশের কথায় আবার আসা যাক। P বিন্দুতে সূর্য থেকে সাদা আলো এসেছে, অর্থাৎ তাতে সব রঙের আলোই আছে। সব রঙের আলোই যদি গ্যাসের অণুর সঙ্গে ধাক্কায় সমানভাবে ছিটকে পড়তো, তাহলে ছিটকে যে আলো A বিন্দুতে পৌঁছোতো তার রঙও হতো সাদা। কিন্তু তা ঘটে না। বাতাসের অণুগুলোর সঙ্গে ধাক্কা লেগে বিভিন্ন রঙের আলো ঠিকরায় বিভিন্ন পরিমাণে। ধাক্কা লেগে ছিটকে পড়ার পোশাকি নাম *বিক্ষেপণ*। তরঙ্গদৈর্ঘ্যের সঙ্গে এই বিক্ষেপণের সম্পর্কটা কী রকম, সেটা প্রথম দেখান ইংল্যান্ডের পদার্থবিদ জন উইলিয়াম স্ট্রাট, যিনি লর্ড র‍্যালে উপাধিতেই বেশি পরিচিত। ১৮৭১ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত এক গবেষণাপত্রে তিনি দেখান, আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্যের চেয়ে অনেক ছোটো মাপের কোনো বস্তুকণার সঙ্গে যদি আলোর ধাক্কা লাগে তাহলে সে আলো কতোটা ঠিকরাবে তার পরিমাণ বেশ ভালোরকম নির্ভর করে আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্যের ওপর। তরঙ্গদৈর্ঘ্য যদি দুগুণ বাড়িয়ে দেওয়া হয়, তাহলে বিক্ষেপণ হবে আগের তুলনায় ২ × ২ × ২ × ২ অর্থাৎ ১৬ ভাগের ১ ভাগ। যদি তরঙ্গদৈর্ঘ্য তিনগুণ কমিয়ে দেওয়া হয় তাহলে বিক্ষেপণ বেড়ে যাবে ৩ × ৩ × ৩ × ৩ বা ৮১ গুণ।

বাতাসের মধ্যে অক্সিজেন নাইট্রোজেন ইত্যাদি যে সব গ্যাস আছে, তাদের অণুগুলোর মাপ এক ন্যানোমিটারের চেয়েও কম। আর আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য কয়েকশো ন্যানোমিটার। কাজেই র‍্যালের কথামতোই সব কিছু ঘটবে। লাল আলোর ঢেউ সবচেয়ে লম্বা সে কথা আগেই বলেছি, তাই লাল আলো ছিটকে আসতে পারে না খুব একটা। হলুদ বা সবুজ রঙের আলো লালের চেয়ে বেশি আসে, তবু নীলের তুলনায় বেশি নয়। নীল এবং বেগুনির ঢেউ সবচেয়ে ছোটো বলে সেই ঢেউগুলোই সবচেয়ে বেশি করে ঠিকরে আসতে পারে, সেই রঙের ঢেউগুলোকে দেখি বলে আকাশের রঙ নীল মনে হয় আমাদের চোখে।

একটা অবশ্য প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে। নীলের চেয়ে বেগুনির ঢেউ তো আরো ছোটো। বেগুনি ঢেউ নিশ্চয়ই নীলের চেয়েও ভালো বিক্ষোপিত হয়। তাহলে আকাশ বেগুনি দেখায় না কেন?

এর উত্তর হচ্ছে, সূর্যের আলোয় বেগুনি ঢেউয়ের পরিমাণ নীলের তুলনায় কম। সূর্যের আলোর মধ্যে যে সব প্রধান প্রধান রঙগুলোর কথা আমরা উল্লেখ করেছি, তার মধ্যে সবুজ রঙের ঢেউ সবচেয়ে জোরালো, অর্থাৎ এই রঙের ঢেউই সবচেয়ে বেশি পরিমাণে আসে সূর্য থেকে। তার চেয়ে বেশি দৈর্ঘ্যের ঢেউয়ের দিকে গেলেও সূর্যের অবদান কমতে থাকে, কমের দিকে গেলেও। তাই শেষ পর্যন্ত আমাদের চোখে কোন

রঙের ঢেউ কতোটা আসছে, তার হিসেব নির্ভর করে তিনটে ব্যাপারের ওপরে। প্রথমত, সূর্য থেকে নির্গত আলোতে কোন ঢেউ কতোটা ছিলো। দ্বিতীয়ত, কোন ঢেউয়ের বিক্ষেপিত হওয়ার ক্ষমতা কী রকম। হলুদ রঙ সূর্য থেকে বেরোচ্ছে অনেক বেশি কিন্তু তার বিক্ষেপিত হওয়ার ক্ষমতা কম। বেগুনি ঢেউ বিক্ষেপিত হয় ভালো, কিন্তু সূর্যালোকে এ ঢেউয়ের পরিমাণ খুব বেশি থাকে না। আর তৃতীয় ব্যাপারটা হলো, আমাদের চোখও সব রকম রঙ দেখবার ব্যাপারে সমান দক্ষ নয়। একই পরিমাণ নীল ও বেগুনি রঙ চোখে পড়লে বেগুনির চেয়ে নীলটাই আমাদের চোখে বেশি উজ্জ্বল লাগে। এই তিনটে ব্যাপারের টানাপোড়েনে সবচেয়ে লাভ যার হয় সে হলো নীল রঙ — সূর্যালোকে এর পরিমাণও তুচ্ছ নয়, এর বিক্ষেপিত হওয়ার ক্ষমতাও অন্য অনেক রঙের চেয়ে ভালো, আবার আমাদের চোখ এ রঙের আলো দেখার ব্যাপারে পারদর্শী। তাই সব মিলে নীলই জিতে যায়, আমরা দেখি নীল আকাশ।

● — ○ — ● — ○ — ●

একটা কথা এ থেকে পরিষ্কার — বায়ুমণ্ডলের জন্যই আকাশের রঙ দেখি আমরা। আচ্ছা, বায়ুমণ্ডল যদি না থাকতো, তাহলে কী হতো? তাহলেও সূর্যের দিকে সরাসরি তাকালে সূর্য দেখা যেতো বটে, কিন্তু অন্য কোনো দিকে চোখ ফেরালে আলো দেখা যেতো না, কারণ বায়ুর সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে সেই দিক দিয়ে সূর্যালোক আমাদের চোখে আসতো না। তাই সব দিক থেকে আলো আসতো না, সারা আকাশ আলোকিত দেখাতো না। সূর্যের দিকে তাকালে আলো, আর অন্য দিকে তাকালে অন্ধকার — এই হতো দিনের বেলার আকাশের অবস্থা। কালোর পটভূমিকায় দেখা যেতো অন্যান্য তারা, যেগুলো এমনিতে বায়ুমণ্ডল থেকে ঠিকরে আসা আলোতে ঢেকে যায়। মানে, দিনের আকাশের চেহারাটা মোটামুটি রাতের আকাশের মতোই হতো — অনেক তারা থাকতো আকাশে। তাদের মধ্যে একটা হতো সূর্য, কাছে অবস্থিত বলে যেটাকে দেখাতো বেশ বড়ো।

বায়ুমণ্ডল একেবারে না থাকার কথা ভাববার দরকার নেই। বায়ু যদি থাকতো কিন্তু অনেক কম থাকতো, অর্থাৎ বায়ুর ঘনত্ব হতো খুব কম, তাহলেও আকাশের চেহারাটা এই রকমই হতো — অন্ধকারের মধ্যে সূর্য এবং অন্যান্য তারা। কারণ, বাতাসে বিভিন্ন গ্যাসের অণুর সংখ্যা যদি খুব কম হতো, তাদের মধ্যে দিয়ে যাওয়ার সময়ে সূর্যরশ্মি যে ধাক্কা লেগে ছিটকে পড়বে, তার সম্ভাবনা হতো খুব কম। হরেদরে তাহলে আলো ছিটকানোর পরিমাণটা হতো নগণ্য, যেটুকু আলো ছিটকাতো তাতে আকাশ আলো হতো না। মাটি থেকে অনেক উঁচু দিয়ে, ৩০ কি ৪০ হাজার মিটার উঁচু দিয়ে যে সব প্লেন যায়, তাদের চালকেরা এ জিনিশটা প্রত্যক্ষ করেন। তবে কোনো যাত্রীবাহী প্লেন
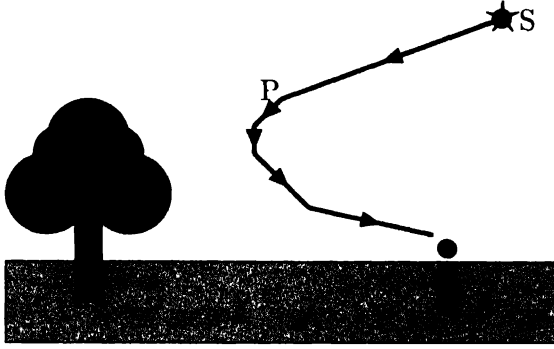
১০ নং ছবি॥ *বায়ুর ঘনত্ব যদি অনেক বেশি হতো, বহুবার বিক্ষেপিত হতে পারতো একই আলোকরশ্মি।*

অতো উঁচু দিয়ে যায় না, তাই মহাকাশযাত্রী অথবা সৈন্যদলের বৈমানিক না হলে এ দৃশ্য দেখবার আশা করা বৃথা।

এবারে উল্টো পরিস্থিতির কথাটা চিন্তা করা যাক। বাতাসের ঘনত্ব যদি খুব বেশি হতো তাহলে কী হতো? ধরা যাক একটা সূর্যরশ্মি বায়ুমন্ডলের মধ্যে দিয়ে পৃথিবীর বুকে আসার চেষ্টা করছে। একটা অণুর সঙ্গে ধাক্কা লেগে তার গতিপথ খানিকটা ঘুরে গেলো। বায়ুর ঘনত্ব যদি খুব বেশি হয়, তাহলে তো গল্প এখানেই শেষ হবে না। অতো ভিড়ের মধ্যে ধাক্কাধাক্কি বেশি হবে, তাই খানিক দূর গিয়ে আবার অন্য একটা অণুর সঙ্গে সেই সূর্যরশ্মির ধাক্কা লাগতেই পারে। তারপর হয়তো আবার। পৃথিবীর বুকে পৌঁছোবার আগে বহুবার ধাক্কা খেতে পারে একই সূর্যরশ্মি।

আমাদের বায়ুমন্ডলে বাতাসের ঘনত্ব যে রকম, তাতে এ ঘটনা ঘটে না, বা ঘটার সম্ভাবনা একেবারে নগণ্য। একটি রশ্মি একবারই ধাক্কা খায়, বাতাসের যা ঘনত্ব তাতে একই রশ্মির পক্ষে দুবার বিক্ষেপিত হওয়া প্রায় অসম্ভব। কিন্তু বায়ুর ঘনত্ব যদি বেশি হতো, তাহলে ঠিক এই জিনিশটাই সম্ভব হতো।

রঙের ব্যাপারে তাতে কী তফাত ঘটতো? আমরা আগেই র‍্যালের সূত্র উল্লেখ করে বলেছি, বিক্ষেপণে লালের দিকের আলোগুলো যথেষ্ট বাঁকতে পারছে না বলেই তো আমাদের কাছে পৌঁছোতে পারছে না! ঠিক কথা, কিন্তু সেই সঙ্গে এটাও ঠিক যে, যে কোনো একটি তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলোর কথা যদি ভাবা যায়, বিক্ষেপণে অল্প একটু বেঁকে যাওয়া তার পক্ষে অনেক সহজ, বিশাল রকম বাঁকার চেয়ে। বহুবার বিক্ষেপণ যদি হয়, তাহলে এক বারে বেশি বাঁকার কোনো দরকার নেই। ১০ নম্বর ছবিতে দেখানো হয়েছে, প্রত্যেক ধাক্কায় সামান্য বেঁকলেও অনেকগুলো ধাক্কা মিলে কীভাবে অনেকটা বেঁকে যেতে পারে একটি রশ্মি। তাহলে বাতাসের ঘনত্ব যদি বেশি হতো, আকাশের যে কোনো দিকে

তাকালেই সে দিক থেকে সব রঙের আলো এসে পৌঁছোতে পারতো আমাদের চোখে। বেগুনি বা নীল রঙ কম ধাক্কা খেয়ে আসতো, হলুদ বা লাল রঙের জন্য বেশিবার ধাক্কার দরকার হতো, তবে শেষ পর্যন্ত সব রঙই পৌঁছোতো। সব রঙ সমান পরিমাণেই শেষ পর্যন্ত পৌঁছোতো যদি ধরে নিই, তাহলে আমরা আকাশের যে কোনো দিকে তাকিয়ে দেখতে পেতাম সব রঙের সমাহার, অর্থাৎ সাদা রঙ। বা, সবকটা রঙই ঠিক সমান পরিমাণে নাও পৌঁছোতো, তাহলেও আকাশের রঙ দেখাতো সাদার কাছাকাছি কিছু একটা।

বায়ুমণ্ডলের ঘনত্ব খুব কম হলে আকাশ দেখাতো কালো, ঘনত্ব খুব বেশি হলে আকাশ দেখাতো সাদা। আমরা যে আকাশ নীল দেখি, তার কারণ আমাদের বায়ুমণ্ডলের আসল যা ঘনত্ব, তা এই দুই প্রান্তের কোনোটাতেই নয়, মাঝামাঝি।

কথাটাকে অন্যভাবেও বলা যায়। বায়ুমণ্ডল আটকা পড়ে আছে পৃথিবীর মহাকর্ষের টানে। সেই টানের পরিমাণ যদি অনেক বেশি হতো, তাহলে বায়ুমণ্ডল আরো ঘন হতো, দিনের আকাশের রঙ হতো সাদা। টান কম হলে বায়ুমণ্ডল হতো আরো পাতলা, আকাশ কালো দেখাতো। পৃথিবীর মহাকর্ষের টান কতোটা, সে প্রশ্নের উত্তরের একটা ইঙ্গিত রয়েছে আকাশের রঙে। মাথার ওপরে আকাশের রঙ নির্ধারিত হচ্ছে পায়ের তলার মাটির টান দিয়ে।

দিনদুপুরে নীলরঙেরই বাহার দেখি আকাশে
কেন তা নয় খয়েরি, সবুজ, কিম্বা হলুদ ফ্যাকাশে?
বুঝিয়ে সেটা বলেন র‍্যালে —
"বাতাস যখন আলোয় ঠ্যালে
নীল-রশ্মির পথটা তখন হয় যে অধিক ব্যাঁকা সে!"

৪ : ভোরের বা সন্ধের সূর্য

পলাশ বরন পাল

সূর্যবন্দনার স্তোত্রে ভোরের সূর্যকে বলা হয়েছে 'জবাকুসুমসঙ্কাশং', অর্থাৎ জবা ফুলের মতো। উপমাটা রঙের দিক থেকে। জবা ফুল লাল, ভোরের সূর্যও লাল। তেমনি লাল অস্তসূর্যও। অথচ অন্যান্য সময়ে সূর্যের রঙ মোটেই লাল দেখায় না, দেখায় হলদেটে বা সাদা। উষা এবং গোধূলিতে সূর্যকে তাহলে লাল দেখায় কেন?

১১ নম্বর ছবির দিকে তাকানো যাক। পৃথিবীর ওপরে A বিন্দুতে আমি দাঁড়িয়ে আছি। পৃথিবীর কেন্দ্র হচ্ছে C বিন্দুতে। যেদিকে এই কেন্দ্রবিন্দু, তার ঠিক উল্টোদিকে যদি M-এর দিকে তাকাই, তাহলে মাঝ-আকাশের দিকে তাকানো হবে। আর যদি এই অভিমুখের আড়াআড়ি বা লম্ব দিকে G বা H বিন্দুর দিকে তাকানো যায়, তাহলে দৃষ্টি যাবে দিগন্তের দিকে। সমুদ্রের ধারে বা ফাঁকা মাঠের প্রান্তে বসে না থাকলে অবশ্য সূর্যকে দিগন্তরেখার ওপরে দেখতে পাওয়া সম্ভব নয়, গাছপালা বাড়িঘরদোরে আড়াল হয়ে যায় সূর্য। সেই কারণে পুরোপুরি দিগন্তে সূর্যের কথা না ভেবে বরং ভাবা যাক, সূর্য যখন দিগন্তরেখার কাছাকাছি, ১১ নম্বর ছবির K বিন্দুর মতো কোনো একটা জায়গায়, তখন সূর্যের রঙ কী রকম দেখাবে।

মাঝ-আকাশের তুলনায় একটা পার্থক্য ছবির দিকে তাকালেই লক্ষ করা যাচ্ছে। পৃথিবীর চারপাশ ঘিরে আছে বায়ুমণ্ডল, সেই বায়ু ভেদ করে সূর্যের আলো আমাদের কাছে পৌঁছোয়। মাঝ আকাশে যখন সূর্য, তখন বায়ুস্তর যতোটা অতিক্রম করতে হয় তার দৈর্ঘ্য সবচেয়ে কম। ছবি থেকে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, সে তুলনায় দিগন্তরেখার কাছাকাছি অবস্থানে সূর্যকে দেখলে সূর্যের আলো অনেকটা বেশি পথ বায়ুর মধ্যে দিয়ে আসছে।

বায়ুমণ্ডল ভেদ করে আসার সময়ে একটা মাশুল দিতে হয় রোদ্দুরকে। বাতাসের মধ্যে অক্সিজেন নাইট্রোজেন ইত্যাদি যে সব গ্যাসের অণু থাকে, তাদের সঙ্গে পথে ধাক্কাধাক্কি লাগে আলোর। সেই সংঘর্ষে আলো খানিকটা ছিটকে ছড়িয়ে যায়, পুরোপুরি পৃথিবীর মাটিতে এসে পৌঁছোতে পারে না। মধ্যগগন থেকে যখন সূর্যের আলো আসে
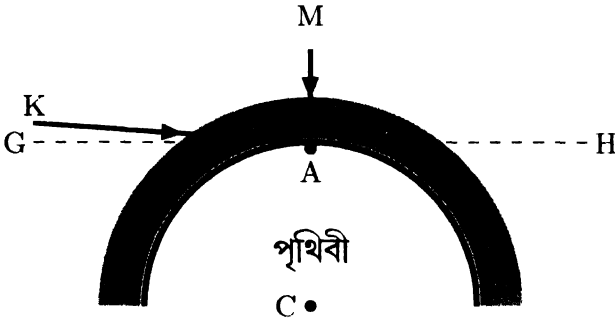
১১ নং ছবি ॥ *পৃথিবী, চারপাশ ঘিরে বায়ুমণ্ডল, আর সূর্যের দুটি অবস্থানে কীভাবে বায়ুমণ্ডল ভেদ করে আলো এসে পৌঁছোয় পৃথিবীতে, তার ছবি। বায়ুমণ্ডলের উচ্চতা আনুপাতিক নয়।*

তখন বায়ুমণ্ডলের মধ্যে দিয়ে পথটা অপেক্ষাকৃত কম বলে ছিটকে ছড়িয়ে যাওয়ার ব্যাপারটা কম হয় — বা আরেকটু ভালো কথায় বলতে গেলে, বিক্ষেপণ কম হয়। সূর্য যখন দিগন্তরেখার কাছে থাকে, তখন বায়ুর মধ্যে দিয়ে অনেকটা পথ আসতে হয়, তাই বিক্ষেপণের পরিমাণ অনেক বেশি।

বিক্ষেপণ বেশি হওয়ার ফলে দুটো জিনিশ হয়। প্রথমত, অনেকটা আলো ছিটকে ছড়িয়ে পড়ে বলে ভোরের বা সন্ধের সূর্যের ঔজ্জ্বল্য অনেক কম লাগে আমাদের চোখে। ভরদুপুরের সূর্যের দিকে তাকানোই যায় না, কিন্তু সূর্যোদয়ের একটু পরে বা সূর্যাস্তের একটু আগে সূর্যের দিকে সরাসরি দিব্যি তাকানো যায়।

দ্বিতীয় যে ব্যাপারটা ঘটে, সেটার সঙ্গে রঙের একটা সম্পর্ক আছে। সব রঙের আলো সমানভাবে ছিটকে যায় না, বা সমানভাবে বিক্ষেপিত হয় না। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে লর্ড র‍্যালে দেখিয়েছিলেন, আলো কতোটা বিক্ষেপিত হবে তার পরিমাণ নির্ভর করে আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্যের ওপর। তরঙ্গদৈর্ঘ্যের সঙ্গে বিক্ষেপণের সম্পর্কটা একটু আদায়-কাঁচকলায়, অর্থাৎ একটা বাড়লে অন্যটা কমে।

তার মানে, সবচেয়ে বেশি তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলো সবচেয়ে কম বিক্ষেপিত হয়। আমাদের দৃষ্টির সীমার মধ্যে সবচেয়ে বেশি তরঙ্গদৈর্ঘ্য হলো লাল রঙের আলোর। লাল আলোর তাই বিক্ষেপিত হয়ে বিপথে চলে যাওয়ার আশঙ্কা সবচেয়ে কম, সবচেয়ে বেশি পরিমাণে তা এসে পৌঁছোয় আমাদের কাছে। অন্যান্য রঙের আলো সে তুলনায় অনেকটাই বিক্ষেপিত হয়ে অন্যদিকে ছড়িয়ে যায় বলে সে সব রঙের আলো কম এসে পৌঁছোয়। সূর্য মধ্যগগনেই থাকুক বা দিগন্তের কাছেই থাকুক, এ ঘটনা ঘটতে থাকে। তবে ভোরের দিকে সূর্যোদয়ের সামান্য পরে বা সন্ধেয় সূর্যাস্তের একটু আগে সূর্য যখন দিগন্তরেখার কাছাকাছি থাকে, তখন বায়ুর মধ্যে দিয়ে অনেকটা বেশি পথ পেরিয়ে আসে

সেই সূর্যের আলো, বেগুনি নীল ইত্যাদি রঙের আলোর বিক্ষেপণের পরিমাণ অনেক বেশি হয়, লালের সঙ্গে অন্য রঙের আলোর বিক্ষেপণের তফাত অনেক প্রকট হয়ে ওঠে। ভোরের বা সন্ধের সূর্যকে যে লাল দেখায়, এই হলো তার কারণ।

●—○—●—○—●

চট করে একটু ধাঁধার মতো শোনাতে পারে কথাটা। আগে বলা হয়েছিলো, বর্ণালির বেগুনির দিকটা সবচেয়ে বেশি বিক্ষেপিত হয় বলেই আকাশ নীল দেখায়। এখন বলা হচ্ছে, সেই একই কারণে সূর্যকে লাল দেখায় দিগন্তরেখার কাছাকাছি এলে। একই কারণে কাউকে নীল দেখাচ্ছে কাউকে লাল এটা কি ঠিক কথা হলো?

কথাটায় কিন্তু ভুল নেই কিছু। শুধু মনে রাখতে হবে, দুটো প্রশ্নের চরিত্র আলাদা। আকাশের রঙের কথা যখন বলা হচ্ছে, তখন আমরা বলছি আকাশের যে দিকে আলোর উৎস অর্থাৎ সূর্য নেই সেই দিকের কথা। আলো সেখান থেকে সরাসরি আসছে না, বলা বাহুল্য। সূর্য থেকে আলো আসছে, বায়ুমণ্ডলের অণুগুলোতে লেগে সে আলো ঠিকরে ছড়িয়ে যাচ্ছে সব দিকে। তার মধ্যে আমাদের দিকেও খানিকটা আসছে, সেই আলোটা দেখছি আমরা। যে রঙের আলো বেশি ঠিকরাতে পারে বা বিক্ষেপিত হতে পারে, সেই রঙই তাই আমাদের চোখে বেশি এসে পৌঁছোবে শেষ পর্যন্ত। র‍্যালের সূত্র অনুযায়ী, কম তরঙ্গদৈর্ঘ্য যে সব রঙের, তাদেরই জিত হয়, তাই ঠিকরানো আলোতে আকাশ নীল দেখায়।

ভোরের বা সন্ধের সূর্যের রঙের কথা যখন বলছি, তখন সম্পূর্ণ অন্য প্রশ্ন। এবারে আমরা সূর্যের দিকেই, অর্থাৎ আলোর উৎসের দিকেই তাকাচ্ছি। সেখান থেকে আলো আসছে। যদি বিক্ষেপিত হয়ে অন্য দিকে চলে না যায়, তবেই সে আলো এসে পৌঁছোবে আমাদের চোখে। এখানে তাই যে রঙের আলো কম বিক্ষেপিত হয়, তারই প্রাধান্য হয় শেষ পর্যন্ত, সূর্য আমাদের মনে জাগিয়ে তোলে জবা ফুলের উপমা।

উষা এবং গোধূলিতে সূর্য ছুঁলে দিগন্ত
কেন আকাশ হয় রে রাঙা? বল না মোরে তুরন্ত।
নীল ও সবুজ ঠিকরে গেলে
আকাশ ভরে হলুদ লালে
হিসাব কষে দেখান র‍্যালে, শেষ করে তাঁর তদন্ত।

৫ : গ্রহ-উপগ্রহের রঙ

শেখর গুহ

১৯৬১ সালে নিজের সম্পাদিত সন্দেশ পত্রিকায় সত্যজিৎ রায় লিখেছিলেন তাঁর প্রথম কল্পবিজ্ঞানকাহিনী 'ব্যোমযাত্রীর ডায়রি'। সেই গল্পে প্রোফেসর ত্রিলোকেশ্বর শঙ্কু তাঁর গৃহকর্মী প্রহ্লাদ, পোষা বেড়াল নিউটন আর নিজের বানানো যন্ত্রমানব বিধুশেখরকে নিয়ে নিজের বানানো রকেট চড়ে গিরিডি থেকে পাড়ি দিয়েছিলেন মহাকাশে। মঙ্গলগ্রহে পৌঁছে তিনি দেখলেন সেখানকার পাথরের রঙ হলদে, জলের রঙ লাল, গাছপালার রঙ নীল আর আকাশের রঙ সবুজ। ১৮৯৮ সালে 'ওয়র অফ দ্য ওয়র্ল্ডস' নামে আর একটা বিখ্যাত কল্পবিজ্ঞানের গল্পে ইংরেজ লেখক এইচ জি ওয়েল্সও লিখেছিলেন যে মঙ্গলগ্রহের গাছপালার রঙ রক্তের মতো টকটকে লাল। এই সব গল্প লেখার পর অনেক দশক কেটে গেছে। নানান রকমের ক্যামেরা এবং রঙ মাপার অন্যান্য যন্ত্রপাতি নিয়ে একের পর এক মহাকাশযান সৌরমণ্ডলের প্রায় সব আনাচে কানাচেই উঁকি মেরে এসেছে। বিভিন্ন গ্রহ উপগ্রহের রঙ কীরকম তা এখন মোটামুটি ভালোই জানা হয়ে গেছে। গ্রহ গ্রহান্তরে বেড়াতে গেলে কোথায় আমরা কীরকম রঙ দেখবো?

সূর্যের সবচেয়ে কাছের গ্রহ হলো বুধ — সূর্য থেকে তার গড় দূরত্ব প্রায় ৬ কোটি কিলোমিটার। পৃথিবী থেকে দূরবীন দিয়ে দেখে বুধের রঙ কী তা খুব একটা বোঝা যায় না। ১৯৭৪ আর ১৯৭৫ সালে মেরিনার ১০ নামে একটা মহাকাশযান বুধের কাছাকাছি গিয়ে গ্রহটার একটা পিঠ দেখে এসেছে। বুধে সাদা, কালো আর ধূসর ছাড়া অন্য কোনো রঙের বড়োই অভাব। পৃথিবীর মতো বুধের অন্তঃস্থলটা প্রধানত লোহা আর নিকেল দিয়ে গড়া আর বহির্ভাগটা গড়া সিলিকেট এবং লোহা মেশানো পাথর দিয়ে। আগ্নেয়গিরির শিলা দিয়ে তৈরি বুধের উপরিতল অজস্র উল্কাপাতে খানাখন্দে ভরা, রঙ তার পাথুরে কালো। বুধে বায়ুমণ্ডল প্রায় নেই বললেই চলে, পৃথিবীর তুলনায় সেখানে বাতাসের চাপ প্রায় দশ হাজার ভাগ কম। বুধের আকাশ তাই দিনের বেলাতেও কালো এবং তারায় ভরা, অবশ্য সরাসরি সূর্যের দিকটা বাদ দিয়ে। বুধের রাতের আকাশে

যেটুকু রঙ দেখা যায়, তা শুধুমাত্র দুটি উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক থেকে আসে। তার একটি হলো ঘিয়ে রঙের শুক্রগ্রহ, আর সুন্দর নীল রঙের অন্যটি হলো আমাদের এই পৃথিবী।

সূর্য থেকে শুক্রগ্রহের গড় দূরত্ব প্রায় ১১ কোটি কিলোমিটার। আয়তনে ও ওজনে শুক্র আর পৃথিবী খুব কাছাকাছি, তাই পৃথিবীর মতো শুক্রও তার বায়ুমণ্ডলকে মাধ্যাকর্ষণের টানে ধরে রাখতে পারে। পৃথিবী থেকে দূরবীন দিয়ে দেখা যায় যে শুক্রের আকাশ সারাক্ষণ হলদে মেঘে ঢাকা। ১৯৬০-এর দশকে একের পর এক মার্কিন ও সোভিয়েত মহাকাশযান শুক্রের কাছে গিয়ে দেখেছে যে ওই মেঘগুলি পৃথিবীর মেঘের মতো জলভরা নয়। ওগুলি সালফিউরিক অ্যাসিড দিয়ে তৈরি। সালফিউরিক অ্যাসিডের গায়ে গন্ধকের কণা লেগে থাকার জন্য মেঘগুলি অমন হলদে দেখায়। সে মেঘ যদি শুক্রের একেবারে উপরিতল অবধি নেমে আসতো তাহলে তো শুক্রের গায়ে দাঁড়িয়ে কেবল হলদেটে কুয়াশা ছাড়া আর কিছুই দেখা যেতো না। মহাকাশযান থেকে নানান যন্ত্র ভরা প্যারাশুট শুক্রের গায়ে নামিয়ে দেখা গেছে যে মেঘের নিচে বায়ুমণ্ডল বেশ পরিষ্কার। দিনের বেলা খুব মেঘ করে এলে পৃথিবীতে আমরা যেমন আলো দেখি, শুক্রে দিনের বেলাতে সবসময়ই মোটামুটি সেই রকম ম্লান আলো থাকে।

আমাদের পৃথিবী সূর্য থেকে গড়পড়তা ১৫ কোটি কিলোমিটার দূরে ঘুরে চলে। উপরিতলের ৭১ শতাংশই জলে ঢাকা বলে খুব দূরের আকাশ থেকে পৃথিবীর বেশিটাই নীল রঙের দেখায়। একটু কাছাকাছি এলে সেই নীলের গায়ে ভেসে বেড়ানো সাদা মেঘ আর বরফে ঢাকা দুই মেরুর সাদা অঞ্চলগুলিও আকাশ থেকে বোঝা যায়। আরো কাছে এলে স্থল অঞ্চলগুলি এবং সেখানে সবুজ বন ও প্রান্তর, খয়েরি পাহাড় আর হলদে-সাদা বালিতে ঢাকা মরুভূমিও দেখা যায়। রাতের পৃথিবীতে দেখা যায় শহরে-গ্রামে মানুষের জ্বালানো বিজলি বাতির আলো।

তাছাড়া রাতের বেলা মাঝেসাঝে আর একটা চমৎকার রঙের খেলা দেখা যায় পৃথিবীর দুই মেরুতে। পৃথিবীর বাইরে থেকে তো বটেই, পৃথিবীর উপরেও উত্তর বা দক্ষিণ মেরুর কাছাকাছি জায়গা থেকে আকাশে তাকালে চোখে পড়ে সবুজ, নীল আর কখনো কখনো লাল আলোর ঝলকানি। সে আলোর ঝলক কিন্তু বিদ্যুতের মতো আঁকাবাঁকা রেখায় দেখা দেয় না, দেখায় আকাশের গায়ে বিশাল ঢেউখেলানো রঙিন চাদরের মতো। লাতিন ভাষায় উত্তর আর দক্ষিণ মেরুর এই আলোর নাম যথাক্রমে অরোরা বোরিয়ালিস আর অরোরা অস্ট্রালিস — বাঙলায় বলা হয় সুমেরুপ্রভা আর কুমেরুপ্রভা।

এই দুই মেরুপ্রভারই উৎস হলো সূর্য, কিন্তু সূর্যের আলো নয়, সূর্য থেকে আসা বস্তুকণা। সূর্যের গা থেকে তীব্র গতিবেগে বেরিয়ে আসে ইলেকট্রন আর প্রোটনের ঝাঁক। পৃথিবীর নিজস্ব একটা চুম্বকশক্তি আছে, যা অদৃশ্য বর্মের মতো কাজ করে ওই কণাগুলোকে বায়ুমণ্ডলের বেশির ভাগ অংশেই ঢুকতে দেয়না। কেবল মেরু অঞ্চলদুটিতে ওই চুম্বকশক্তির প্রভাবে কণাগুলি পথ বাঁকিয়ে এসে ধাক্কা দেয় বায়ুমণ্ডলে আর সেই

ধাক্কায় উত্তেজিত হয় বাতাসের অণু-পরমাণুগুলি। খানিক বাদে যখন অণু-পরমাণুগুলি আবার আগের নিরুত্তেজিত অবস্থায় ফিরে আসে তখন সে উত্তেজনার শক্তিটা বেরিয়ে আসে দৃশ্যমান আলোরূপে। অক্সিজেনের পরমাণু থেকে আসে ৫৫৮ আর ৬৩০ ন্যানোমিটার তরঙ্গদৈর্ঘ্যের সবুজ আর লাল আলো, নাইট্রোজেনের অণুগুলি দেয় ৪২৮ ন্যানোমিটার তরঙ্গদৈর্ঘ্যের নীল-বেগুনি আলো।

পৃথিবী থেকে প্রায় চার লক্ষ কিলোমিটার দূরে মাধ্যাকর্ষণের টানে বাঁধা রয়েছে চাঁদ। অমাবস্যার রাত বাদ দিলে আর মেঘের আড়াল না থাকলে প্রতিদিনই আকাশে সাদা রঙের চাঁদ দেখা যায়। ১৬০০ খ্রিষ্টাব্দ নাগাদ ইতালির বিজ্ঞানী গালিলেও গালিলেই তাঁর দূরবীন দিয়ে চাঁদের গায়ে পাহাড়, গহ্বর ইত্যাদি দেখেন। ১৯৬৪ সালে রেঞ্জার-৭ মহাকাশযান চাঁদের কাছাকাছি গিয়ে প্রচুর ছবি তুলে এনেছে। আর তারপরে ১৯৬৯ সালে অ্যাপোলো-১১তে চড়ে মানুষই পাড়ি দিয়ে এসেছে চাঁদের গায়ে। বুধের মতো চাঁদেও সাদা-কালো আর ধূসর রঙেরই প্রাধান্য। চাঁদের উপরিতল পৃথিবীর মতোই কালো পাথর আর সিলিকেট দিয়ে তৈরি। চাঁদের ওজন পৃথিবীর ওজনের একশোভাগের এক ভাগ মাত্র, তাই চাঁদ কোনো বায়ুমণ্ডল ধরে রাখতে পারে না। সেই জন্য চাঁদের আকাশের রঙ কালো -- সূর্যোদয় বা সূর্যাস্তর সময়ে সে আকাশে লাল রঙের ছোপ লাগে না।

মঙ্গলগ্রহ সূর্য থেকে মোটামুটি ২৩ কোটি কিলোমিটার দূরে। ১৮৭৭ খ্রিষ্টাব্দে ইতালীয় বিজ্ঞানী জোভান্নি স্কিয়াপারেল্লি দূরবীন দিয়ে মঙ্গলের উপরিতলের খালগুলি দেখেন। মঙ্গলের রঙ মোটামুটি লালচে, দুই মেরু পৃথিবীর মতোই বরফে ঢাকা আর তার আকাশে মেঘ ভেসে বেড়ায় -- এসব তথ্য দূরবীন দিয়ে দেখেই জানা হয়ে গেছিলো এবং তার উপরে ভিত্তি করে শুধু কল্পবিজ্ঞানীরাই নন, পার্সিভাল লোয়েল নামে এক মার্কিন জ্যোতির্বিজ্ঞানীও প্রস্তাব করেছিলেন যে ওখানে প্রাণ আর গাছপালা তো আছেই, এমনকি চাষ-বাস করতে পারে এমন উন্নত সভ্যতাও রয়েছে। ১৯৬৫তে মেরিনার ৪, ১৯৬৯ সালে মেরিনার ৬ ও ৭ আর ১৯৭১ সালে মেরিনার ৯ নামে মহাকাশযান মঙ্গলের আকাশে পাড়ি দিয়ে দেখে এলো যে ওই গ্রহের উপরটা চাঁদের মতোই রুক্ষ -- প্রাণের কোনো চিহ্নই সেখানে দেখা যায়নি এখনো। বীরভূম বা আমেরিকার অ্যারিজোনা রাজ্যের মাটি যে কারণে লাল দেখায়, মঙ্গলের উপরটাও সেই একই কারণে লাল — অর্থাৎ পাথরে যে লোহা থাকে সেটা অক্সিজেনের সঙ্গে মিশে লাল রঙের লৌহ অক্সাইড বা মরচে তৈরি করে বলে। ১৯৭৬ সালে মার্কিনদেশ থেকে পাঠানো ভাইকিঙ ১ ও ২ নামে মহাকাশযান কয়েক সপ্তাহর ব্যবধানে মঙ্গলের উষর মরুতে গিয়ে নামে। সেগুলির পাঠানো বার্তা থেকে জানা যায় যে মঙ্গলের ক্ষীণ বায়ুমণ্ডল সবসময়েই ধুলোতে ভরা। সেই ধুলোতে মরচে মেশানো থাকে বলে সূর্যের আলোর নীল অংশ ওই ধুলোতে শুষে যায় — বাকি রঙগুলো মিশে ওখানে দিনের আকাশ দেখায় লালচে

খয়েরি। সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তর সময়ে ঠিক পৃথিবীর মতোই মঙ্গলের আকাশও রক্তিম হয়ে ওঠে। মঙ্গলের বাতাসে যদি ধুলো না থাকতো, তাহলে লর্ড র‍্যালের তত্ত্ব অনুযায়ী, বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাই-অক্সাইডের অণু থেকে সাদা আলোর বিক্ষেপণের জন্য সেখানে দিনের আকাশ পৃথিবীর মতোই নীল দেখাতো। মঙ্গলের অন্তঃস্থলে চুম্বকশক্তি নেই বলে ওখানে মেরুপ্রভাও প্রায় দেখাই যায় না।

সৌরমণ্ডলের সবচেয়ে বড়ো গ্রহ বৃহস্পতির কক্ষপথ সূর্য থেকে প্রায় ৭৮ কোটি কিলোমিটার দূরে। ১৯৭৩ ও ১৯৭৪ সালে পাইওনিয়ার ১০ ও ১১ নামে দুটি মহাকাশযান বৃহস্পতির কাছাকাছি গিয়ে ছবি তুলে পাঠায়। বৃহস্পতির গায়ে যে একটা লাল রঙের ছোপ আছে তা ১৬৭৭ সালেই ফরাসী বিজ্ঞানী জোভান্নো দোমেনিকো (বা জঁ দোমিনিক) কাসিনি আবিষ্কার করেন। পরে জানা গেছে যে ওই ছোপটা আসলে একটা তুমুল ঝড় আর হিসেব করে দেখা গেছে যে ওই ছোপটার মাপ প্রায় পৃথিবীর সমান। ওটার রঙ লাল কেন তা নিয়ে বিজ্ঞানীরা পুরোপুরি নিশ্চিত নন। অনুমান করা হয় যে বৃহস্পতির ভিতর থেকে আসা ফসফরাস বা গন্ধকের জন্যই হয়তো ওই ছোপটা অমন লাল। বৃহস্পতির গায়ে রঙিন ফিতের মতো দাগে সাদা, লাল, কমলা মেঘ ভেসে বেড়াতে দেখা যায়। ওই রঙগুলি আসে বৃহস্পতির আকাশে জমে যাওয়া জল, অ্যামোনিয়া, মিথেন ইত্যাদি কণা থেকে সূর্যের আলোর বিক্ষেপণে। ১৯৭৯ সালে ভয়েজার ১ ও ২ নামে দুটি মহাকাশযান বৃহস্পতির কাছে গিয়ে দেখে ওই সব মেঘের গায়ে নানা রঙের বিদ্যুতের ঝলক আর দুই মেরুতে পৃথিবীর মতোই নানা রঙের মেরুপ্রভা।

গালিলেও ১৬১০ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ বৃহস্পতির বড়ো বড়ো চারটে উপগ্রহ তাঁর দূরবীন দিয়ে আবিষ্কার করেন। ১৯৭০এর দশকে পাইওনিয়ার আর ভয়েজার মহাকাশযানগুলি বৃহস্পতির কাছে গিয়ে শুধু ওইগুলি সম্বন্ধেই নয়, বৃহস্পতির আরো অজস্র উপগ্রহ এমনকি একটা বলয়েরও অনেক খবর পাঠিয়েছে। সবচেয়ে বড়ো উপগ্রহ হলো গ্যানিমেড, চাঁদের দ্বিগুণ তার ভর। তারপরে আসে ক্যালিস্তো, চাঁদের চেয়ে প্রায় দেড়গুণ ভারি; আয়ো; চাঁদের চেয়ে কুড়ি শতাংশ মতো ভারি আর ইউরোপা, যার ভর চাঁদের ভরের দুই তৃতীয়াংশ মতো। আয়ো ছাড়া অন্য তিনটিই বরফে ঢাকা সাদা জগৎ।

আয়ো বৃহস্পতির সবচেয়ে কাছের উপগ্রহ। ১৯৭৯ সালে ভয়েজার ১ আয়োর কাছাকাছি পৌঁছোনোর এক সপ্তাহ আগেই স্ট্যান পীল নামে এক মার্কিন বিজ্ঞানী ও তাঁর সহকর্মীরা হিসেব কষে প্রস্তাব করেন যে আয়োর গায়ে আগ্নেয়গিরি আছে। ভয়েজার আয়োর কাছে গিয়ে দেখলো প্রস্তাবটা পুরোপুরি ঠিক — আয়োর গা সত্যিই অজস্র জ্বলন্ত আগ্নেয়গিরিতে ভরা। মাথা খাটিয়ে বের করা প্রস্তাবনার সঙ্গে বাস্তবের এমন মিল বিজ্ঞানের জগতে আলোড়ন তুলেছিলো। আয়োর আগ্নেয়গিরিগুলি থেকে বেরিয়ে আসে গলিত গন্ধক আর গন্ধকের নানান যৌগ। ১১২ ডিগ্রি সেলসিয়াসের চেয়ে বেশি

তাপমাত্রায় গন্ধক গলে কালো রঙ নেয়। তাপমাত্রা কমলে জমে আসা গন্ধক হয়ে যায় হলদে-কমলা রঙের। গন্ধক আর অক্সিজেনের যৌগ সালফার ডাই-অক্সাইড আরো ঠান্ডায় জমে গিয়ে সাদা রঙ নেয়। আয়োর গায়ে নানান তাপমাত্রায় তাই কালো, হলদে, কমলা, সাদা এই রকম নানা রঙগুলিই দেখতে পাওয়া যায়।

পৃথিবী থেকে আয়োর দিকে দূরবীন তাক করলে দেখা যায় যে আয়োকে ঘিরে রয়েছে হলুদ একটা প্রভা। সেটার উৎস কিন্তু আগ্নেয়গিরি থেকে নিঃসৃত গন্ধক নয়। যে সব গ্রহের নিজস্ব চুম্বকশক্তি আছে সেগুলিকে ঘিরে থাকে বিকিরণের বলয়। ১৯৬১ সালে মার্কিন পদার্থবিদ জেমস ভ্যান অ্যালেন এই বলয়গুলির অস্তিত্ব প্রমাণ করেন বলে ওগুলিকে বলা হয় 'ভ্যান অ্যালেন' বলয়। বলয়গুলিতে ছুটে বেড়ায় অজস্র ইলেকট্রন ও প্রোটনের কণা। আয়ো বৃহস্পতির এতোই কাছে যে বৃহস্পতির ভ্যান অ্যালেন বলয় আয়োর গায়ে এসে পড়ে। সে বলয়ে থাকা কণাগুলির ধাক্কায় আয়োর গা থেকে উবে আসে নানান অণু, পরমাণু, যার মধ্যে সোডিয়াম ধাতুর পরমাণুও থাকে। সূর্যের আলো পড়লে সোডিয়াম পরমাণুগুলি যেমন হলুদ আলো শুষে নিয়ে উত্তেজিত হয়, তেমনই নিরুত্তেজিত হয়ে সেই হলুদ আলোই আবার সবদিকে ছড়িয়ে দেয়। সোডিয়াম থেকে আসা সেই আলোটাই আয়োর হলুদ প্রভারূপে দেখা যায়।

সূর্য থেকে শনিগ্রহের দূরত্ব মোটামুটি ১৪৩ কোটি কিলোমিটার। শনির আয়তন বৃহস্পতির চেয়ে একটু ছোটো। শনির রঙ বৃহস্পতির মতোই - শনিও লাল, কমলা আর সাদা মেঘে ঢাকা। বৃহস্পতিরও বলয় আছে, কিন্তু সেটা কেবল কাছাকাছি গেলেই দেখা যায়। শনির বলয় মানুষ পৃথিবীতে বসেই বহুদিন আগে দেখেছে। ১৬৭৫ খ্রিস্টাব্দে কাসিনি শনির বলয়ে একটা ৫০০০ কিলোমিটারব্যাপী ফাঁক আবিষ্কার করেন। তারপরে জানা গেছে যে শনির বলয় কেবল একটা-দুটো নয়, ওগুলি অজস্র বলয়ের সমষ্টি। বরফ দিয়ে তৈরি অথবা বরফে ঢাকা বলে বলয়গুলির রঙ মোটামুটি সাদা। শনির নিজস্ব চুম্বকশক্তি আছে বলে তার দুই মেরুতেও জ্বলে থাকে নানা রঙের মেরুপ্রভা। পাইওনিয়ার-১১ শনির কাছাকাছি পৌঁছেছে ১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দে। তারপরে ১৯৮০ ও ১৯৮১ সালে শনিগ্রহর কাছে গেছে ভয়েজার ১ ও ২। ২০০৪ সালে ইউরোপের কয়েকটি দেশ মিলে শনিতে পাঠিয়েছে কাসিনি-হাইগেন্স মহাকাশযান। সেটা গিয়ে শনির গায়ে দেখেছে বিদ্যুতের তীব্র ঝলক — পৃথিবীর আকাশে যে বিদ্যুৎ দেখা যায় তার তুলনায় সেগুলির তেজ হাজার গুণ বেশি। তার উপরে আবার শনিতে তুমুলভাবে চলছে সৌরমণ্ডলের সবচেয়ে বড়ো ঝড়।

শনির সবচেয়ে বড়ো উপগ্রহ টাইটানে পৃথিবীর মতোই নাইট্রোজেন ভরা বায়ুমণ্ডল আছে। টাইটানে বাতাসের চাপও পৃথিবীর মতোই, সত্যি বলতে কী, পৃথিবীতে যা বাতাসের চাপ তার চেয়ে একটু বেশিই। অনেক বিজ্ঞানীর আশা ছিলো যে পৃথিবীর মতোই টাইটানে নীল আকাশ আর রক্তিম সূর্যোদয়-সূর্যাস্ত তো দেখা যাবেই, তার ওপর
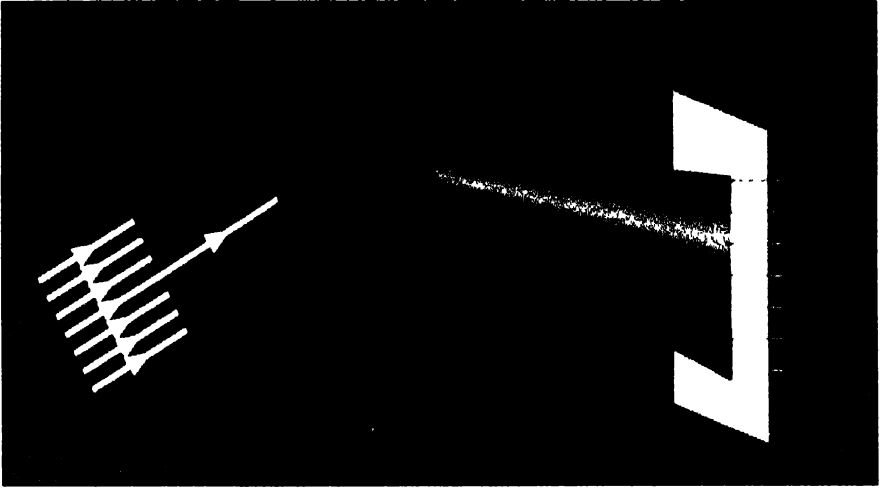
১ নং ছবি (২০ পৃষ্ঠা)

২ নং ছবি (২১ পৃষ্ঠা)

৬ নং ছবি (২৫ পৃষ্ঠা)
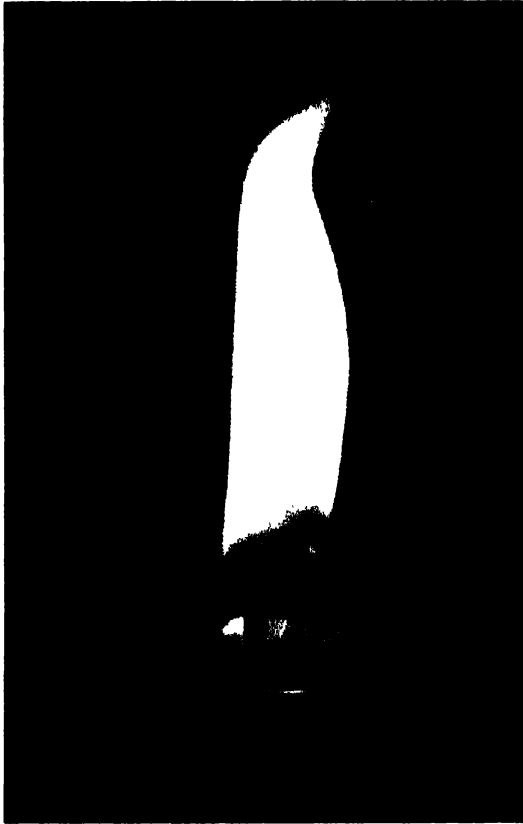
১৯ নং ছবি (৮৮ পৃষ্ঠা)
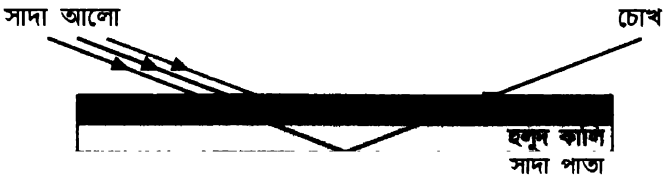
৩২ নং ছবি (১৬০ পৃষ্ঠা)

৩৫ নং ছবি (১৭০ পৃষ্ঠা)

৪০ নং ছবি (২১২ পৃষ্ঠা)
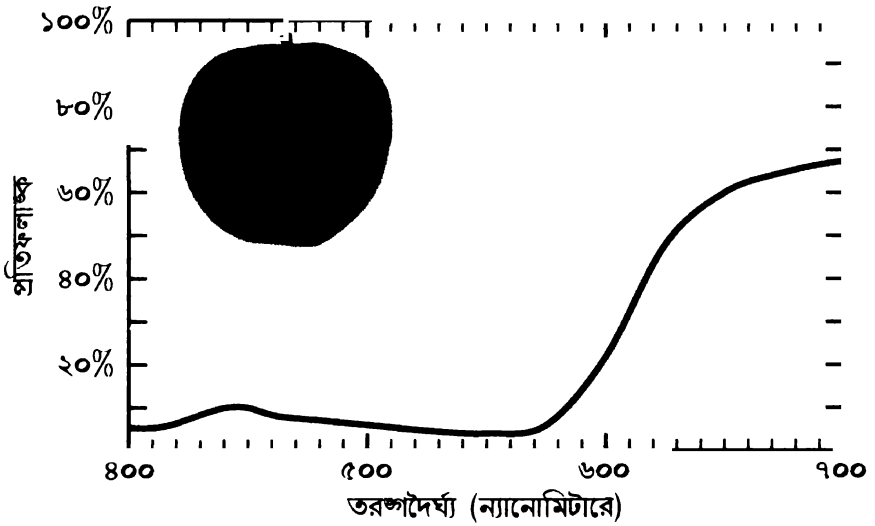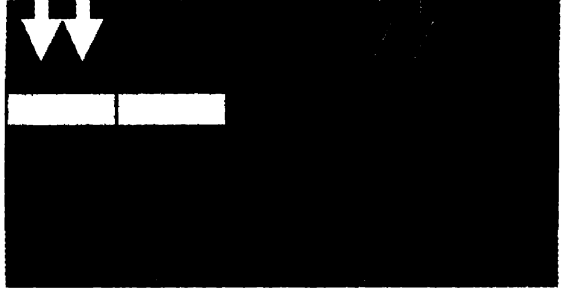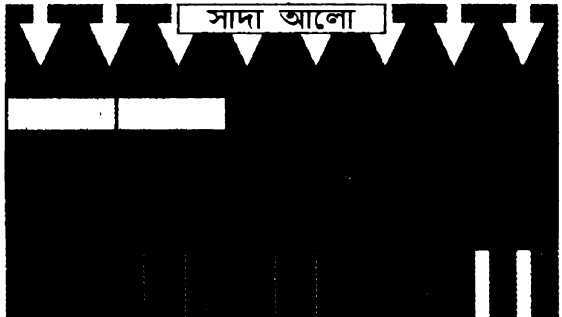
সে নীল আকাশে দেখা যাবে বলয় সমেত বিশাল শনিগ্রহর অপরূপ দৃশ্য। কিন্তু ১৯৮০ সালে ভয়েজার ১ দেখে এলো যে টাইটানের আকাশ ঘন মেঘে ঢাকা। কমলা রঙের সে মেঘ মিথেন আর নাইট্রোজেন দিয়ে গড়া। ইথেন, অ্যাসিটিলিন, ইথিলিন, হাইড্রোজেন সায়ানাইড ইত্যাদি অন্য নানা উপাদানও সে মেঘে রয়েছে। রেডিও তরঙ্গ দিয়ে অনুসন্ধান করে দেখা গেছে যে মেঘের নিচে টাইটানের উপরিতল বরফে ঢাকা।

বৃহস্পতি আর শনি যেমন একই ধরনের জিনিশ দিয়ে গড়া আর মোটামুটি একই রকম দেখতে, তেমনি ইউরেনাস ও নেপচুন দুটো গ্রহই হাইড্রোজেন, হিলিয়াম ও মিথেন দিয়ে তৈরি বলে তারাও দেখতে একই রকম। সূর্য থেকে যথাক্রমে ২৮৭ কোটি কিলোমিটার আর ৪৪৯ কোটি কিলোমিটার দূরের এই গ্রহ দুটিরই রঙ নীল। তার কারণ মিথেন গ্যাস সাদা আলো থেকে লাল ও হলুদ অংশগুলি শুষে নেয়, প্রতিফলিত হয়ে আসে কেবল নীল আলো।

সৌরমণ্ডলের সদস্যদের তালিকায় এর পরের স্থান প্লুটোর। আমাদের চাঁদের চেয়েও ছোট এই প্লুটো, তাকে ঠিক গ্রহের মর্যাদা দেওয়া উচিত কিনা তাই নিয়ে বিতর্ক ছিলো। প্লুটোর আবিষ্কার ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে। তখন থেকে ২০০৬ সাল অবধি প্লুটোকে গ্রহ বলেই ধরা হতো। কিন্তু প্লুটো আবিষ্কারের পর সৌরমণ্ডলে আরো অনেক বস্তুর সন্ধান পাওয়া গেছে যাদের ওজন ও আয়তন প্লুটোর কাছাকাছি। তাদের জুড়ে জুড়ে গ্রহের সংখ্যা ক্রমাগত বাড়িয়ে যাওয়াটা বেশ অসুবিধের ব্যাপার। তাই ২০০৬ সালের অগস্ট মাসে আন্তর্জাতিক জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের এক সংস্থা 'গ্রহ' বলতে কী বোঝায় তার সংজ্ঞা নির্দিষ্ট করলো। সেই নতুন সংজ্ঞায় গ্রহের তালিকা থেকে প্লুটোর নাম পড়ল কাটা। প্লুটো এখন পড়েছে 'বামন গ্রহ' নামে এক নতুন দলে।

প্লুটো সম্বন্ধে বিজ্ঞানীদের কৌতূহল অবশ্য তাতে মিটে যায়নি। ২০০৬ সালে 'নিউ হোরাইজনস' বা 'নতুন নানা দিগন্ত' নামে এক মার্কিন অভিযান পাড়ি দিয়েছে মহাকাশে। ২০১৫ সালের জুলাই মাসে সেটার প্লুটোর কাছে পৌঁছোনোর কথা। সে অভিযান সফল হলে আমরা প্লুটোর রঙ কীরকম তা জানতে পারবো।

> বলতেন পারী-বাসী জোভান্নো দোমেনিকো কাসিনি
> জ্যোতিষ-শাস্ত্র আমি জানলেও তার মোহে ভাসিনি।
> দূরবীন করে খাড়া
> দেখি আমি গ্রহ-তারা
> জ্যোতিষচর্চা করা একেবারে বৃথা কালনাশিনী!

৬ : লাল তারা নীল তারা

পলাশ বরন পাল

শহরাঞ্চলে আজকাল ধুলো-ধোঁয়া হয়ে, বায়ুদূষণ হয়ে এমন অবস্থা হয়েছে যে আকাশের দিকে তাকিয়ে গুটিকতক মাত্র তারা দেখতে পাওয়া যায়। সে কটা তারার মধ্যে আবার যদি রঙের তফাত করতে বলা হয়, তাহলে তা খুবই মুশকিলের ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়।

গ্রামাঞ্চলে অত দূষণ নেই, সেখানে অনেক তারা দেখা যায়, এবং চেষ্টা করলেই বোঝা যায় যে এক একটার রঙ এক এক রকম। একেবারে রামধনুর সাত রঙের বৈচিত্র্য দেখা যায় না বিভিন্ন তারার রঙে, কারণ তারাদের এতো ছোটো দেখায় যে ওইটুকুর মধ্যে অতো রঙের তফাত বোঝা যায় না। তবে এটুকু দিব্যি বোঝা যায়, সবগুলোর রঙ এক রকম নয়। কোনো কোনোটার রঙ নীল ঘেঁষা, কতোগুলোর রঙ লালচে। প্রশ্ন হচ্ছে : কেন?

এ কথার উত্তর দেওয়ার আগে অন্য একটা কথা চিন্তা করা যাক। কামারশালায় কামার যখন লোহা গরম করেন আগুনে, তখন সেই গরম লোহার রঙ কেমন দেখায়? একটু ধান ভানতে শিবের গীতের মতো মনে হতে পারে প্রশ্নটা, কিন্তু আসলে যে তা নয়, তা ক্রমশ প্রকাশ্য।

এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া মুশকিল, কারণ প্রশ্নটাই পরিষ্কার নয়। কতোখানি গরম করা হয়েছে, সে কথাটা না বললে উত্তর দেওয়া অসম্ভব। ঠান্ডা অবস্থায় লোহার যে রকম রঙ, অল্পস্বল্প তাপ দিলেও সেই রঙই থাকে। গরম করতে করতে এক সময়ে লোহার ভেতর থেকে লাল আভা বেরোতে শুরু করে। আরো গরম করলে সেই আভার রঙ ক্রমশ হলুদের দিকে সরতে থাকে।

যে কোনো কিছুকে গরম করা মানে তার ভেতরে শক্তি সরবরাহ করা। শক্তি সরবরাহ করলে অনেক কিছু হতে পারে। কাঠ বা কাগজ একটু গরম করলেই পুড়ে যায়, অর্থাৎ তাদের সঙ্গে বাতাসের অক্সিজেন মিশে কোনো রকমের রাসায়নিক পরিবর্তন হয়। জল গরম করলে উবে যায় বাষ্প হয়ে। এ ক্ষেত্রে পরিবর্তনটা রাসায়নিক নয়, ভৌত অবস্থার বদল — তরল থেকে বায়বীয়। তা হোক, তবু বদল হচ্ছে।
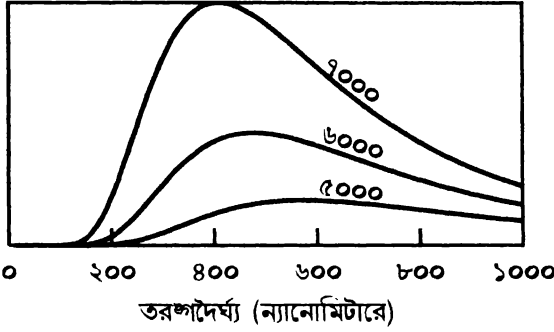
১২ নং ছবি॥ *বস্তুর তাপমাত্রার সঙ্গে তা থেকে বিকিরিত শক্তির সম্পর্ক কী রকম? ঢিপির মতো দাগগুলো যেখানে যতো উঁচু, সেখানে ততো বেশি বিকিরণ হচ্ছে। তিনটি ঢিপি তিন রকম তাপমাত্রার বস্তুর জন্য, কেলভিনের হিসেবে তাপমাত্রা দেখানো হয়েছে প্রতিটি রেখার পাশে।*

কামারশালায় যখন লোহা গরম করা হয়, তখন এ সব কিছুই হয় না। পদার্থের কোনো রকম পরিবর্তন হয় না। আগুন থেকে সে শক্তি নেয়, আবার নিতে নিতে নিজেও খানিকটা শক্তি ছেড়ে দেয়। কামারশালায় লোহা গরম করতে থাকলে এইটাই হয়, কয়েকশো ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় পৌঁছোলে লোহা থেকে যে শক্তি বেরোয়, তাকেই আমরা দেখি আলো হিসেবে।

এই সব ক্ষেত্রে বলা যায়, শক্তির সঙ্গে পদার্থের একটা সহাবস্থান হচ্ছে। এই সহাবস্থানের নিয়মকানুন উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে জানা গিয়েছিলো। জানা গিয়েছিলো, এই অবস্থায় বস্তু থেকে যে শক্তি বেরোয়, তা শুধু একরঙা হয় না। নানা রঙের, অর্থাৎ নানা তরঙ্গদৈর্ঘ্যের ঢেউ মিলেমিশে থাকে এর মধ্যে। বিভিন্ন তরঙ্গদৈর্ঘ্যের ঢেউয়ের তেজও আবার সমান হয় না। খুব ছোটো তরঙ্গদৈর্ঘ্যের ঢেউয়ের শক্তি বেরোয় খুব কম। খুব বেশি তরঙ্গদৈর্ঘ্য হলেও সেই একই কথা। মাঝামাঝি জায়গায় শক্তির তেজ সবচেয়ে বেশি।

বললাম তো, কিন্তু সেই 'মাঝামাঝি'-টা কোন তরঙ্গদৈর্ঘ্যে? এ প্রশ্নের উত্তর আবিষ্কার করেন ভিলহেল্‌ম্ ভীন, উনবিংশ শতাব্দীর শেষে। তিনি দেখান, বিকিরণের জোর কোন তরঙ্গদৈর্ঘ্যে সবচেয়ে বেশি হচ্ছে, তা নির্ভর করে যে বস্তুটা বিকিরণ করছে, তার তাপমাত্রার ওপরে। বস্তুর তাপমাত্রা যতো বেশি হবে, বিকিরণের জোর হবে ততো কম তরঙ্গদৈর্ঘ্যে। মোটামুটিভাবে এই কথাটাই বোঝাবার চেষ্টা করা হয়েছে ১২ নম্বর ছবিতে। ছবিটায় তিনটে দাগ আঁকা হয়েছে, তিনটে বিভিন্ন তাপমাত্রার বস্তু থেকে কী রকম বিকিরণ হয় তা বোঝাবার জন্য। একেবারে নিচে যে রেখাটা, তার

ক্ষেত্রে তাপমাত্রা সবচেয়ে কম। তার ওপরের রেখাটার জন্য তাপমাত্রা মাঝামাঝি, আর সবচেয়ে ওপরের রেখাটার বেলায় তাপমাত্রা সবচেয়ে বেশি। রেখাগুলো দিয়ে দেখানো হচ্ছে, কোন তরঙ্গদৈর্ঘ্যে বিকিরণের জোর কেমন। যেখানে রেখাটা উঁচু, সেখানে বিকিরণ জোরালো। সবচেয়ে কম তাপমাত্রার বস্তু থেকে যে বিকিরণ, তার ঢিপিটা সবচেয়ে ডানদিকে। এর অর্থ, লম্বা তরঙ্গের প্রাধান্য এই তাপমাত্রায়। তার পরের রেখায় তাপমাত্রা খানিকটা বেশি, ছবিতে তার ঢিপিটা আর একটু বাঁদিকে, অর্থাৎ কম তরঙ্গদৈর্ঘ্যের দিকে। সবচেয়ে ওপরের রেখাটির ক্ষেত্রে তাপমাত্রা সবচেয়ে বেশি, তার ঢিপিটিও সবচেয়ে কম তরঙ্গদৈর্ঘ্যে।

কোন দাগের জন্য তাপমাত্রা কতো, তার সঙ্গে কোন ঢিপি কোথায় সবচেয়ে উঁচু, তার একটা সহজ সম্পর্ক আছে। আমরা যে তিনটি তাপমাত্রার জন্য ছবি এঁকেছি, তার একটা ৫০০০, দ্বিতীয়টা ৬০০০, তার পরে ৭০০০। যদি মেপে দেখা যায় ছবির বাঁ দিকের প্রান্ত থেকে এই দাগগুলোর সর্বোচ্চ বিন্দু কতোটা দূরে, দেখা যাবে এই দূরত্বের অনুপাত ৭ বনাম ৬. বনাম ৫, অর্থাৎ তাপমাত্রার ঠিক উল্টো অনুপাত। তবে এখানে যে তাপমাত্রার কথা বলা হচ্ছে, তা কিন্তু সেলসিয়াসে মাপা নয়। এ অন্য রকম মাপ, একে বলে চরম তাপমাত্রা। সেলসিয়াসে যে কোনো বস্তুর যা তাপমাত্রা, তার সঙ্গে ২৭৩ যোগ দিয়ে পাওয়া যায় এই চরম তাপমাত্রার মান, বলা হয় তাপমাত্রা অতো কেলভিন। অর্থাৎ কোনো বস্তুর তাপমাত্রা ২৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস হলে আমরা বলবো তার চরম তাপমাত্রা ৩০০ কেলভিন, ১০০ ডিগ্রি সেলসিয়াস হলে ৩৭৩ কেলভিন। এই কেলভিন তাপমাত্রা দিয়ে যদি ৩০ লক্ষকে (বা, আরো খুঁটিয়ে বললে, ২৮ লক্ষ ৮০ হাজার বা ২৮,৮০,০০০-কে) ভাগ দেওয়া যায়, তাহলে যা ভাগফল হবে, ততো ন্যানোমিটার তরঙ্গদৈর্ঘ্যে বিকিরিত শক্তির জোর হবে সবচেয়ে বেশি। এইটাই হলো ভীনের আবিষ্কার।

গোটা ঢিপিটার চেহারা কেমন হবে, অর্থাৎ তার কোন জায়গাটা কতো উঁচু হবে, তার মধ্যেও কিছু বিস্ময় ছিলো। দেখা গিয়েছিলো, শক্তির সঙ্গে বস্তুর পদার্থের সাম্যাবস্থা যদি প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহলে বিকিরিত শক্তির ধর্ম নির্ভর করে শুধুমাত্র বিকিরক বস্তুর তাপমাত্রার ওপরে। বস্তুটির উপাদান, বা সে কীভাবে শক্তি পাচ্ছে, সে সবের সঙ্গে এই চেহারাটার কোনো সম্পর্ক নেই। যে ভাবেই শক্তি পাক, বস্তু যা দিয়েই তৈরি হোক, কোন তরঙ্গদৈর্ঘ্যের কতোটা শক্তি বিকিরিত হচ্ছে তা নির্ধারিত হবে কেবলমাত্র বস্তুর তাপমাত্রা দিয়ে।

কী বস্তু বিকিরণ করছে এ সব খুঁটিনাটির মধ্যে না গিয়ে, পদার্থ এবং শক্তির একেবারে বুনিয়াদি স্তরের ধর্ম থেকেই তাহলে বলতে পারা উচিত ঢিপিটার চেহারা ঠিক কেমন হবে। সে চেষ্টা প্রথম করেছিলেন লর্ড র‍্যালে আর জেম্‌স্ জীন্‌স্। পদার্থবিদ্যার যে সব তত্ত্ব সেকালে প্রতিষ্ঠিত ছিলো, তা ব্যবহার করে তাঁরা বার করেন তরঙ্গদৈর্ঘ্যের

সঙ্গে বিকিরিত শক্তির জোরের সম্পর্ক কী রকম হবে। খুব বড়ো তরঙ্গদৈর্ঘ্যে তাঁদের হিসেব মিলেছিলো, কিন্তু ঢিপির যেমন মাঝখানটা উঁচু আর দু পাশটাই নিচু, তেমন চেহারাই তাঁরা পাননি। তাঁদের হিসেবে দেখা গিয়েছিলো, তরঙ্গদৈর্ঘ্য যতো কম হবে, বিকিরিত শক্তির জোরও ততো বেশি হওয়া উচিত। বাস্তবের সঙ্গে ফারাকের পরিমাণ শোচনীয়।

এরপরে ভীন একটি সমীকরণ লিখে দেখতে গেলেন পরীক্ষার ফলের সঙ্গে তা মেলে কিনা। ছোটো তরঙ্গদৈর্ঘ্যের জন্য মিললো ভালোই। বড়ো তরঙ্গদৈর্ঘ্যে তাঁর সূত্র যা দেয় তাকে শোচনীয় বলা যায় না, তবে ঠিকও বলা যায় না — বেশ খানিকটা অসঙ্গতি থাকে বাস্তবের সঙ্গে। পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে ঢিপিটার সম্পর্কে যা তথ্য জানা গিয়েছিলো, তার সঙ্গে খাপে খাপে মিলে যায় এমন একটা অঙ্কের সূত্র বার করলেন মাক্স প্লাঙ্ক, ১৯০০ খ্রিস্টাব্দে ঘোষিত হলো তাঁর এই সূত্র। প্লাঙ্ক বললেন, শক্তি সম্পর্কে যে সব ধারণা তখন প্রচলিত ছিলো - যেমন আলো এক রকম ঢেউ সেগুলির আমূল পরিবর্তন না করলে এই সূত্র ব্যাখ্যা করা যাবে না। ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে আলবার্ট আইনস্টাইন দেখালেন, পদার্থের সঙ্গে আলো শক্তি বিনিময় করে কণার মাধ্যমে। এ থেকে মনে হলো, আলোর কিছু কিছু ধর্ম ঢেউয়ের মতো নয়, কণার মতো। এই অনুভবটি যুগান্তকারী হয়েছিলো, এ থেকেই কোয়ান্টাম তত্ত্বের সূত্রপাত ঘটেছিলো। কোয়ান্টামের ধারণা অবলম্বন করে প্লাঙ্ক নিজে তাঁর সূত্রের একটা ব্যাখ্যা দেন, তবে সে ব্যাখ্যাটি ছিলো নড়বড়ে। সন্তোষজনক ব্যাখ্যা পাওয়া যায় ১৯২৪-এ, দেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত নবীন অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু। প্লাঙ্ক যে সূত্র বলেছিলেন, সেটাই তিনি অঙ্ক কষে প্রমাণ করেন কোয়ান্টাম তত্ত্বের সাহায্যে। ছবি আঁকার সময়ে আমরা প্লাঙ্কের ফর্মুলাটাই ব্যবহার করেছি।

এইবার তারার কথায় আসা যাক। তারার মধ্যে ইলেকট্রন প্রোটন ইত্যাদি কণা রয়েছে। পদার্থের পরিমাণ প্রচুর। যেমন ধরা যাক সূর্য — সেটাও তো একটা তারাই, মাঝারি মাপের তারা - সেটাও পৃথিবীর তুলনায় হাজার গুণেরও বেশি ভারি। এতোটা পরিমাণ জিনিশ ওপর থেকে চাপ দেয় বলে ভেতর দিকের তাপমাত্রা খুব বেশি, সেখানে পদার্থের মধ্যে নানা রকমের বিক্রিয়া চলতে থাকে। তাতে হাইড্রোজেনের মতো হালকা পদার্থের নিউক্লিয়াস জুড়ে জুড়ে তৈরি হয় হিলিয়াম এবং আরো ভারি ভারি নিউক্লিয়াস। এবং এই কর্মকাণ্ডে খানিকটা শক্তি উদ্বৃত্ত থেকে যায়। সেই শক্তিটাই বেরিয়ে আসে। সূর্য বা অন্য যে কোনো তারা এই কারণেই শক্তি বিকিরণ করে, সেই জন্যই তাদের আমরা দেখি জ্যোতির্ময় রূপে, তাদেরকে বলি জ্যোতিষ্ক।

বিক্রিয়ার ফলে সূর্যের কেন্দ্রের কাছাকাছি মুক্তি পায় যে শক্তি, তা কিন্তু অবাধে বেরিয়ে আসতে পারে না। বেরিয়ে আসার পথে বাইরের দিকের বস্তুর সঙ্গে সেই শক্তির ঠোকাঠুকি হয়। তাতে বস্তু কখনো শক্তি শুষে নেয়, কখনো আবার তা ছেড়ে দেয়।

অর্থাৎ এখানেও পদার্থ আর বস্তুর সহাবস্থান, কামারশালার লোহার মতো। তাহলে বিকিরিত শক্তি থেকে জানা যেতে পারে বস্তুর তাপমাত্রা। মাপজোক করে দেখা যায়, বিকিরণের আলোর জোর সবচেয়ে বেশি হয় ৫০০ ন্যানোমিটারের কাছাকাছি, অর্থাৎ মোটামুটি নীলচে-সবুজ রঙে। ভীনের সূত্র প্রয়োগ করে এর থেকে আমরা বার করতে পারি, সূর্যের বাইরের দিকটার তাপমাত্রা ৫৭০০ কেলভিন।

এই তাপমাত্রা সূর্যের 'বাইরের দিকের' এ কথাটা লক্ষণীয়। আগেই বলেছি, ভেতরের দিক থেকে আলো সরাসরি আসতে পারে না আমাদের কাছে — বাইরের দিকের বস্তুর সঙ্গে সহাবস্থানের পরে তা সূর্য থেকে বেরোয়। তার চালচরিত্র তাই নির্ভর করে শুধুই বাইরের স্তরের বস্তুর ওপরে, আলো থেকে তাই জানা যায় ওই অংশটির তাপমাত্রা। সূর্যের অন্দরমহলে তাপমাত্রা এর চেয়ে অনেক অনেক বেশি, তবে রঙ সম্পর্কিত এই আলোচনায় সে খবরে আমাদের দরকার নেই।

এ কথা অন্য যে কোনো তারার ক্ষেত্রেও সত্যি। যেটুকু তফাত, তা হলো, তাপমাত্রা সব তারার সমান নয়। কোনো তারার খোসার তাপমাত্রা যদি ৫৭০০ না হয়ে ৭০০০ কেলভিন হয়, তাহলে তা থেকে বিকিরিত আলো সবচেয়ে জোরালো হবে দৃশ্যমান আলোর প্রান্তসীমায়, মোটামুটি ৪১০ ন্যানোমিটারে। তেমনি, ৫৭০০ না হয়ে ৪৫০০ কেলভিন তাপমাত্রা যে তারার বহির্ভাগের, তার থেকে যে আলো বার হয় তাতে লাল রঙই হবে সবচেয়ে উজ্জ্বল।

রাতের আকাশের সবচেয়ে উজ্জ্বল তারা হলো লুব্ধক। এর বাইরের তাপমাত্রা প্রায় ১০,০০০ কেলভিন। লুব্ধক থেকে যে শক্তি আসে, তার সবচেয়ে বেশি জোর হয় ৩০০ ন্যানোমিটার তরঙ্গদৈর্ঘ্যে, অর্থাৎ তা মানুষের চোখে যতো ছোটো তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলো দেখা সম্ভব, সেই সীমানার বাইরে। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে আলো শুধু ওই একটি তরঙ্গদৈর্ঘ্যেই আসে না। (৫১ পৃষ্ঠায়) ১২ নম্বর ছবিতে যে রকম দেখানো হয়েছে, এরও সে রকম একটা বিস্তার থাকে। ৪০০ ন্যানোমিটারের বেশি তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলোও থাকে, তার চেয়ে বেশিও থাকে। তবে যতো লম্বা ঢেউ হবে, তার তেজও ততো কম হবে — ছবিতে যেমন দেখা যাচ্ছে, ঢিপির সবচেয়ে উঁচু জায়গাটা পার হয়ে গেলে তার পরে তরঙ্গদৈর্ঘ্য বাড়লে তেজ ক্রমশই কমে যায়। ৪০০-র কাছাকাছি, অর্থাৎ বেগুনি বা নীলের দিকটাতেই বেশি আলো আসে, আরো বড়ো তরঙ্গদৈর্ঘ্যের সবুজ-হলুদ-লাল আলোর তেজ হয় অপেক্ষাকৃত কম। তাই নীলেরই প্রাধান্য, সব মিলিয়ে লুব্ধকের রঙ নীলচে লাগে।

রাতের আকাশে লুব্ধকের পরেই যে তারাটা সবচেয়ে উজ্জ্বল তা হলো অগস্তি বা ক্যানোপাস। তার বাইরের দিকের তাপমাত্রা ৭৫০০ কেলভিন। এর গা থেকে যে আলো আসে তা সবচেয়ে জোরালো মোটামুটি ৪০০ ন্যানোমিটারে, তাই এই তারাটিকে দেখায় ঘন নীল।

ঔজ্জ্বল্যে অগস্তির পরে আসে আলফা সেন্টাউরি নামক তারাটি। তার তাপমাত্রা মোটামুটি সূর্যেরই মতো, তাই তার থেকে যে আলো আসে তার তেজ সবচেয়ে বেশি নীলচে সবুজ রঙে, সূর্যের আলোর মতোই। তার পরে যে তারাটি সবচেয়ে উজ্জ্বল তা হলো স্বাতী। তার গায়ের তাপমাত্রা ৪৩০০ কেলভিন, এবং তার রঙ লাল, কেননা তার থেকে সবচেয়ে জোরালো যে বিকিরণ আসে তা হলো ২৮৮০০০০ ÷ ৪৩০০ বা ৬৭০ ন্যানোমিটারের লাল আলো।

অর্থাৎ নীল তারা হলো গরম তারা, লাল তারা তুলনায় ঠান্ডা।

● -- ○ — ● — ○ — ●

আলোর রঙ থেকে যে তারাদের তাপমাত্রাই শুধু জানা যায় তা নয়, তারাগুলি কী দিয়ে তৈরি সে তথ্যও পাওয়া যায়। ১৮০২ খ্রিস্টাব্দে উইলিয়াম ওয়ালাস্টন সূর্যের বর্ণালি খুঁটিয়ে দেখতে গিয়ে লক্ষ করেন, তার মধ্যে কিছু কিছু কালো দাগ রয়েছে, অর্থাৎ কিছু কিছু তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলো দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। এই আবিষ্কারের প্রায় এক যুগ পরে ইয়োসেফ ফন ফ্রাউনহোফের আরো বিশদ পরীক্ষা চালান, কালো দাগ কোন কোন তরঙ্গদৈর্ঘ্যে দেখা যাচ্ছে তা মেপেও ফেলেন। উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় ভাগে উইলিয়াম হাগিন্স দেখালেন, অনেক তারার আলোতেও রয়েছে ওই রকম কালো-কালো দাগ।

সেই সময়ে আরো একটা জিনিশ দেখা গিয়েছিলো। সাদা আলো যদি কোনো গ্যাসের মধ্যে দিয়ে পাঠানো যায় এবং তার পরে সেই আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বিশ্লেষণ করা হয়, তাহলে দেখা যায়, তার মধ্যেও কালো-কালো দাগ থাকে। শুধু তাই নয়, কোথায় কালো দাগ থাকবে, তা নির্ভর করে কোন গ্যাসের মধ্যে দিয়ে আলো গেছে, তার ওপরে। কোনো কোনো নির্দিষ্ট তরঙ্গদৈর্ঘ্যে গ্যাস আলো শুষে নেয়, তাই সেই তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলো আমাদের কাছে পৌঁছোয় না। আগেই বলা হয়েছে, আলোর অভাবই হচ্ছে কালো। সেই সব তরঙ্গদৈর্ঘ্য আশেপাশের তুলনায় অন্ধকার দেখায়।

তাহলে এইবার ব্যাপারটাকে উল্টে ভাবা যেতে পারে। যে কোনো তারার উজ্জ্বল অংশটির বাইরে খানিকটা অনুজ্জ্বল গ্যাস থাকে। ভেতর থেকে যখন আলো বেরোয়, বাইরে আসার সময়ে এই গ্যাসের মধ্যে দিয়ে যেতে হয়। কোন কোন তরঙ্গদৈর্ঘ্য শোষিত হচ্ছে, অর্থাৎ কোথায় কোথায় কালো দাগ দেখা যাচ্ছে, তা থেকে বলা যেতে পারে তারার মধ্যে কী ধরনের পদার্থ আছে।

ব্যাপারটায় নতুন মাত্রা যোগ হলো মেঘনাদ সাহার গবেষণার মাধ্যমে। যে কোনো তাপমাত্রাতেই কিছু কিছু ইলেকট্রন খসে পড়ে পরমাণু থেকে। ইলেকট্রন-হারানো পরমাণুকে বলা হয় আয়ন। এ কথা বলা সহজ যে, তাপমাত্রা বাড়ালে আয়নের পরিমাণও বাড়বে। ঠিক কতোটা বাড়বে, অঙ্ক কষে তা বার করেন মেঘনাদ সাহা।

এর ফলাফল হয় সুদূরপ্রসারী। কারণ, একটা পরমাণু আর তার আয়নের বর্ণালির মধ্যে সামান্য পার্থক্য থাকে। পরমাণুতে যে যে শক্তির ইলেকট্রন থাকা সম্ভব, আয়নের বেলায় সেই শক্তিগুলো একটু একটু তফাতে হয়। এই জন্য আয়ন যে যে তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলো শুষতে পারে, তার হিসেব পরমাণুর থেকে সামান্য আলাদা। তারা থেকে আসা আলোয় আয়নের জন্যও কালো দাগ দেখা যাবে, পরমাণুর জন্যও দেখা যাবে। সব দাগ সমান অন্ধকার নয়। যে উপাদান যতো বেশি পরিমাণে থাকবে, সে ততো বেশি আলো শুষতে পারবে। আর, যে তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলো যতো বেশি শোষিত হবে, তার জন্য দেখা যাবে ততো বেশি অন্ধকার, ততো গাঢ় কালো। কোনো পরমাণুর জন্য যে দাগ তা কতোটা কালো হচ্ছে, আর তার আয়নের জন্য যে দাগ তা কতোটা কালো হচ্ছে, তা থেকে বার করা যাবে পরমাণু এবং আয়নের সংখ্যার অনুপাত। এবং মেঘনাদ সাহার সমীকরণ থেকে পাওয়া যাবে তারার তাপমাত্রা।

●—○—●—○—●

তারার নিজস্ব যে রঙ, আমরা যে সব সময়ে সেই রকমটাই দেখি, তা কিন্তু নয়। ভোরের বা সন্ধের সূর্য বেশি লাল দেখায় র‍্যালে-বিক্ষেপণের জন্য। সে রকম বিক্ষেপণ তারার আলোর ক্ষেত্রেও হয়। শুধু বায়ুমণ্ডলের জন্যই নয়। মহাশূন্যে ছড়িয়ে আছে অনেক ধুলো, তাদের মধ্যে দিয়ে আসার সময়েও বিক্ষেপণ হয়। নীল আলো লালের তুলনায় বেশি বিক্ষেপিত হয় বলে বিক্ষেপণের পরে আলো খানিকটা বেশি লালচে দেখায়।

আরো একটা ঘটনা ঘটে, তার ফলে তারার আসল রঙ আমরা দেখতে পাই না। তারাগুলো তো আর স্থির হয়ে নেই, আমাদের পৃথিবীও চলছে। এই সব মিলিয়ে যে তারার দিকেই আমরা তাকাই না কেন, সেটা হয় আমাদের দিকে ধেয়ে আসছে, নয়তো আমাদের থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। এর ফলে তাদের থেকে যে আলো বেরোচ্ছে, আমাদের কাছে তার তরঙ্গদৈর্ঘ্য দেখাচ্ছে অন্য রকম।

একে বলে ডপলার ক্রিয়া, কারণ এ ব্যাপারটা প্রথম উপলব্ধি করেছিলেন খ্রিষ্টিয়ান ডপলার নামে এক বিজ্ঞানী। শুধু আলো নয়, যে কোনো ঢেউয়ের ক্ষেত্রেই ঘটে এই ব্যাপার। শব্দতরঙ্গের জন্য এই ঘটনা যে ঘটে, একটু চোখকান খোলা রাখলেই তার নমুনা পাওয়া যায়। রাস্তা দিয়ে যখন কোনো গাড়ি বাঁশি বাজিয়ে যায়, আমাদের দিকে আসার সময়ে সে বাঁশির স্বর চড়া শোনায়। আর যখন গাড়ি আমাদের থেকে দূরে সরে যায়, তখন মনে হয় বাঁশির স্বর খাদে নেমে গেছে।

চড়া স্বর মানে কম তরঙ্গদৈর্ঘ্যের শব্দ, খাদের স্বর মানে লম্বা লম্বা ঢেউ। আলোর ক্ষেত্রে একই ব্যাপার ঘটবে — আলোর উৎস যদি আমাদের দিকে ধেয়ে আসে তাহলে আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য কমে যাবে মনে হবে, উৎস দূরে সরে গেলে বেড়ে যাবে মনে হবে।

তরঙ্গদৈর্ঘ্য কমে যাওয়া বা বেড়ে যাওয়ার মানে রঙ যথাক্রমে নীলের বা লালের দিকে যাওয়া।

প্রশ্ন উঠতে পারে, গাড়ির বাঁশিতে শব্দের ডপলার ক্রিয়া যেমন সহজেই বোঝা যায়, গাড়ির আলোতে কেন আলোর ডপলার ক্রিয়া তেমনি বোঝা যায় না? এর উত্তর হচ্ছে, কতোটা গতিবেগের জন্য তরঙ্গদৈর্ঘ্য কতোটা বদলাবে, তা নির্ভর করে ঢেউয়ের গতিবেগের ওপর। শব্দের গতিবেগ সেকেন্ডে ৩০০ মিটারের কিছু বেশি হয়। কোনো গাড়ি যদি ঘণ্টায় ৫০ কিলোমিটার চলে, তাহলে সেকেণ্ডে চলে ১৪ মিটারের মতো, অর্থাৎ গাড়ির গতিবেগ শব্দের প্রায় ৫ শতাংশ। তরঙ্গদৈর্ঘ্যের যে বদল হয়েছে মনে হয়, তা নির্ভর করে এই অনুপাতটির ওপর। ওই একই গাড়ি যে আলো ছড়াচ্ছে তার গতিবেগ সেকেন্ডে তিন লক্ষ কিলোমিটার, তার তুলনায় গাড়ির বেগ এতোই নগণ্য যে তরঙ্গদৈর্ঘ্যের তফাতটা খালি চোখে তো ধরা অসম্ভব, ভালো রকমের যন্ত্রপাতি দিয়েও মাপা যায় না।

আমরা যতো রকমের গাড়ি দেখি, মহাশূন্যে সব কিছুর বেগই তাদের চেয়ে অনেক বেশি। সূর্যের চারদিকে কক্ষপথে ঘুরছে আমাদের পৃথিবী, তার গড় বেগ সেকেন্ডে ৩০ কিলোমিটারের মতো। দূরবর্তী জ্যোতিষ্কদের বেগ তার চেয়েও অনেক বেশি। যদি এই বেগ আলোর বেগের শতাংশও হয়, তাহলে ডপলার ক্রিয়ার ফলে তাদের থেকে আসা আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্যে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটবে।

একক তারা আমরা যতোগুলো দেখতে পাই, তার কোনোটারই অবশ্য বেগ অতো বেশি নয়। কিন্তু আকাশে তাকালে যে সব আলোকবিন্দু দেখা যায়, সেগুলো সবই নক্ষত্র নয়। কিছু কিছু আছে নক্ষত্রপুঞ্জ, কয়েক হাজার নক্ষত্রের সমাবেশ। আরো বড়ো সমাবেশও হয়, হাজার কোটি নক্ষত্র নিয়ে যেমন এক একটি গ্যালাক্সি। ছায়াপথ বা আকাশগঙ্গা নামক যে নক্ষত্রলোকের সদস্য আমাদের সূর্য, সেটি এ রকম একটি গ্যালাক্সি।

ছায়াপথের অন্যান্য তারাগুলোকে আলাদা-আলাদা করে দেখা যায় --- খালি চোখে না হলেও দূরবীনে। কিন্তু এদের কারুরই বেগ তেমন বেশি নয়, ডপলার ক্রিয়া নিয়ে মাথা ঘামাবার দরকার নেই। গ্যালাক্সিদের দিকে তাকালে অন্য রকম। তাদের আলো পরীক্ষা করে ১৯২০-র দশকে এডউইন হাবল্ দেখেছিলেন, প্রায় সমস্ত গ্যালাক্সির আলোতেই *লাল বিচ্যুতি* দেখা যাচ্ছে, অর্থাৎ আলো সরে যাচ্ছে লালের দিকে, বা বেশি তরঙ্গদৈর্ঘ্যের দিকে। তার মানে, মোটামুটিভাবে বলতে গেলে, অন্যান্য গ্যালাক্সিগুলো আমাদের থেকে দূরে সরে যাচ্ছে।

অতীতে তাহলে গ্যালাক্সিগুলো এখন যেমন আছে তার তুলনায় কাছাকাছি ছিলো। পেছোতে পেছোতে এমন একটা সময় পাওয়া সম্ভব, যখন সব কিছুই ঘোঁট পাকিয়ে ছিলো। সেটা তাহলে মহাবিশ্বের শৈশবকাল!

মহাবিশ্বের যে একটা শৈশব ছিলো, সে কথাই বেশ চমকপ্রদ। কিন্তু গ্যালাক্সি থেকে আসা আলোর রঙে লাল বিচ্যুতি ছাড়াও তার আরো একটা ইঙ্গিত ছিলো আমাদের চোখের সামনেই। সে কথায় এর পরে আসছি।

আকাশভরা সূর্য-তারার গোষ্ঠী কী কী তাহা
জানার উপায় বের করেছেন পদার্থবিদ সাহা।
সত্যেন্দ্র ঢাকায় বসে
প্লাঙ্ক-আইন দেখান কষে,
তাঁদের এসব কীর্তি মোদের গর্ব কতো, আহা।

৭ : রাতের আকাশের ধাঁধা

পলাশ বরন পাল

কিছু কিছু ব্যাপার আমরা খুব সহজে মেনে নিই, কোনো প্রশ্নই জাগে না তা নিয়ে কারো মনে। হঠাৎ করে কেউ প্রশ্ন তুললে আমরা চমকে উঠে আবিষ্কার করি ··· তাই তো! এর উত্তর তো জানা নেই!

বিজ্ঞানের ইতিহাসে এ রকম বিখ্যাত কিছু প্রশ্ন আছে। 'বোঁটা থেকে খসে গেলে আপেল কেন মাটিতে পড়ে', এ প্রশ্নের উত্তর সন্ধান করতে গিয়েই নাকি নিউটন মহাকর্ষ আবিষ্কার করেন। এ কাহিনী সত্যি না গল্পকথা, তা নিয়ে তর্ক আছে। কিন্তু সে তর্কে আমাদের যাওয়ার দরকার নেই, কেননা নিউটনের কথা আমরা বলতে বসিনি, আমরা বলছি হাইনরিখ অলবার্স নামে অস্ট্রিয়ার এক ডাক্তারের কথা। ১৮২৬ খ্রিষ্টাব্দে এমনি এক সহজ প্রশ্নে অলবার্স চমকে দিয়েছিলেন সবাইকে। "রাত্তিরে আকাশ অন্ধকার থাকে কেন?" — এই হলো অলবার্সের প্রশ্ন।

এমনধারা প্রশ্ন শুনলে মনে হয় বলি, "আরে বাপু, অন্ধকারই যদি না থাকবে, তবে আর রাত্রি বলেছে কেন? দিনে-রাতে কি তফাত থাকবে না নাকি? এ যে বেমালুম রাতকে দিন বানানোর চেষ্টা!"

অলবার্স তখন বলবেন, "তা নয়। দিনের সাথে রাতের তফাত আছে জানি। দিনে সূর্য থাকে আকাশে, রাতে থাকে না। কোনো কোনো সময়ে জ্যোৎস্নায় মৃদু আলো হয় রাতের আকাশে, যা আসলে চাঁদ থেকে প্রতিফলিত সূর্যালোক। জ্যোৎস্না অবশ্য সব সময়ে থাকে না, চন্দ্রকলার হ্রাসবৃদ্ধি হয়। কিন্তু তারারা তো থাকে প্রতি রাত্রেই! তাদের সম্মিলিত আলোয় কেন উজ্জ্বল দেখায় না রাতের আকাশ?"

আবার আমাদের বলার ইচ্ছে হতে পারে, "বা রে! তারারা তো কতো দূরে! তাদের আলোর কতোটুকুই বা এসে পৌঁছোচ্ছে আমাদের কাছে?" — কিন্তু এ রকম তর্কাতর্কি করার আগে বরং অলবার্সের বক্তব্যটা শোনা যাক মন দিয়ে।

বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কথা পুরাকাল থেকে যখন ভাবা হতো, তখন স্বভাবতই ধরে নেওয়া হতো যে তার বিস্তার অনন্ত, তার বয়সও অসীম। এই অনুমান বা স্বতঃসিদ্ধের পেছনে
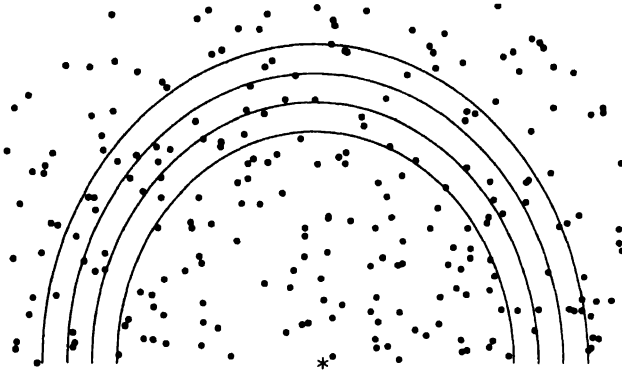
১৩ নং ছবি॥ *আকাশের তারাদের মোট ঔজ্জ্বল্য হিসেব করার জন্য আকাশকে পেঁয়াজের খোসার মতো অনেকগুলো ভাগে ভাগ করে ভাবা হয়েছে।*

একটা সহজিয়া যুক্তিও ছিলো। ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যেই তো সব কিছু, সেই ব্রহ্মাণ্ডের যদি কোথাও সীমানা থাকে তাহলে তার ওপারে কী থাকবে? ব্রহ্মাণ্ডের যদি একটা জন্মকাল থাকে তাহলে তার আগে কী ছিলো? বলা বাহুল্য এ সব প্রশ্নের উত্তর হয় না, তাই মহাবিশ্ব অনাদি অনন্ত অসীম, এই রকম ভেবে নেওয়াই স্বস্তিদায়ক।

রাতের আকাশের দিকে তাকালেই আমরা দেখতে পাই, সব দিকেই ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে নক্ষত্রেরা। কোনো বিশেষ দিকের প্রতি কোনো পক্ষপাত তাদের আছে বলে মনে হয় না সব দিকে সমানভাবে ছড়ানো। এই সব তারা থেকে কতো আলো আসবে পৃথিবীতে?

প্রতিটি তারা থেকে সমান আলো আসবে না, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কাছের তারাদের থেকে আলো আসবে তুলনামূলকভাবে বেশি পরিমাণে, দূরের তারার থেকে কম। কতো কম কতো বেশি, তার হিসেবটাও সরল। ধরা যাক, দুটো তারা সমান পরিমাণ আলো ছড়াচ্ছে মহাকাশে, কিন্তু পৃথিবী থেকে প্রথমটার দূরত্ব দ্বিতীয়টার দূরত্বের আদ্দেক। তাহলে আমরা যারা এই পৃথিবীতে বসে তারা দেখছি, তাদের কাছে দ্বিতীয়টার তুলনায় প্রথমটাকে ২ × ২ বা চার গুণ উজ্জ্বল দেখাবে। দূরত্বের অনুপাত যদি ৩ হয়, তবে কাছের তারাটিকে দেখাবে ৩ × ৩ বা নয় গুণ উজ্জ্বল, অনুপাত চার হলে ষোলো গুণ, ইত্যাদি। এক কথায় বলা যায়, প্রথম তারাটির দূরত্ব দ্বিতীয়টার তুলনায় যে অনুপাতে কম, তার ঔজ্জ্বল্য সেই বর্গ অনুপাতে বেশি।

এ হচ্ছে কাছের একটা তারার সঙ্গে দূরের একটিমাত্র তারার তুলনা। কিন্তু দূরের তারারা যে সংখ্যায় অনেক বেশি! কতো বেশি, তা বলাও শক্ত নয়। হিসেবের সুবিধের

জন্য গোটা মহাবিশ্বটাকে পেঁয়াজের খোলের মতো অনেকগুলো খোলে ভাগ করে নেওয়া যাক, ১৩ নম্বর ছবির মতো করে। প্রতিটি খোল সমান পুরু, এবং যতোটা পুরু তার চেয়ে তাদের গড় দূরত্ব অনেক বেশি — অবশ্য নিতান্ত কাছের কয়েকটিকে বাদ দিলে।

এইবার এমন দুটো খোলের কথা ভাবা যাক। একটার নাম *ক* আর অন্যটার *খ*, *খ*-এর গড় দূরত্ব *ক*-এর দ্বিগুণ। তাহলে তাদের আয়তনের অনুপাত আবার বর্গের সম্পর্কে, অর্থাৎ *খ*-এর আয়তন *ক*-এর চার গুণ। তেমনি, *গ* নামক আর একটা খোলের গড় দূরত্ব যদি *ক*-এর তিন গুণ হয় তাহলে তার আয়তন ৩ × ৩ বা নয় গুণ। আমরা আগেই ধরে নিয়েছি যে তারারা ছড়ানো রয়েছে মোটামুটি সমানভাবে। অর্থাৎ *খ* খোলের তুলনায় *খ*-তে আছে চার গুণ বেশি তারা, *গ*-তে নয় গুণ।

তার মানে, দূরের খোলের একটা তারার দ্যুতি আমাদের কাছে যে অনুপাতে কম, দূরের তারার সংখ্যা ঠিক সেই অনুপাতেই বেশি। হরেদরে কাটাকুটি হয়ে ব্যাপারটা তাহলে যা দাঁড়াচ্ছে তা হলো এই — যতো দূরের খোলের কথাই ভাবা হোক না কেন, সেখান থেকে যে পরিমাণ আলো আসছে পৃথিবীতে, তার কোনো হেরফের নেই।

সমস্ত খোল মিলিয়ে মোট কতো আলো আসছে তাহলে? সব খোলের অবদানকে যোগ দেওয়া যাক। কিন্তু ব্রহ্মাণ্ড অসীম, খোলের সংখ্যাও তাই হবে অগুনতি। একটা খোল থেকে আসা আলোর পরিমাণকে যদি ১ একক বলি, তাহলে অন্য সব খোল থেকেও ১ একক করেই আলো আসছে। এক এক করে যোগ করতে করতে যতো এগোনো যাবে, ততোই পেরিয়ে যাবে একের পর এক বেড়া, লক্ষ কোটি অর্বুদ ছাড়িয়েও বাড়তে থাকবে, এবং এ বাড়ার কোনো শেষ থাকবে না। এক কথায় বলা যায়, যোগফল অসীম। তার মানে অসীম পরিমাণ আলো আসার কথা পৃথিবীতে, রাতে আকাশের দিকে তাকিয়ে চোখ ধাঁধিয়ে যাওয়ার কথা আমাদের। অথচ আমরা তো দেখি আকাশ অন্ধকার। কেন দেখি? — এই ছিলো অলবার্সের বিখ্যাত ধাঁধা।

কিছুদিনের মধ্যেই অবশ্য বিজ্ঞানীরা ধরে ফেললেন যে অলবার্সের হিসেবটা ঠিক হয়নি। সত্যি সত্যি যদি অসীম সংখ্যক তারা থাকেও, আকাশে তাকিয়ে তাদের সবাইকে দেখা সম্ভব নয়। সাদা চোখে তাকালে তারাগুলোকে যতো ছোটোই দেখাক না কেন, কোনো তারাই দৈর্ঘ্য-প্রস্থ-হীন বিন্দু নয়। তাই দূরের তারা ঢাকা পড়ে যাবে কাছের তারার আড়ালে, আকাশে তাকালে দেখা যাবে শুধুই সামনের সারির তারাদের। অর্থাৎ অসীম আলো হবে না।

কিন্তু তাতেও ধাঁধার সমাধান হয় না। অসীম না হোক, যে কোনো দিকে তাকালেই, তো কোনো না কোনো তারা চোখে পড়বেই, গহন জঙ্গলের মধ্যে যেমন যে কোনো দিকে তাকালেই চোখে পড়ে গাছ। কোনো দিকে গাছ একেবারে কাছে, কোনো দিকে খানিকটা দূরে, কিন্তু সব দিকেই গাছ। তেমনি আকাশে সব দিকেই তারা থাকবে, সব দিকই দিনের আকাশের মতো উজ্জ্বল হবে, এইটাই তো ছিলো প্রত্যাশিত!

বলা বাহুল্য রাতের আকাশ দিনের আকাশের মতো উজ্জ্বল নয়, তাহলে আমাদের প্রত্যাশাটা নিশ্চয়ই অযৌক্তিক হচ্ছে কোনো না কোনো কারণে। আমরা ধরে নিয়েছিলাম অসীম কাল ধরে বিরাজ করছে মহাবিশ্ব, তার বিস্তারও অসীম। দুটোর মধ্যে অন্তত প্রথমটা যে ঠিক নয়, সে কথা জানা গেলো অলবার্সের প্রায় এক শতাব্দী পরে। ১৯২০-র দশকে মার্কিন জ্যোতির্বিদ এডউইন হাব্‌ল্‌ জোরালো দূরবীনের সাহায্যে দেখলেন, দূরবর্তী নক্ষত্রপুঞ্জগুলি আমাদের থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। সবার যদি এলোমেলো গতি থাকতো তাহলে মোটামুটি আধাআধি সংখ্যক দূরে সরতো, বাকি আদ্ধেক আসতো কাছের দিকে। তা যখন হচ্ছে না, তাহলে মেনে নিতেই হবে যে মহাবিশ্ব ক্রমশ বেড়ে চলেছে, এবং নক্ষত্রপুঞ্জগুলির মধ্যে দূরত্বও ক্রমশ বেড়ে চলেছে। তার মানে, অতীতে নক্ষত্রপুঞ্জগুলো পরস্পরের আরো কাছাকাছি ছিলো, এবং সুদূর অতীতে কোনো এক সময়ে নিশ্চয়ই এই সব নক্ষত্রপুঞ্জের উপাদান তালগোল পাকিয়ে এক জায়গায় ছিলো। সেইটাই তাহলে মহাবিশ্বের শৈশবকাল। মহাবিশ্বের প্রসারণের হার, আর বিভিন্ন নক্ষত্রপুঞ্জের মধ্যে বর্তমান দূরত্ব জানা থাকলে তা থেকে বলা যায়, কতো আগে ছিলো এই অবস্থা, অর্থাৎ মহাবিশ্বের বর্তমান বয়স কতো, তা বলে দেওয়া যায়। হাব্‌ল্‌-এর সময়ে এই বিদ্যার শুরু — দূরত্ব মাপা এবং প্রসারণের হার মাপার উন্নততর পদ্ধতি উদ্ভাবিত হতে লাগলো ক্রমশ। আধুনিক হিসেব অনুযায়ী মহাবিশ্বের বয়স মোটামুটি ১৪০০ কোটি বছর।

এতে অলবার্সের ধাঁধার কী সুরাহা হলো? হিসেব করার সময়ে আমরা ধরে নিয়েছিলাম যে ব্রহ্মাণ্ড অসীম, তাই অগুনতি তারা থেকে আলো আসছে। সে কথা কার্যত অচল হয়ে গেলো। মহাবিশ্ব যদি অসীমও হয়, তাহলেও অসীম দূরত্বের তারা থেকে তো আর আলো পাচ্ছি না আমরা! আলোর গতিবেগ কতো তা আমরা জানি। সেই বেগে ১৪০০ কোটি বছরে আলো কতোটা যেতে পারে, তা বার করা খুবই সহজ। তার চেয়েও দূরে যদি কোনো তারা থাকেও, তাহলে তাদের থেকে আলো আমরা দেখতে পাবো না, মহাবিশ্বের জন্মলগ্ন থেকে আজ পর্যন্ত অবিরাম চললেও সে আলো আমাদের কাছে এসে পৌঁছোবে না।

অবশ্য অতো দূর অতীতের কথা ভাববারও কোনো দরকার নেই। মহাবিশ্বই যদি অনাদি না হয় তাহলে তার অন্তর্গত নক্ষত্রেরাও অনাদিকাল ধরে বিরাজ করছে না, সে কথা মেনে নিতেই হবে। নক্ষত্রদেরও জন্ম হয়েছে কোনো না কোনো সময়ে। সব নক্ষত্র একই সময়ে জন্মায়নি, এখনো প্রতিনিয়ত নতুন নক্ষত্র জন্মাচ্ছে। মহাবিশ্বের শৈশবে নক্ষত্র ছিলো না। বিজ্ঞানীদের হিসেব, মহাবিশ্বের জন্মের অন্তত একশো কোটি বছর পরে প্রথম নক্ষত্রের সৃষ্টি হয়েছে। সেই সময় থেকে আজ পর্যন্ত যতো দূরের তারা থেকে আলো এসে পৌঁছোতে পারে আমাদের কাছে, সেই দূরত্বের মধ্যের তারাই আমাদের কাছে দৃশ্যমান হতে পারে, তার বাইরে তারা যদি থাকেও তাহলেও আমাদের কাছে

সেগুলো অবান্তর। রাতের আকাশের ঔজ্জ্বল্য হিসেব করার জন্য যখন আকাশটাকে পেঁয়াজের খোলের মতো করে ভাগ করে সেই সব ভাগের অবদান যোগ করা হচ্ছিলো, তখন আমাদের থামা উচিত ছিলো এই দৃশ্যমান জগতের সীমানায়। তা যদি থামতাম, রাতের ঔজ্জ্বল্যের হিসেব ও রকম যাচ্ছেতাই বড়ো হয়ে যেতো না, কোনো ধাঁধাও হতো না।

রাতের আকাশ বর্ণহীন আলোকহীন, এ তথ্যটা তাই ফেলনা নয়। মহাবিশ্বের বয়স যে অসীম নয়, মহাবিশ্বের অন্তর্গত নক্ষত্রগুলিও যে অনাদি কাল ধরে বিরাজ করছে না, এই রকম নানাবিধ ইঙ্গিত নিয়ে মানুষের চোখের সামনে যুগ যুগ ধরে দাঁড়িয়ে রয়েছে রাতের আকাশ। আমাদের সময় লেগেছে অনেক, তবু যা হোক এখন সেই ইঙ্গিতগুলো আমরা খানিকটা বুঝি।

রাতের আকাশ এমন কালো, নয় তা কেন সাদা?
এটাই ছিলো অলবার্সের বিখ্যাত এক ধাঁধা।
অনেক পরে গেলো বোঝা
উত্তরটা নেহাত সোজা
কালো হওয়ার কারণ, আলোর বেগ যে পুরো বাঁধা!

৮ : রামধনুর রঙ

শেখর গুহ

বৃষ্টি নামার একটু আগে বা পরে মেঘের গায়ে রোদ্দুর পড়লে আকাশে ফুটে উঠতে দেখা যায় নানা রঙে ভরা রামধনু। মেঘে ও রোদে সাদা-কালো আলো-ছায়ার মাঝে এমন এক রঙিন বিশাল গোল মোটা দাগ তার সৌন্দর্যে মানুষকে চিরকাল মুগ্ধ করেছে — নানা দেশের নানা ভাষায় নানা কালে লেখা বর্ণনা থেকেই তা বোঝা যায়। কেন আকাশে রামধনু ওঠে? কেন তার চেহারাটা ও রকম গোল? বিদ্যুতের মতো আঁকাবাঁকা অথবা ত্রিকোণ বা চৌকো কিংবা অন্য কোনো রকম নয় কেন? আর গোল হলেও চাকার মতো পুরো গোল নয় কেন? আর কোথা থেকেই বা রামধনুতে আসে ওই সাজানো সুন্দর রঙের ছটা? এ সব প্রশ্নের উত্তর জানার চেষ্টা মানুষ বহুদিন ধরেই করেছে।

এখন থেকে তেইশ শো বছরেরও আগে, খ্রিস্টপূর্ব ৪০০ থেকে খ্রিস্টপূর্ব ৩২২ সালের মধ্যে, গ্রিস দেশের দার্শনিক আরিস্তুতলও এই নিয়ে চিন্তা করেছিলেন। মেঘের উপরে সূর্যের আলোর প্রতিফলনের জন্যই রামধনু দেখা যায় কিনা সেটা তিনি জ্যামিতির সাহায্যে বুঝতে চেয়েছিলেন। বৈজ্ঞানিক চিন্তা দিয়ে, অর্থাৎ যুক্তি এবং অঙ্কের নিয়ম ব্যবহার করে রামধনুকে ব্যাখ্যা করার এটাই সম্ভবত প্রথম চেষ্টা — অন্তত আমরা ইতিহাস যতোটুকু জানি তা অনুযায়ী। কিন্তু আরিস্তুতলের এ চেষ্টা সফল হয়নি - শুধুমাত্র আলোর প্রতিফলন দিয়ে রামধনু বোঝা যায় না। তার জন্য লাগে আরো একটা জিনিশ। সেটা কী, তা বুঝতে আর একটু ইতিহাসের অবতারণা করা যাক।

কীভাবে আমরা দেখি, সেটা নিয়ে আরিস্তুতল এবং প্রাচীন গ্রিসদেশের অন্য দার্শনিকরাও অনেক চিন্তা করেছেন। ইউক্লিড ও টোলেমি নামে সে দেশের অত্যন্ত প্রভাবশালী দুজন পণ্ডিত মনে করতেন যে আলোর উৎস হলো চোখ। তাঁদের মতে, চোখ থেকে বেরিয়ে আসা আলো যখন কোনো জিনিশকে ছোঁয় তখনই জিনিশটা দেখা যায়, ঠিক যেমন হাত দিয়ে কোনো জিনিশ স্পর্শ করলে তবেই জিনিশটা অনুভব করা যায়। এ মতটা আরিস্তুতল মেনে নেননি। তাঁর ধারণায়, ব্যাপারটা আসলে ঠিক উল্টো। চোখ থেকে আলো বেরিয়ে আসে না, বরং কোনো জিনিশ থেকে ঠিকরে আসা আলো
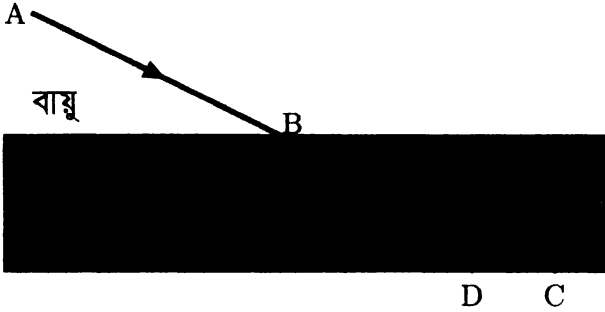
১৪ নং ছবি॥ AB *বরাবর যে আলোকরশ্মি আসছে, তা* BC *বরাবর গেলে সোজা পথ হতো। সে পথ না ধরে আলো যাচ্ছে* BD *পথ ধরে। এক মাধ্যম থেকে অন্য মাধ্যমে যাওয়ার সময়ে আলোর গতিপথের এ রকম বেঁকে যাওয়াটাকে বলে আলোর প্রতিসরণ।*

যখন আমাদের চোখে ঢোকে, তখনই আমরা জিনিশটা 'দেখি'। আরিস্ততলের লেখা থেকে বোঝা যায়, কোনো উৎস থেকে বেরিয়ে আসা আলোর রশ্মি কোনোরকম বাধা না পেলে আঁকাবাঁকা পথে না গিয়ে যে সোজাসুজি সরলরেখায় চলতে থাকে — এটা উনি বুঝেছিলেন। কিন্তু একটা মাধ্যমে চলতে চলতে আলো যখন অন্য একটা মাধ্যমে গিয়ে ঢোকে তখন কী হয়? অর্থাৎ বাতাসের মধ্যে চলতে চলতে আলোর রশ্মি যদি জলের উপর এসে পড়ে তখন কি রশ্মিটা বাতাসে যেদিকে এগোচ্ছিলো, জলের ভিতরেও সেই দিকেই চলতে থাকবে, নাকি অন্য কোনো দিকে যাবে?

এখন আমরা জানি যে আলোর রশ্মি এক মাধ্যম থেকে অন্য মাধ্যমে চলতে গিয়ে মাধ্যমদুটির সীমানার উপর তেরচাভাবে এসে পড়লে দ্বিতীয় মাধ্যমে রশ্মিটার পথের দিকটা একটু বদলে যায়। ১৪ নম্বর ছবিতে মনে করা যাক বাতাসে চলা আলোর রশ্মি বোঝানো হচ্ছে AB দাগটা দিয়ে। কোনো বাধা না পেলে রশ্মিটা সরাসরি চলতে থাকতো BC দাগটা অনুযায়ী। কিন্তু B বিন্দুটা যদি বাতাস ও জলের সীমানায় পড়ে, তাহলে জলের মধ্যে ঢুকে রশ্মিটা বেঁকে যাবে — BC-র দিকে না গিয়ে রশ্মিটা যাবে BD দাগটা দিয়ে দেখানো পথে। এক মাধ্যম থেকে অন্য মাধ্যমে ঢুকে আলোর রশ্মির এ রকম বেঁকে যাওয়াকে বলে প্রতিসরণ। সব মাধ্যমেরই নিজস্ব একটা *'প্রতিসরাঙ্ক'* আছে। এক মাধ্যম থেকে অন্য মাধ্যমে গিয়ে আলোর রশ্মি কতোটা বেঁকবে ও কোনদিকে বেঁকবে, সেটা নির্ভর করে ওই দুটি মাধ্যমের প্রতিসরাঙ্কের উপর।

প্রতিসরণের কোনো উল্লেখ আরিস্ততলের লেখায় নেই, আছে তাঁর মৃত্যুর প্রায় তেরোশো বছর পরে লেখা একটা বইয়ে। ইরাকের রাজধানী বাগদাদ শহরে এক গণিতবিদ ও আলোকবিজ্ঞানী বাস করতেন, তাঁর নাম ছিলো আবু সাদ্ বা ইবন

সাহ্ল। ৯৮৪ খ্রিষ্টাব্দে তাঁর লেখা একটা বইয়ের পাণ্ডুলিপিতে (সম্ভবত প্রথম) আলোর প্রতিসরণের বর্ণনা পাওয়া যায়।

ইবন সাহ্লের সমসাময়িক ছিলেন আবু আলি আল হাসান আল হাইতাম। পশ্চিমের দেশগুলিতে তিনি আলহাজেন বা অ্যালহেজেন নামে পরিচিত। ৯৬৫ খ্রিষ্টাব্দে তখনকার পারস্য সাম্রাজ্যের (এখনকার হিসেবে বললে দক্ষিণ ইরাকের) বসরা শহরে তাঁর জন্ম। তিনি যে শুধু তখনকার দুনিয়ার সবসেরা বিজ্ঞানী ছিলেন তা-ই নয় সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানীদের মধ্যেও নিশ্চয়ই তাঁর নাম করা উচিত। প্রকৃতিকে আমরা বুঝি বিজ্ঞানের তত্ত্ব দিয়ে। কিন্তু বিজ্ঞানের কোনো তত্ত্ব ঠিক কি ভুল তা যে শুধু যুক্তি তর্ক আর অনুমান দিয়ে নয়, হাতেনাতে পরীক্ষা করে তবেই যাচাই করতে হয় -- এ ধারণাটার প্রবর্তন তিনিই করেছিলেন বলে মনে করা হয়। এবং সেইজন্য হয়তো বলা যায় যে আধুনিক বিজ্ঞানের গোড়াপত্তন তাঁরই কীর্তি।

আল হাইতাম তাঁর পরীক্ষার ফল দিয়ে নিঃসন্দেহে প্রমাণ করেছিলেন যে আলোর রশ্মি সম্বন্ধে হাজার বছর ধরে প্রচলিত ইউক্লিড ও টোলেমির ধারণাটা ছিলো পুরোপুরি ভুল -- এবং আরিস্ততলই ঠিক বুঝেছিলেন। জ্ঞানবিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ে আল হাইতাম দুশোর বেশি বই লিখেছিলেন - কিন্তু তার প্রায় সবই হারিয়ে গেছে। তাঁর লেখা "কিতাব আল মানাজির" (বা "আলোর বই") লাতিন ভাষায় অনুবাদ করা হয়েছিলো। সে অনুবাদটা হারায়নি - বেশ কয়েকশো বছর ধরে ইউরোপে বিজ্ঞানীদের কাছে বইটার বেশ প্রতিপত্তি ছিলো। ইবন সাহ্লই সম্ভবত প্রথম প্রতিসরণের বর্ণনা দিয়েছেন এবং কীভাবে অঙ্ক কষে আলোর রশ্মির প্রতিসরণ কোনদিকে হবে তার সূত্রটা বের করেছেন। আল হাইতাম এ বিষয়ে প্রচুর গবেষণা ও পরীক্ষা করে সূত্রটা দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করেন। আকাশে রামধনু ওঠার কারণ যে মেঘের গায়ে থাকা বৃষ্টিজলের ফোঁটায় সূর্যের আলোর প্রতিফলন এবং প্রতিসরণ, আল হাইতামই সম্ভবত প্রথম তা প্রস্তাব করেন। কিন্তু ঠিক কীভাবে আলোর প্রতিসরণের জন্য রামধনু ওঠে, আল হাইতামের কাজ থেকে তা জানা যায় না।

আল হাইতামের মৃত্যুর প্রায় দুশো বছর পরে ইরানের প্রসিদ্ধ শিরাজ শহরে জন্মান কুতব আল দীন। তাঁর শহরের নাম ধরে তাঁকে 'আল শিরাজি'ও বলা হয়। তিনি ছিলেন একাধারে জ্যোতির্বিজ্ঞানী ও চিকিৎসক। একটা জলকণার ভিতরে কীভাবে আলোর প্রতিসরণ এবং প্রতিফলন রামধনুর ওই গোল আকারটা সৃষ্টি করে সেটা তিনিই প্রথম ঠিকভাবে বুঝিয়েছেন বলে মনে করা হয়। তাঁর কাজের বর্ণনা রয়েছে তাঁর ছাত্র কামাল আল দীনের একটি লেখাতে।

আল শিরাজির সময়েই, সুদূর ইউরোপে এখন যেখানে জার্মানি, সেখানে ফ্রাইবুর্গ শহরে বাস করতেন ডিটরিশ বা টেয়োডোরিক নামে এক খ্রিস্টান অধ্যাত্মবিদ। আল শিরাজির কাজ সম্বন্ধে কিছুই না জেনেও তিনি রামধনুর একটা ব্যাখ্যা দেন,

এবং আশ্চর্যের ব্যাপার যে তাঁর ব্যাখ্যাটা আল শিরাজির বর্ণনার খুব কাছাকাছি। টেয়োডোরিক ও আল শিরাজি — দুই জনের মৃত্যুও হয় একই বছরে — ১৩১১ খ্রিস্টাব্দে। পুরোনো কাগজপত্র থেকে দেখা যায় যে টেয়োডোরিকের ব্যাখ্যাটা অন্তত খ্রিস্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর গোড়া অবধি জার্মানির কোনো কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ানো হতো। কিন্তু তারপরে লোকে সেটার কথা ভুলেই গেছিলো। হয়তো তার কারণ এই যে তখন ইউরোপে শুরু হয়েছে নবজাগরণ, ও তার সাথে এসেছে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি ও নতুন সৃষ্টির জোয়ার। প্রাচীন যতো চিন্তাভাবনা, বিশেষ করে মধ্যযুগীয় অধ্যাত্মবাদ, ঝেড়ে ফেলে মানবিকতাকেই সব চেয়ে বড়ো করে দেখাটা তখনকার রীতি হয়ে দাঁড়িয়েছিলো। কাব্যে, শিল্পকলায়, স্থাপত্যে, বাণিজ্যে, অভিযানে যেমন নতুন আবেগ ও উদ্দীপনা নিয়ে ইউরোপীয়রা মেতে উঠেছিলো, তেমনই বিজ্ঞানের জগতেও তারা এনেছিলো বৈপ্লবিক পরিবর্তন। ইতালিতে গালিলেও গালিলেই (১৫৬৪ সালে তাঁর জন্ম), জার্মানিতে য়োহান কেপ্‌লার (১৫৭১ সালে তিনি জন্মেছিলেন) আর ইংল্যান্ডে আইজ্যাক নিউটন (১৬৪৩ খ্রিস্টাব্দে জন্ম) পশ্চিমী বিজ্ঞানের গোড়াপত্তন করলেন। গালিলেও ও নিউটনের মাঝামাঝি সময়ে, ১৫৯৬ খ্রিস্টাব্দে, ফরাসীদেশে জন্মেছিলেন রেনে দেকার্ত। আধুনিক দর্শনশাস্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে তাঁকে গণ্য করা যেতে পারে (তাঁর বিখ্যাত উক্তি হলো : "ভাবি, তাই আছি") — আবার গণিতে ও বিজ্ঞানেও তিনি রেখে গেছেন অসামান্য অবদান। আলোর প্রতিফলন ও প্রতিসরণের সূত্রগুলি ওলন্দাজ গণিতবিদ উইলব্রড স্নেল নতুন করে আবিষ্কার করেন ১৬২১ খ্রিস্টাব্দে। দেকার্ত দাবি করেন যে তিনিও ওই সূত্রগুলি নিজেই বের করেছেন, স্নেলের লেখা বইটি না পড়েই। ফরাসীদেশে আজও তা বিশ্বাস করা হয় — এবং আলোকবিজ্ঞানের যে নিয়মগুলি পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই 'স্নেলের সূত্র' বলে পড়ানো হয়, ফরাসীরা এখনো সেগুলোকে 'দেকার্তের সূত্র', অথবা (হয়তো অনিচ্ছাসত্ত্বেও) 'দেকার্ত ও স্নেলের সূত্র' বলে।

যাই হোক, রামধনুর আধুনিক ব্যাখ্যাটা যে দেকার্তেরই কীর্তি সে বিষয়ে খুব একটা সন্দেহ নেই। বহু পরীক্ষার মাধ্যমে এবং বহু অঙ্ক কষে তিনি নির্ভুলভাবে প্রমাণ করেন যে আল শিরাজি ঠিকই বলেছিলেন — জলের কণার মধ্যে সূর্যের আলোর প্রতিসরণ এবং প্রতিফলনের জন্যই রামধনু ওরকম গোল দেখায়।

প্রধান যে পরীক্ষাটা দেকার্ত করেছিলেন সেটা কিন্তু ঘরের মধ্যে সহজেই করা যায়। গরমের দিনে রোদ্দুর আটকানোর জন্য দুপুরবেলা ঘরের দরজা জানলা বন্ধ রাখা হয় অনেক জায়গায়। কিন্তু খড়খড়ির ফাঁক দিয়ে অন্ধকার ঘরেও সূর্যের সরাসরি রশ্মি কখনো-সখনো ঢুকে আসে। সেই আলোর রশ্মিতে যদি একটা জলভরা স্বচ্ছ গোল পাত্র রাখা যায়, তখন একটা মজার জিনিশ লক্ষ করা যাবে। যে দেয়ালের ফাঁক দিয়ে আলোর রশ্মিটা আসছে সেখানে ওই ফাঁকটাকে ঘিরে থাকবে একটা রঙিন গোল বালা — ঠিক যেন পুরো গোল একটা রামধনু। বালাটার মাপ কতো বড়ো হবে সেটা নির্ভর
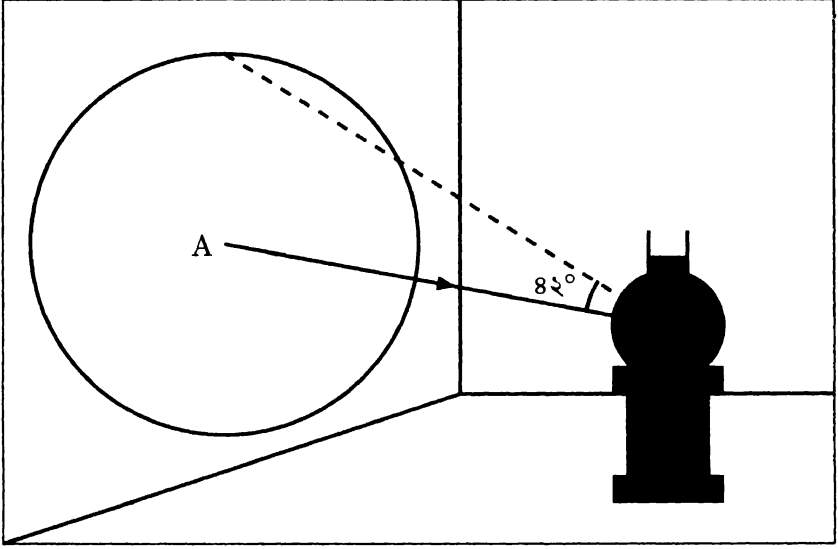
১৫ নং ছবি॥ *দেকার্তের পরীক্ষা। A বিন্দুতে ফুটো, তা দিয়ে আলোর রশ্মি ঢুকছে ঘরে। ডানদিকে জলভরা পাত্র।*

করে জলের পাত্রটা দেয়াল থেকে কতো দূরে রাখা তার উপরে — পাত্রটা কাছে থাকলে মাপটা হয় ছোটো, আর যতো দূরে যায় ততোই বড়ো হয়। কিন্তু বালাটার উপরে যে কোনো একটা বিন্দু থেকে জলের পাত্রটা অবধি যদি একটা কাল্পনিক দাগ টানা যায়, তাহলে সেই দাগটা আর সূর্যের রশ্মিটার মধ্যে যে কোণটা থাকবে, সেটার মাপ দেখা যায় সব সময়েই সমান, মোটামুটি ৪২ ডিগ্রি। গোটা ব্যাপারটা বোঝানো হয়েছে ১৫ নম্বর ছবিতে।

কেন ব্যাপারটা এ রকম? দেকার্ত সেটা বোঝালেন এই ভাবে। মনে করা যাক ১৬ নম্বর ছবিতে গোলটা বোঝাচ্ছে জলভরা এক পাত্র। তার উপরে B বিন্দুতে এসে পড়েছে AB দাগটা দিয়ে দেখানো আলোর একটা রশ্মি। জলের ভিতরে ঢুকে রশ্মিটা বেঁকে যাবে। কতোখানি বেঁকবে তা হিসাব করা যাবে প্রতিসরণের সূত্র দিয়ে, যদি জলের প্রতিসরাঙ্ক জানা থাকে। বেঁকে যাওয়া রশ্মিটা BC দাগ অনুযায়ী এসে পড়বে পাত্রের উল্টোদিকে, এবং C বিন্দুতে প্রতিফলিত হয়ে দিক পাল্টে চলতে থাকবে CD দাগের পথে। CD দাগের দিকটাও হিসাব করা যাবে প্রতিফলনের সূত্র ব্যবহার করে। D বিন্দুতে এসে পড়ার পর রশ্মিটাকে জল থেকে বেরিয়ে আসতে হচ্ছে বাতাসে — অর্থাৎ আবার এক মাধ্যম থেকে অন্য মাধ্যমে যাওয়া, তাই প্রতিসরণের নিয়ম মেনে বাঁকা পথে DE দাগ
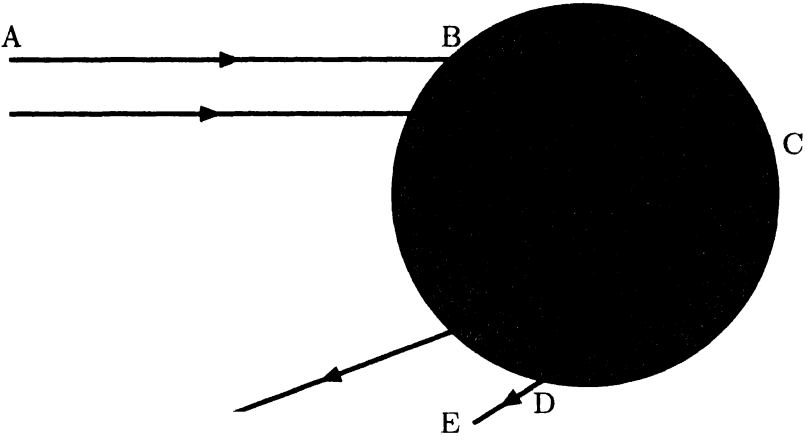
১৬ নং ছবি॥ *দেকার্তের ব্যাখ্যা।*

ধরে চলতে হবে। যে রশ্মিটা AB পথ ধরে দেয়াল থেকে পাত্রের দিকে যাচ্ছিলো সেটা জলের পাত্রে প্রতিফলিত হয়ে DE পথ ধরে ফিরে এলো পাত্র থেকে দেয়ালের দিকে।

সূর্যের রশ্মি তো আর একটা নয় — এক ঝলক আলোর মধ্যে রয়েছে অজস্র সমান্তরাল রশ্মি। সেই সব রশ্মিগুলি যখন গোল পাত্রটা থেকে বেরিয়ে আসছে তখন তারা নানান দিকে ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু দেকার্ত হিসাব করে এবং পরীক্ষায় প্রমাণ করে দেখালেন যে বেরিয়ে আসা রশ্মিগুলি শুধু একটা বিশেষ দিকেই সবচেয়ে জোরালো হবে। অর্থাৎ ১৬ নম্বর ছবিতে AB আর DE দাগ দুটোর মধ্যে যে কোণটা রয়েছে সেটা একটা বিশেষ মাপের যদি হয়, শুধু তা হলেই বেরিয়ে-আসা আলোটা ভালোভাবে দেখা যাবে। দেকার্ত দেখালেন যে এই বিশেষ মাপটা নির্ভর করে কেবল যে মাধ্যম থেকে রশ্মিটা আসছে (অর্থাৎ এ ক্ষেত্রে বাতাস) এবং গোল পাত্রটা যে মাধ্যম দিয়ে ভরা (এখানে যেটা হলো জল) সে দুটির প্রতিসরাঙ্কের উপর। বাতাস এবং জলের প্রতিসরাঙ্ক জানা থাকায় হিসাব করা গেলো যে ওই কোণটার মাপ হবে ৪২ ডিগ্রির মতো। যে রশ্মিটা গোল জিনিশের উপর পড়ে এ রকম একটা বিশেষ দিকে জোরালো ভাবে বেরিয়ে আসে সেটাকে বলা হয় *দেকার্ত রশ্মি* বা *কার্তেসীয় রশ্মি*। জলের পাত্র থেকে বেরিয়ে আসা এই কার্তেসীয় রশ্মিগুলিই দেয়ালে পড়ে ঘরের ভিতরে গোল রামধনু সৃষ্টি করে। সূর্যের আলোটা যে পথ ধরে আসছে তাকে ঘিরে ৪২ ডিগ্রি কোণের একটা ফাঁপা শঙ্কু রয়েছে বলে যদি আমরা কল্পনা করি, তবে যে রশ্মিগুলি ওই শঙ্কুটার গায়ের উপরে থাকবে কেবল সেগুলিই দেয়ালে পড়ে দেখা যাওয়ার মতো জোরালো হবে, এবং শুধু সেগুলিই গোল বালার মতো রামধনুর সৃষ্টি করবে। অন্য দিকে যাওয়া রশ্মিগুলি হবে অনেক

দুর্বল — তাদের জন্য দেয়ালটা একটু ফিকে আলোয় ভরা দেখাবে হয়তো, কিন্তু তারা কোনো বিশেষ দিকে বিশেষ দাগ ফেলবে না। ১৫ নম্বর ছবিটা থেকেই বোঝা যাচ্ছে যে দেয়ালটার দূরত্ব গোল পাত্রটা থেকে যতো বেশি হবে, বালাটাও ততোই বড়ো হবে — কিন্তু কোণটার মাপ সব সময়েই হবে ৪২ ডিগ্রি — ঠিক যেমন দেকার্ত দেখেছিলেন তাঁর পরীক্ষায়।

কিন্তু ঘরের ভিতরের এ রামধনুর সঙ্গে আকাশে দেখা রামধনুর অমিলও রয়েছে কয়েকটি। ঘরের ভিতরে দেখা রামধনুর আকার পুরো গোল, কিন্তু পৃথিবীর মাটিতে দাঁড়িয়ে দেখা আকাশের রামধনু কখনোই পুরো গোল হয় না। সেই কারণেই নিশ্চয়ই জিনিশটার নাম 'রামচক্র' না হয়ে 'রামধনু' হয়েছে। তাছাড়া, ঘরের মধ্যের রামধনুটা দেখা যায় যে দেয়ালের দিক থেকে আলো আসছিলো কেবল সেই দিকেই। কিন্তু আকাশের রামধনু ফোটে যে দিক থেকে আলো আসছে তার উল্টো দিকে। সকালের রামধনু ওঠে পশ্চিম আকাশে আর বিকেলের দিকে হলে তা দেখা যায় পুব আকাশে; অর্থাৎ সব সময়েই যে দিকে সূর্য তার উল্টো দিকে। মাঝদুপুরে সূর্য যখন মাথার উপরে তখন রামধনু দেখা যায় না। বাইরের রামধনুটা তাহলে হয় কীভাবে?

সেটা বোঝার জন্য মনে করা যাক গ্রীষ্মের দুপুরের বন্ধ ঘর ছেড়ে বর্ষার এক বিকেলে বাইরে দাঁড়িয়ে পুব দিকের মেঘের দিকে তাকিয়ে আছে এক দর্শক। বৃষ্টি সদ্য হয়েছে অথবা হতে চলেছে — অর্থাৎ মেঘগুলি বড়ো বড়ো জলকণায় ভরা। ঘরের ভিতরের পরীক্ষাটায় জলের পাত্রটা যেমন গোল-আকার ছিলো, আকাশের জলকণাগুলিও তেমনই গোল। তাই সূর্যের রশ্মি তাদের উপরে পড়ে একই ভাবে একটি জলকণাতে দুটো প্রতিসরণ আর একটা প্রতিফলনে শুধু ওই ৪২ ডিগ্রি বেঁকে যাবে, অন্য সব দিকে ছড়ানো রশ্মিগুলি হবে অনেক কমজোরি। সূর্যের আলোতে দাঁড়ানো দর্শকের ছায়াটা যে দিকে পড়ছে সেটাকে কেন্দ্র করে একটা ফাঁপা শঙ্কু রয়েছে কল্পনা করা যাক। মনে করা যাক সে শঙ্কুটার কোণটা হলো ৪২ ডিগ্রি, এবং তার ডগাটা রয়েছে দর্শকের চোখে। সূর্য পৃথিবী থেকে এতোই দূরে যে সূর্যের সব রশ্মিগুলি মোটামুটি সমান্তরাল ভাবে পৃথিবীতে এসে পড়ে। কল্পনার ওই শঙ্কুটার গায়ের উপরে থাকা জলকণাগুলির প্রত্যেকটা থেকে যে কার্তেসীয় রশ্মিগুলি প্রতিসরিত ও প্রতিফলিত হয়ে ফিরে আসবে দর্শকের দিকে সেগুলি সবই আসবে ওই শঙ্কুটার গা বেয়ে — ইস্কুলে পড়া জ্যামিতি যাদের একটুও মনে আছে তারাই ১৭ নম্বর ছবিটা থেকে এটা বুঝতে পারবে। একটা ফাঁপা শঙ্কু আড়াআড়িভাবে কাটলে যে দাগটা পাওয়া যায় সেটা একটা গোল বৃত্ত। সে জন্যই চোঙাটা গা বেয়ে আসা রশ্মিগুলি চোখে পড়লে মনে হয় যেন আলোটা আসছে একটা গোল জায়গা থেকে — তাই রামধনুটাও গোল মনে হয়। আকাশে যেখানে সূর্য, সেখান থেকে শুরু করে রামধনুটা যে দেখছে অর মাথা অবধি যদি একটা সোজা দাগ টানা হয়েছে কল্পনা করা যায়, আর তারপরে যদি মনে করা যায় যে সেই দাগটা
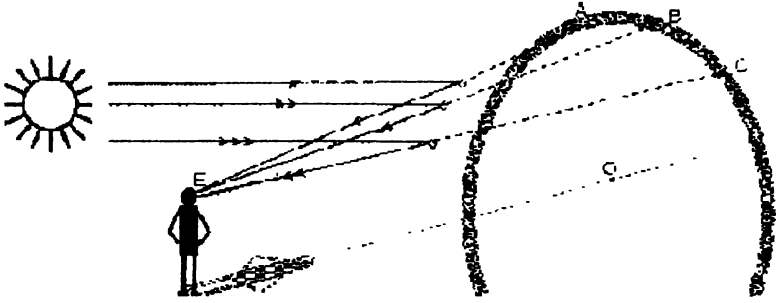
১৭ নং ছবি॥ *রামধনুর শঙ্কু। দর্শকের চোখ E বিন্দুতে, আর A, B, C হলো রামধনুর গায়ে তিনটি বিন্দু। AE, BE, CE দাগগুলি পড়বে একটি কল্পিত শঙ্কুর গা বেয়ে। রামধনুর কেন্দ্র হবে O বিন্দুতে।*

সামনের দিকে যতোদূর চোখ যায় ততোদূর চলে গেছে, তাহলে রামধনুর গোলটা থাকবে সেই দাগটাকে কেন্দ্র করে।

আকাশে সূর্য যখন বেশ নিচুতে, অর্থাৎ দিগন্তের কাছে, তখন ওই দাগটাও যাবে প্রায় পৃথিবীর উপরিতল বরাবর -- তাই রামধনুটা তখন হবে সবচেয়ে বড়ো। কিন্তু তাও রামধনুর পুরো গোলটার অনেকটাই দিগন্তের তলায় পড়বে বলে ধনুকের মতো অংশটুকুই শুধু চোখে দেখা যাবে। সূর্য আরো উঁচুতে থাকলে রামধনুর কেন্দ্রে থাকা দাগটা যে দিকে মুখ করে আছে সেটা দিগন্তের আরো নিচুর দিকে পড়বে তাই দিগন্তের উপরে রামধনুর গোলটার অনেক কম অংশ দেখা যাবে। সূর্য একেবারে মাঝ আকাশের কাছে থাকলে ওই দাগটা এমনই খাড়াখাড়ি হবে যে রামধনুর পুরো গোলটাই চলে যাবে দিগন্তের তলায়। আকাশে সূর্যের আলো এবং বাতাসে জলের কণা থাকা সত্ত্বেও তখন রামধনু দেখা যাবে না।

কিন্তু একেবারে পুরো গোল রামধনু যে কখনোই দেখা যায় না তা নয়। পৃথিবীর মাটি থেকে যখন আকাশে রামধনুটা আংশিক দেখা যাচ্ছে -- তখন কেউ যদি অনেক উঁচু একটা পাহাড়ের উপর থেকে, অথবা এরোপ্লেনে চড়ে আরো উঁচু থেকে দেখে, তাহলে রামধনুর পুরো গোলটাই দেখতে পাবে।

শুধু আকাশেই নয়, ফোয়ারা বা জলপ্রপাতে জলকণার উপরে সূর্যের আলো পড়লেও রামধনু দেখা যায়। শরৎ এলে যখন হাওয়ার 'পরে হিমের পরশ লেগে সকাল

বেলায় ঘাসের আগায় শিশিরের রেখা ধরে, তখন সেই শিশিরে সূর্যের আলো পড়েও গোল রামধনুর সৃষ্টি করে, একেবারে ঠিক ঠিক দেকার্তের তত্ত্ব অনুযায়ী কার্তেসীয় রশ্মির দিকে।

কিন্তু রামধনু সম্পর্কে সব কথা এখনো বলা হয়নি। সত্যি বলতে কী, আসল কথাটা — অর্থাৎ রামধনুর রঙটা আসে কোথা থেকে — সেটাই বাকি রয়ে গেছে। দেকার্ত রামধনুর রঙেরও একটা ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন বটে কিন্তু সেটা ছিলো ভুল। দেকার্তের সময় থেকে আরো পঞ্চাশ-ষাট বছর পরে, নিউটন যখন দেখালেন যে সাদা আলো হলো নানা রঙের আলোর মিশ্রণ, তখনই পুরো ব্যাপারটা ঠিক বোঝা গেলো। নিউটনের পরীক্ষায় সাদা আলো একটা কাচের ত্রিকোণ প্রিজমের মধ্যে ঢুকে নানা রঙে ভাগ হয়ে বেঁকে যায়। তেরচাভাবে চলা আলোর রশ্মি একটা মাধ্যম থেকে অন্য মাধ্যমে চলতে গেলে যে বেঁকে যায়, এবং কতোটা বেঁকবে সেটা যে নির্ভর করে মাধ্যমগুলির প্রতিসরাঙ্কের উপর – সেটা তো আগেই আলোচনা করা হয়েছে। যে কথাটা আগে বলা হয়নি তা হলো, প্রায় সব মাধ্যমেরই প্রতিসরাঙ্ক এক এক রঙের আলোর জন্য এক এক মাপের হয়। ৪০০ ন্যানোমিটার তরঙ্গদৈর্ঘ্যের বেগুনিরঙা আলোতে জলের প্রতিসরাঙ্ক হলো ১·৩৫, আর ৭০০ ন্যানোমিটার তরঙ্গদৈর্ঘ্যের লাল আলোতে সেটা হলো ১·৩০। তেমনই, ৪০০ ও ৭০০ ন্যানোমিটার তরঙ্গদৈর্ঘ্যের (বেগুনি আর লাল) আলোতে কাচের প্রতিসরাঙ্ক হলো যথাক্রমে ১·৫৬ ও ১·৫২। প্রতিসরাঙ্কের এই তফাৎটার জন্যই কাচের প্রিজমে সাদা আলো পড়লে তার নীল অংশটা বেঁকবে নীল আলোর জন্য কাচের যা প্রতিসরাঙ্ক সেটা অনুযায়ী, আর লাল আলো বেঁকবে লাল আলোর জন্য কাচের যতো প্রতিসরাঙ্ক তার হিসেবে। বিভিন্ন রঙের জন্য প্রতিসরাঙ্কগুলি আলাদা, তাই বিভিন্ন রঙ বেঁকবে বিভিন্ন পরিমাণে, এবং নেবে আলাদা আলাদা পথ।

জলের কণার ভিতরেও তাই হয়। আগেই বলা হয়েছে যে কার্তেসীয় রশ্মি কতোটা বেঁকবে সেটা জলের প্রতিসরাঙ্কের উপর নির্ভর করে। যেহেতু বিভিন্ন আলোর জন্য জলের প্রতিসরাঙ্কগুলি আলাদা — এক একটা রঙের জন্য কার্তেসীয় রশ্মি বেঁকবে এক এক পরিমাণে। প্রতিসরণ ও প্রতিফলনের সূত্রগুলি দিয়ে হিসাব করলে দেখা যাবে যে লাল আলোর কার্তেসীয় রশ্মি বেঁকেছে চল্লিশ ডিগ্রি আর বেগুনি আলোর কার্তেসীয় রশ্মি বেঁকেছে প্রায় বেয়াল্লিশ ডিগ্রি। অন্য রঙগুলি পড়ে এদের মাঝামাঝি জায়গায়। তাই জলকণা থেকেও বিভিন্ন রঙের কার্তেসীয় রশ্মি আমাদের চোখে আসে বিভিন্ন (কল্পিত) শঙ্কু বেয়ে। বেগুনি রঙের আলোর শঙ্কুটা থাকে একেবারে ভিতরে এবং লাল রঙের আলোর শঙ্কুটা থাকে সবচেয়ে বাইরে। তাই রামধনুতে বেগুনি রঙের গোলটা নিচের দিকে, অর্থাৎ পৃথিবীর দিকে, আর লালরঙা গোলটা উপরের দিকে, অর্থাৎ আকাশের দিকে। লাল থেকে বেগুনি অবধি আমাদের চোখে দৃশ্যমান আলোর সীমানার বাইরে

রয়েছে অবলোহিত এবং অতিবেগুনি আলো। আকাশের রামধনুতে সে আলোর বাল্লাও থাকে। আমাদের চোখ তা দেখতে পায় না, কিন্তু বিশেষ ক্যামেরা দিয়ে তোলা ছবিতে সেটা বোঝা যায়।

রামধনু সম্পর্কে আর একটা প্রশ্ন তুলে এ আলোচনাটা শেষ করা যাক। রামধনু ফুটিয়ে তোলার জন্য জলকণাগুলির কি একটা নির্দিষ্ট মাপের হওয়া দরকার, নাকি সেগুলি যে কোনো মাপের হলেই চলবে? দেকার্ত যেভাবে আলোর রশ্মি কাজে লাগিয়ে হিসাব করেছিলেন সেভাবে দেখলে রামধনুর বৈশিষ্ট্যগুলি জলকণাদের মাপের উপর নির্ভর করা উচিত নয়। কিন্তু দেকার্তের সময়ে জানা ছিলো না যে আলোর গতিবিধি ঢেউয়ের মতো। ১৬৭৮ সালে হল্যান্ডের বিজ্ঞানী খ্রিস্টিয়ান হাইগেন্স দেখালেন কীভাবে ঢেউয়ের তত্ত্ব দিয়ে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় আলোর এগিয়ে চলাটা বর্ণনা করা যায়। সেই তত্ত্ব ব্যবহার করে আয়ার্ল্যান্ডের বিজ্ঞানী জর্জ স্টোক্‌স্‌ ও ইংল্যান্ডের বিজ্ঞানী জর্জ এয়ারি ১৮৩০ সাল নাগাদ প্রমাণ করলেন যে রামধনু কেমন দেখতে হবে সেটা জলকণার মাপের উপর খুবই নির্ভর করে। তাঁরা দেখালেন যে রামধনুর দিকে তাকিয়েই বলে দেওয়া যায় মোটামুটি কী মাপের জলকণা থেকে রামধনুটা সৃষ্টি হয়েছে। জলকণার মাপ ১ থেকে ২ মিলিমিটার মতো হলে রামধনুতে বেগুনি আর সবুজটা খুব উজ্জ্বল দেখাবে, লাল অংশটা ভালো দেখা যাবে, কিন্তু নীল প্রায় থাকবেই না। জলকণাগুলি আধ মিলিমিটার মাপের হলে লাল অংশটা হবে অনেক ক্ষীণ, আর $\frac{১}{৫}$ মিলিমিটারের চেয়ে ছোটো হলে লালটা আর দেখাই যাবে না। জলকণাগুলি $\frac{১}{১০}$ মিলিমিটার, অর্থাৎ ১০০ মাইক্রোমিটার মতো হলে রামধনুটা হবে শুধু বেগুনি রঙের — আর তার চেয়ে ছোটো মাপের জলকণাদের রামধনু হবে কুয়াশায় ফোটা সাদা রামধনুর মতো। আকাশে বৃষ্টিজলের উপরে চাঁদের আলো পড়েও রামধনু ফোটে, যদিও সেটা সচরাচর দেখা যায় না। সে রামধনুও আসলে রঙিন, কিন্তু তা থেকে আসা আলোর তেজ এতোই কম যে মানুষের চোখে তার রঙ ধরা পড়ে না — সেটা সাদাটে বা ধূসর দেখতে লাগে।

বসরা শহরে জন্মেছিলেন বিজ্ঞানী আল হাইতাম টাইম মেশিনে চেপে যদি আমি তাঁর কাছে কভু যাইতাম আলোকরশ্মি কোন পথে ছোটে? আকাশেতে কেন রামধনু ওঠে? যত্ন করিয়া এহেন নানান প্রশ্ন তাঁরে চিগাইতাম।

৯ : মাটির রঙ

পলাশ বরন পাল

গ্রাম ছাড়িয়ে উধাও হয়ে যাওয়া রাঙা মাটির পথ রবীন্দ্রনাথের মন ভুলিয়েছিলো। ১৩১৫ বঙ্গাব্দে কবিতাটি লেখা, রবীন্দ্রনাথ তখন থাকতেন শান্তিনিকেতনে। লিখতে বসে তিনি নিশ্চয়ই দেখছিলেন বীরভূমের হাল্কা লাল রঙের মাটি।

কেন সেই গ্রাম্য পথের দৃশ্যে মুগ্ধ হয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ? পথটির আকার বা আকৃতির কোনো বৈশিষ্ট্যের জন্য কি? হতে পারে, তবে সে কথা কবি বলেননি। বলেছেন শুধু রঙের কথা, তাই পথের রঙটার একটা আকর্ষণ ছিলো সে কথা ভাবাটা খুব অন্যায় হবে না নিশ্চয়ই। শৈশব ও কৈশোরে অন্যান্য যে সব জায়গায় থেকেছেন রবীন্দ্রনাথ, যেমন কলকাতা বা পূর্ব-বাংলার শিলাইদহ ইত্যাদি যেখানে তাঁদের জমিদারির কুঠি ছিলো সেখানে — সে সব জায়গারই মাটির রঙ ছিলো কালচে। বীরভূমের মাটির রঙ তার ধারেকাছেও নয়, উজ্জ্বল লাল। এই ভিন্ন রঙের জন্য একটা আকর্ষণ নিশ্চয়ই তাঁর মনে ছিলো।

রবীন্দ্রনাথ যদি মরুভূমির আশেপাশে কোনো উষর অঞ্চলে বসবাস করতেন, তাহলে হয়তো সেখানকার হলদেটে মাটি দেখে তা নিয়ে কবিতা লিখতেন। যদি থাকতেন আগ্নেয়গিরির ধারেকাছে, দেখতেন কয়লার মতো ঘোর কৃষ্ণবর্ণ মাটি, গান বাঁধতেন তাই নিয়ে। কেন মাটির এতো রকমের রঙ হয়, সে প্রশ্ন আমাদের মনে জাগতেই পারে। তার উত্তর দেওয়ার আগে কিন্তু অন্য একটি কথা জানা দরকার, তা হলো -- মাটি জিনিশটা কী?

এক কথায় এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া কঠিন। নানা জিনিশের সংমিশ্রণে তৈরি হয় মাটি। পৃথিবীর স্থল অঞ্চলের অনেকটাই পাথুরে। পাথরের মধ্যে থাকে লোহা, অ্যালুমিনিয়াম, নিকেল ইত্যাদি নানা ধাতুর যৌগ। নানা কারণে ভূত্বকের পাথর ভেঙেচুরে যায়। দিনের বেলা পাথরগুলো উত্তপ্ত হয়ে আয়তনে সামান্য বেড়ে ওঠে, আবার রাত্তিরে কমে যায়। এই কমাবাড়ার টানাপোড়েনে পাথরে ফাটল ধরে। জল বা বাতাসের তোড়ে পাথরে-পাথরে ঠোকাঠুকি লেগেও পাথর ভেঙে টুকরো হয়ে যায়। এই সব প্রক্রিয়া

চলতেই থাকে, এবং তাতে কোনো কোনো টুকরো শেষ পর্যন্ত গুঁড়ো হয়ে যায়। এই পাথরচূর্ণ হলো মাটির অন্যতম প্রধান উপাদান।

মাটির দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো বালি। ভূত্বকে বালির পরিমাণ খুব বেশি। কোথাও কোথাও এতো বেশি যে শুধু বালিই দেখা যায়, যেমন সমুদ্রের সৈকতে বা মরুভূমিতে। যেখানে বালির আধিপত্য এমন নিরঙ্কুশ নয়, সেখানেও কিন্তু এর পরিমাণ নগণ্য নয়।

বালি মূলত সিলিকন ডাই-অক্সাইড নামক একটা যৌগিক পদার্থ দিয়ে গড়া। এই যৌগটি কাচেরও মূল উপাদান, এবং এর রঙ সাদাটে, প্রায় স্বচ্ছ। সাদা বালি চুনাপাথরের গুঁড়ো দিয়েও তৈরি হয়, এবং কখনো প্রচুর পরিমাণে সামুদ্রিক প্রবাল বা ঝিনুকের খোলস চূর্ণ হয়ে মিশে থাকার জন্যও বালি খুব সাদা হয়। মার্কিন দেশে 'হোয়াইট স্যান্ড্স্' নামে একটা মরুভূমি আছে নিউ মেক্সিকো রাজ্যে। সেখানকার সাদা বালির রঙ আসে ক্যালশিয়াম সালফেট থেকে।

শুধু পাথরগুঁড়ো আর বালি থাকলে মাটি আঠালো হতো না। এর সঙ্গে যোগ হয় জল। পাথরের ফাঁক-ফোকর দিয়ে প্রবাহিত হতে হতে তা পাথরের গুঁড়োগুলোকে একসঙ্গে জড়ো করে, তাদেরকে এঁটে ধরে। আর যোগ হয় জীবদেহের অবশেষ। প্রাণীদের দেহ থেকে নানান বর্জ্য পদার্থ প্রতিনিয়তই জমা হচ্ছে পৃথিবীর গায়ে। তা ছাড়া উদ্ভিদ বা প্রাণীরা মরে যাওয়ার পরে তাদের দেহের ক্ষয় হতে থাকে, অর্থাৎ দেহের উপাদানের সঙ্গে বাতাস বা অন্যান্য পারিপার্শ্বিক বস্তুর নানা রকমের রাসায়নিক ক্রিয়াকলাপ চলতে থাকে। এই সব মিলিয়ে জীবদেহের যে অবশেষ জমা হয়, বাংলায় এক কথায় তাকে জীবাবশেষ বলাই ভালো। এই জীবাবশেষ হলো মাটির অপর গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।

এই সব উপাদান একসঙ্গে মেশালে তবেই মাটি হয়। মেশানোর কাজটা কীভাবে হয়? কেঁচো ইঁদুর খরগোশ ইত্যাদি অনেক প্রাণী বাসা বাঁধার জন্য ভূত্বক খুঁড়ে গর্ত করে, তাতে উপাদানগুলোর নাড়াচাড়া হয়। আরো বহু ছোটো ছোটো প্রাণী আছে যেগুলোকে চোখে দেখা যায় না, তারাও সারাক্ষণ মাটি খুঁড়ে খুঁড়ে চলে। এই ওলোট-পালোটের সময়ে জল এসে সব কিছুকে এক সঙ্গে এঁটে ধরে। এ সবের ফলে ভূত্বকে যে মিশ্রণটি আমরা দেখতে পাই, তাকেই বলা হয় মাটি।

মাটির রঙ কেন নানা রকম হয়, তার উত্তরের একটা হদিশ এই আলোচনা থেকে সহজেই পাওয়া যাচ্ছে। মাটির বিবিধ যে সব উপাদানের কথা বলা হলো, তাদের অনুপাত সব জায়গায় সমান থাকে না। যেখানে যেটার পরিমাণ বেশি, সেখানে সেটার রঙ ফুটে বেরোয়। যেখানে বালির অনুপাত খুব বেশি থাকে, সেখানকার মাটি হয় হলদেটে। এই ধরনের মাটিকে আমরা বলি বেলে মাটি। আর যেখানে জীবাবশেষ খুব

বেশি, সেখানকার মাটি খুব আঠালো। জীবাবশেষের রঙ কালচে বলে এই এঁটেল মাটির রঙও কালচে।

এর সঙ্গে পাথরের রঙের কথাটাও ধরতে হবে। সেটা আর এক বিস্তারিত কাহিনী। সব পাথর যে এক রঙের হয় না, তা আমরা সবাই জানি। কেন নানা রকম রঙ, তার প্রধান কারণ দুটি — এক হলো পাথরের সৃষ্টির ইতিহাস, আর দুই হলো পাথরের সঙ্গে কী সব মিশে আছে তার বৃত্তান্ত।

দ্বিতীয়টা দিয়েই শুরু করা যাক। পাথরে থাকে নানা রকমের ধাতব যৌগ। কোন ধাতু থেকে তৈরি যৌগিক পদার্থ পাথরের মধ্যে কতোটা রয়েছে, তার ওপর নির্ভর করে পাথরের রঙ। লোহার যৌগের মধ্যে সবচেয়ে বেশি পাওয়া যায় মরচে, লোহার সঙ্গে বাতাসের অক্সিজেনের বিক্রিয়ায় যা তৈরি হয়। মরচের রঙ খুব গাঢ় লাল। এ ছাড়া লোহার আরো বেশ কিছু সহজলভ্য যৌগের রঙও লাল। তাই লোহার যৌগ যে পাথরে বেশি থাকে, সেই পাথর লালচে দেখায়। যে মাটিতে সেই পাথরগুঁড়ো বেশি মেশে, সেই মাটির রঙও লাল দেখায়। তেমনি দস্তার যৌগের পরিমাণ বেশি হলে রঙ হয় সাদাটে, অন্য কোনো ধাতুর যৌগ বেশি থাকলে অন্য কোনো রকম রঙ।

সব পাথরের সৃষ্টি একভাবে হয় না। সৃষ্টি বা গঠনের ইতিহাস অনুযায়ী পাথরকে মোটামুটি তিন ভাগে ভাগ করা হয়। একটি হচ্ছে আগ্নেয় শিলা, অর্থাৎ আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখ দিয়ে পৃথিবীর অভ্যন্তরের যে সব উপাদান বেরিয়ে আসে, সেগুলো যখন জমে পাথর হয়ে যায়। দ্বিতীয় ভাগ হলো রূপান্তরিত শিলা, অর্থাৎ পৃথিবীর অভ্যন্তরের বস্তু যখন ভূপৃষ্ঠের চাপে ও ভেতরের তাপে রূপান্তরিত হয় পাথরে। আর তৃতীয় ভাগ হলো পাললিক শিলা, অর্থাৎ পলি পড়ে পড়ে, তারপর কালক্রমে সেই পলি শক্ত হয়ে হয়ে যে শিলা তৈরি হয়।

এ থেকে সহজেই বোঝা যাচ্ছে, সব রকমের শিলার রঙ এক রকমের হওয়ার কোনো কারণ নেই। পাললিক শিলার উপাদান আসে ভূত্বক থেকে। আগ্নেয় শিলায় খুব বেশি পরিমাণে থাকে পৃথিবীর অভ্যন্তরের বিভিন্ন ধাতব উপাদান। আবার উপাদানের দিক থেকে দেখতে গেলে আগ্নেয় শিলারও রকমফের আছে। গ্র্যানিট পাথরে সিলিকন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ বেশি, প্রায় ৭৪ শতাংশ, তাই তার রঙ হয় হাল্কা। আর এক রকমের পাথর ব্যাসাল্ট, সেটাও আগ্নেয় শিলা, কিন্তু তাতে সিলিকন ডাই-অক্সাইড অপেক্ষাকৃত কম পরিমাণে থাকে, খুব বেশি হলে ৫০ শতাংশের মতো। তার সঙ্গে থাকে ক্যালশিয়াম অক্সাইড, ম্যাগনেশিয়াম অক্সাইড ও প্রায় ১৪ শতাংশ লৌহ অক্সাইড। এই সবের জন্য ব্যাসাল্টের রঙ অনেক গাঢ়, প্রায় কালো। যেখানে ব্যাসাল্ট পাথর খুব বেশি, সেখানকার মাটিতেও ব্যাসাল্টের গুঁড়ো বেশি, তাই সেই মাটি কুচকুচে কালো দেখতে হয়। মার্কিন দেশের পশ্চিমে অরেগন প্রদেশের মাটি এই রকম কালো।

মাটির রঙের নানা বর্ণনা পাওয়া যায় কাব্যে-সাহিত্যে। রবীন্দ্রনাথ 'রাঙা মাটি' নিয়ে গান বেঁধেছিলেন, সে কথা আগেই মনে করিয়ে দিয়েছি। অন্যত্র অন্য রঙের মাটির কথাও বলেছেন, যেমন :

এই যে কালো মাটির বাসা শ্যামল সুখের ধরা
এইখানেতে আঁধার-আলোয় স্বপন-মাঝে চরা।

নজরুলের কবিতায় পাওয়া যায় মাটির অন্য রঙের বর্ণনা :

বুঝি তাহারি লাগি
হয়েছে বৈরাগী
গেরুয়া-রাঙা গিরিমাটির দেশ।

গেরুয়া বা গৈরিক রঙ মাটির। 'গিরি' থেকে 'গৈরিক' — পাহাড়ে মাটির রঙ।

কোনো কোনো প্রকারের মাটির বিশেষ নাম আসে তার উপাদান থেকে। 'বেলে মাটি'-তে বালির পরিমাণ বেশি। অ্যালুমিনিয়ামের সঙ্গে বাতাসের অক্সিজেন যুক্ত হয়ে তৈরি হয় অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড নামে একটি সাদা রঙের যৌগিক পদার্থ -- ছোটো করে যাকে বলা হয় 'অ্যালাম'। যে মাটিতে এই অ্যালামের অনুপাত বেশি, তাকে বলা হয় 'অ্যালামাটি'।

পোড়া মাটিরও একটা আলাদা নাম আছে — 'টেরাকোটা'। বাংলার কিছু কিছু অঞ্চলের শিল্পকলায় পোড়া মাটির ভূমিকা এতো বেশি যে তার রঙের নাম হিসেবে এই 'টেরাকোটা' কথাটা বাংলা ভাষারই অঙ্গ হয়ে গেছে। এই নাম অবশ্য রঙের বর্ণনা নয়, মাটির উপাদানেরও নয়। নামটি এসেছে ইতালীয় ভাষা থেকে। সে ভাষায় 'terra' মানে 'মাটি', যা থেকে ইংরিজিতে 'terrain' 'territory' ইত্যাদি কথা এসেছে। আর 'cotta' মানে রান্না-করা, বা পোড়ানো। তাই 'টেরাকোটা'-র আক্ষরিক অর্থ হলো 'পোড়ামাটি'।

বহুদিন নানাদেশে করে কতো হাঁটাহাঁটি
দেখলাম কতো রঙে ভরা হতে পারে মাটি।
বীরভূমে লাল, তার কারণটা মরচে
জর্জিয়া রাজ্যে সে লাল আরো ওর চে'!
রসায়ন ঘেঁটে ঘেঁটে বুঝি তার খুঁটিনাটি।

১০ : সাগরের জল থেকে রত্ন

পলাশ বরন পাল, শেখর গুহ

১৯২১ খ্রিস্টাব্দের গ্রীষ্মকাল। জাহাজে করে ইংল্যান্ডের দিকে যাচ্ছেন ৩৩ বছর বয়স্ক এক ভারতীয় যুবক। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হয়েছেন বছর চারেক আগে। বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তাদের ইচ্ছে, পড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে গবেষণার কাজও করুন অধ্যাপকেরা। নইলে দেশের মুখ উজ্জ্বল হবে কেমন করে?

যুবকেরও প্রাণ-মন নিবেদিত গবেষণার কাজে। প্রথম যৌবনে যখন সরকারী অর্থ-দপ্তরে চাকরি করতে ঢুকেছিলেন, তখনও অফিসের কাজ সেরে সন্ধেবেলায় পড়ে থাকতেন বৌবাজারে ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর কাল্টিভেশন অফ সায়েন্সে, মৌলিক গবেষণার জন্য যে প্রতিষ্ঠান স্থাপনা করেছেন ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার। তারপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আহ্বান এসেছে, অর্থ-দপ্তরের চাকরি ছেড়ে ঝাঁপ দিয়েছেন অধ্যাপনায়। সঙ্গে গবেষণার কাজ — প্রকৃতির রহস্য উন্মোচনের চেষ্টা। কোন রহস্য অপেক্ষা করে আছে এই যুবকের হাতে উন্মোচিত হবে বলে, কে জানে?

সমুদ্রের ওপর দিয়ে চলেছে জাহাজ। চারপাশে শুধু সমুদ্রের জল - নীল, নীল, নীল। দ্যুতিময় সেই নীল রঙের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হলেন যুবক। এবং সেই মুগ্ধতাবোধের সঙ্গে আসে একটা বৈজ্ঞানিক প্রশ্নও। জল তো বর্ণহীন, তাহলে সমুদ্রের জল নীল দেখায় কেন?

কয়েকটি সমুদ্রের নামেই তাদের রঙের বর্ণনা রয়েছে। যেমন ‘কৃষ্ণ সাগর’, ‘লোহিত সাগর’, ‘পীত সাগর’। কৃষ্ণ সাগরের জল সত্যিই একটু কালচে — কেননা ওই সমুদ্রটা অপেক্ষাকৃত অগভীর, এবং তার তলদেশে রয়েছে কালো রঙের হাইড্রোজেন সালফাইড মেশানো পলি। লোহিতসাগরের পাড়ে মাটির রঙ লালচে, আর সে সাগরে নাকি লালচে শৈবালও দেখা যায়। পীত সাগরে হলদেটে গিরিমাটি বয়ে নিয়ে আসে চীনের বিখ্যাত ‘পীত নদী’।

এর কোনোটাকেই ঠিক জলের রঙ বলা চলে না, এগুলো হলো জলের সঙ্গে মিলেমিশে থাকা অন্য জিনিশের রঙ। যে কোনো সমুদ্রেরই একেবারে পাড়ের কাছে

যেখানটা খুব অগভীর, তলা থেকে বালি কাদা ইত্যাদি উঠে জলের সঙ্গে ঘেঁটে গিয়ে সেখানে জল খানিকটা কালচে দেখায়। কিন্তু এই যুবকের জাহাজ তখন মাঝসমুদ্রে, তীর থেকে বহুদূরে। সেখানে বালি-কাদা নেই, সেখানে জলের রঙ পরিষ্কার নীল। কেন?

এ প্রশ্নটির একটি বিখ্যাত জবাব আছে, অন্য অনেকের মতো এই যুবকও হয়তো সেটি শুনেছিলেন। সেই উত্তরটা হলো, সাগরে আকাশের ছায়া পড়ে বলেই সাগরকে নীল দেখায়। জলের তো নিজস্ব কোনো রঙ নেই, আকাশের ছায়া না হলে আর রঙ আসবে কোত্থেকে? এই মতটার উৎপত্তি কবে কোথায় কে জানে, তবে ১৯১০ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজ বিজ্ঞানী লর্ড র‍্যালের একটি নিবন্ধের মাধ্যমে মতটি বিজ্ঞানীমহলে সমাদর লাভ করে।

চন্দ্রশেখর বেঙ্কটরামন নামক যে ভারতীয় যুবকের কথা আমরা বলছি, তাঁর মনে হলো, আকাশের আর সমুদ্রের রঙের মধ্যে সম্পর্ক একটা আছে ঠিকই, কিন্তু সম্পর্কটা অন্য রকমের। সূর্যের আলো বায়ুমণ্ডলে বিভিন্ন গ্যাসের অণু থেকে ছড়িয়ে-ছিটকে আমাদের চোখে আসে। আলো যে ঢেউয়ের মতো আচরণ করে, সে কথা উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ায় বেশ ভালোরকম প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিলো। সেই তরঙ্গধর্ম কাজে লাগিয়ে লর্ড র‍্যালে দেখিয়েছিলেন আলোর বিক্ষেপণ কী ভাবে হয়, অর্থাৎ কোনো কিছুর সঙ্গে ধাক্কা খেলে আলো কীভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে। দেখিয়েছিলেন, ছোটো দৈর্ঘ্যের তরঙ্গের জন্য সেই বিক্ষেপণ বেশি জোরালো। নীল রঙের আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য ছোটো, অন্য দিক থেকে ছিটকে আমাদের চোখে আসাটা সেই রঙের আলোর পক্ষেই সহজ। সেই জন্যই আকাশ নীল দেখায়।

সমুদ্রের জল যে নীল দেখায়, তার কারণও কি তাই? সমুদ্র থেকে তো আর আলো বেরোয় না, সূর্যের আলো সমুদ্রের জল থেকে ঠিকরে আমাদের চোখে এসে পড়ে বলেই সেই জল আমরা দেখতে পাই। এই ঠিকরে আসা বা বিক্ষেপণ নীল আলোর জন্যই বেশি হয়, সেই জন্যই কি জলের রঙ নীল দেখায়? অর্থাৎ আকাশের নীল রঙ প্রতিফলিত করে সমুদ্র নীল হয় না আকাশ যে কারণে নীল, সমুদ্রও ঠিক সেই কারণেই নীল। ১৯২১-এই একটি গবেষণাপত্র লিখে সে কথা ঘোষণা করলেন রামন।

●—○—●—○—●

এইটুকু বলেই অবশ্য ছেড়ে দিলেন না চন্দ্রশেখর বেঙ্কটরামন। তিনি ঠিক করলেন, নিজে হাতে পরীক্ষা করে দেখবেন, জলের মধ্যে দিয়ে যাওয়ার সময়ে যখন আলোর বিক্ষেপণ হয়, তখন র‍্যালে যা বলেছেন সেই ভাবেই তা ঘটে কিনা, সত্যিই ছোটো তরঙ্গদৈর্ঘ্যের ঢেউগুলো বেশি বিক্ষেপিত হয় কিনা। ১৯২১-এর সেপ্টেম্বর মাসে ইংল্যান্ড থেকে কলকাতায় ফিরে এসে গবেষণাগারে শুরু করলেন সে কাজ। তরল পদার্থের মধ্যে

দিয়ে আলো গেলে সেই আলো কীভাবে বিক্ষেপিত হয়, এই হলো পরীক্ষা-নিরীক্ষার বিষয়।

এর জন্য যন্ত্রপাতি যা দরকার হয়েছিলো, তা প্রায় সবই তৈরি করা হতো গঙ্গার উল্টো দিকে, হাওড়ার ছোটো ছোটো কারখানায়। সাত ইঞ্চি ব্যাসের একটা দূরবীন দিয়ে সূর্যের আলো সংগ্রহ করা হতো। একটি শক্তিশালী লেন্স দিয়ে সে আলোকে পরিণত করা হতো একটা পেন্সিলের মতো সরু রশ্মিতে। নানান রঙিন স্বচ্ছ জিনিশের মধ্যে দিয়ে বা সূক্ষ্ম ঝাঁঝরির মধ্যে দিয়ে পাঠিয়ে সেই আলোকে ভেঙে ফেলা হতো বিভিন্ন রঙে। তারপর তার থেকে বেছে নেওয়া হতো একেকটি রঙ। কোনো একটি রঙের আলোর সেই রশ্মি তরল পদার্থের মধ্যে দিয়ে পাঠিয়ে পাশের দিক থেকে দেখা হতো তরল থেকে ঠিকরানো আলোর চালচরিত্র।

রামন একা ছিলেন না। তাঁর সহযোগী ও সহকর্মী ছিলেন বেশ কয়েকজন। কেউ করছিলেন উচ্চ চাপে বিক্ষেপণের পরীক্ষা, কেউ করছিলেন বিভিন্ন রকম তরল থেকে আলো ছিটকে যাওয়ার পরীক্ষা। দু রকমের দুটি তরল যদি নেওয়া যায়, একটার অণুর গঠন অন্যটার মতো হবে না। এই সব অণু থেকে আলো ছিটকে পড়ার ধরন দেখে, এবং বিক্ষেপিত আলোর পর্যালোচনা করে, কী করে তরলের অণুর আকৃতি জানা যেতে পারে, তা নিয়ে বেশ বিস্তারিত কাজ করলেন রামন ও তাঁর সহযোগীরা।

আগেই বলেছি, আলোর বিক্ষেপণের তাত্ত্বিক বর্ণনা দিয়েছিলেন লর্ড র‍্যালে। তাঁর ব্যাখ্যাকে আরো পরিমার্জিত করেন আলবার্ট আইনস্টাইন, বিংশ শতাব্দীর গোড়ায়। এই ব্যাখ্যা থেকে দেখা গেছিলো, বিক্ষেপণের ফলে আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্যের কোনো পরিবর্তন হয় না। অর্থাৎ ধরা যাক, একটি নির্দিষ্ট তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলো কোনো বস্তুতে লেগে ছড়িয়ে ছিটিয়ে গেলো। যে আলো এসে পড়েছিলো আর যে আলো বিক্ষেপিত হয়ে এলো, দুয়েরই তরঙ্গদৈর্ঘ্য সমান হওয়া উচিত র‍্যালে এবং আইনস্টাইনের ব্যাখ্যা অনুযায়ী। যদি সবুজ আলো নেওয়া হয়, তবে ধাক্কার পরেও সে আলো সবুজই থাকবে। নীল আলো থাকবে নীল। অন্য যে কোনো রঙ সম্পর্কেও ওই একই কথা।

১৯২৩ সালের এপ্রিল মাসে, অর্থাৎ রামন বিলেত থেকে ফেরার বছর দেড়েকের মধ্যেই, তাঁর ছাত্র রমানাথন রাও-এর পরীক্ষায় কিছু আশ্চর্য জিনিশ দেখা গেলো। জল, ইথার, বিভিন্ন অ্যালকোহল ইত্যাদির তরলের মধ্যে দিয়ে আলো পাঠিয়ে তিনি দেখলেন, বিক্ষেপিত আলোর মধ্যে মিশে থাকছে এমন তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলো, যা বিক্ষেপণের আগে ছিলো না। যে তরল দিয়ে পরীক্ষা করা হচ্ছিলো, তাকে খুব ভালো করে বিশুদ্ধ করে নেওয়া হলো, তাতেও এ অবস্থার কোনো হেরফের হলো না। ব্যাপারটা র‍্যালে ও আইনস্টাইনের ব্যাখ্যার বিরোধী, তাই ধাঁধার মতো লাগছিলো। ভালো করে বোঝার জন্য নানান তরল নিয়ে পরীক্ষা চালালেন রামন ও তাঁর সহযোগীরা। জল বা অ্যালকোহলের চেয়ে বেশি ঘন তরলের দিকে তাঁদের লক্ষ্য গেলো।
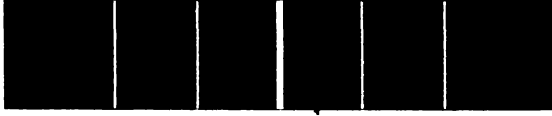
১৮ নং ছবি ॥ *রামন ও সহযোগীরা কী রকম শক্তির বিক্ষেপিত আলোকণা দেখেছিলেন। ছবির ডানদিকে শক্তি ক্রমশ বাড়ছে। যেখানে সাদা খাড়া দাগ আছে, সেই শক্তির আলোকণা দেখতে পাচ্ছিলেন তাঁরা।*

১৯২৭ খ্রিষ্টাব্দে একটা আশ্চর্য জিনিশ দেখলেন একজন সহযোগী বেঙ্কটেশ্বরন। বিশুদ্ধ গ্লিসারিনের মধ্যে দিয়ে তিনি পাঠিয়েছিলেন সূর্যের আলো। তারপর, আলোর পথে নয়, পাশের দিক থেকে দেখছিলেন, সেই আলো কী রকম দেখায়। সূর্যের দিকে না তাকিয়ে আকাশের অন্য দিকে তাকালে যে কারণে আমরা নীল দেখি, যে কারণে সমুদ্রের জল নীল দেখায়, সেই একই কারণে এখানেও নীল রঙ দেখলে আশ্চর্যের কিছু হতো না। কিন্তু বেঙ্কটেশ্বরন দেখলেন সবুজ রঙ। আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য নিশ্চয়ই বদলে যাচ্ছে, নইলে সবুজ হবে কেন?

তখন অন্যান্য অনেক তরল নিয়েও পরীক্ষা করা হলো। এবং সেই সব তরলের মধ্যে দিয়ে সূর্যালোক পাঠানো হলো না, পাঠানো হলো বিশেষভাবে তৈরি করা একবর্ণ আলো। রোদ্দুরের মধ্যে বেগুনি থেকে লাল পর্যন্ত অনেক তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলো থাকে। বিশেষ রকমের যে সব আলোর উৎস ব্যবহার করা হলো, তাতে ছেঁকে নেওয়া হয় মোটামুটি এক রকম মাপের তরঙ্গ। ফলাফল একই।

ফলাফলটা একটু পরিষ্কার করে বলা যাক। র‍্যালে এবং আইনস্টাইনের ব্যাখ্যা যে আগাপাশতলা ভুল তা মোটেই নয়। তাঁরা যেভাবে বলেছিলেন, সেভাবে বিক্ষেপণ হচ্ছে, সমস্ত তরল থেকেই হচ্ছে। এবং বিক্ষেপিত আলোর মধ্যে এই অংশটাই সবচেয়ে জোরালো   এটাই মুখ্য রেখা। এতে বদলাচ্ছে না আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য, অর্থাৎ বদলাচ্ছে না রঙ। যে রঙের আলো পাঠানো হচ্ছে তরলের মধ্যে, সেই রঙের আলোই বেরিয়ে আসছে সবচেয়ে বেশি পরিমাণে। কিন্তু তার সঙ্গে অন্য কিছু রঙের, অর্থাৎ অন্য কিছু তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলোও বেরোচ্ছে। মুখ্য রেখার চেয়ে বেশি তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলোও আছে এর মধ্যে, কম তরঙ্গদৈর্ঘ্যেরও আছে। এইটা নতুন আবিষ্কার।

তরঙ্গদৈর্ঘ্যের পরিবর্তন হচ্ছে, শুধু সেটুকু বললে সব বলা হলো না। যে রঙের আলো পাঠানো হচ্ছে তরলের মধ্যে, এবং অন্য যে রঙের আলো দেখা যাচ্ছে, তাদের মধ্যে একটা বিশেষ সম্বন্ধ আবিষ্কার করেন রামন। সে সম্বন্ধটা কী, তা বুঝতে গেলে আলো এবং পদার্থের কোয়ান্টাম তত্ত্বের অবতারণা করা দরকার।

কোয়ান্টাম তত্ত্বের জন্ম বিংশ শতাব্দীর একেবারে উষালগ্নে। আলোর স্রোতকে তরঙ্গ হিসেবে ভাবাটাই দস্তুর ছিলো তার আগে। কিন্তু ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে আলবার্ট আইনস্টাইন দেখালেন, আলোর কোনো কোনো আচরণ ব্যাখ্যা করতে গেলে ওইভাবে কাজ চলে না, আলোর স্রোতকে ভাবতে হয় এক রকমের কণার স্রোত হিসেবে।

আলোকে যদি ঢেউ হিসেবে ভাবি, তাহলে বিভিন্ন রঙের আলোকে বলতে পারি বিভিন্ন তরঙ্গদৈর্ঘ্যের ঢেউ। আলোকে যদি কণা ভাবতে হয়, তাহলে বিভিন্ন রঙের কথা ভাববো কী করে? এ প্রশ্নের জবাব ছিলো মাক্স প্লাঙ্ক রচিত একটি বিখ্যাত ফর্মুলায়। প্লাঙ্ক সরাসরিভাবে আলোর কথা বলেননি, অন্য প্রসঙ্গে তরঙ্গ এবং কণার চরিত্র কীভাবে একে অন্যের পরিপূরক হতে পারে তা বোঝাতে গিয়ে বলেছিলেন, একটি স্রোতকে তরঙ্গরূপে দেখলে তার যা তরঙ্গদৈর্ঘ্য, আর কণারূপে দেখলে তার এক-একটা কণিকার যতো শক্তি, সে দুটির মধ্যে একটা সহজ সম্বন্ধ আছে। তরঙ্গদৈর্ঘ্য যদি ন্যানোমিটারে মাপা হয়, আর শক্তি যদি ইলেকট্রন-ভোল্ট বলে একটা এককে মাপা হয়, তাহলে এই দুইয়ের গুণফল হবে ১২৪০। অর্থাৎ ৪০০ ন্যানোমিটার তরঙ্গদৈর্ঘ্যের বেগুনি আলোকে যদি আলোকণার ঝাঁক হিসেবে ভাবা যায়, প্রতিটি আলোকণার শক্তি হবে ১২৪০ ÷ ৪০০ বা ৩ · ১ ইলেকট্রন-ভোল্ট। ৭০০ ন্যানোমিটারের লাল আলোর জন্য আলোকণার শক্তি হবে ১২৪০ ÷ ৭০০ বা মোটামুটি ১ · ৭৭ ইলেকট্রন-ভোল্ট। অন্যান্য রঙের দৃশ্যমান আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য এই দুই সীমার মাঝখানে, তাই তাদের কণার শক্তিও ১ · ৭৭ আর ৩ · ১ ইলেকট্রন-ভোল্টের মাঝামাঝি।

এবার তাহলে কোন রঙের আলো তা বোঝাতে গেলে 'তার তরঙ্গদৈর্ঘ্য অতো ন্যানোমিটার' এ রকম করে না বলে আমরা বলতে পারি, 'তার কণার শক্তি অতো ইলেকট্রন-ভোল্ট'। বা আরো সংক্ষেপ করে বলতে পারি, 'অতো ইলেকট্রন-ভোল্টের আলো'। এবং রামন ও তাঁর সহকর্মীরা যা দেখলেন, তার সারমর্ম হলো -- বিক্ষেপণের সময়ে আলোকণার শক্তি বদলাতে পারে। সে শক্তি মূলের চেয়ে বেশিও হতে পারে, কমও হতে পারে, ১৮ নম্বর ছবিতে যেমন দেখানো হয়েছে। শুধু তাই নয়, তাঁরা দেখলেন, কোনো একটি নির্দিষ্ট তরলের মধ্যে দিয়ে যদি আলো পাঠানো যায়, তাহলে আলোকণার শক্তির বদল কতো কতো হতে পারে, তার পরিমাণ নির্দিষ্ট।

কেন, তা বুঝতে গেলে আলোর বিক্ষেপণের কথাটা একেবারে কেঁচে গণ্ডূষ করতে হবে। আগে ভাবছিলাম, অণু-পরমাণুগুলো ছোটো ছোটো কণা, আর আলো এক রকমের ঢেউ -- তাই অণু থেকে আলোর বিক্ষেপণ মানে একটি কণা থেকে একটি ঢেউয়ের বিক্ষেপণ। আলোর কণারূপ যদি স্বীকার করে নিই, তাহলে অণুর সঙ্গে আলোর ধাক্কা মানে কণায়-কণায় ধাক্কা, তার নিয়ম অন্য রকম। দুটো কণার মধ্যে শক্তির আদান-প্রদান ঘটতে পারে এখানে। যদি আলোকণা খানিকটা শক্তি দিয়ে দেয় অণুটিকে, তাহলে আলোকণার শক্তি কমে যাবে, অর্থাৎ আলোর ঢেউয়ের তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেড়ে যাবে। আর

যদি শক্তির নতুন বাঁটোয়ারায় অণুর থেকে খানিকটা শক্তি নিয়ে নেয় আলোকণা, তাহলে তার শক্তি বেড়ে যাবে। রামন বললেন, এই জন্যই কম ও বেশি, দু রকম শক্তির আলোই দেখা যাচ্ছে বিক্ষেপণের পরে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে অবশ্য শক্তির লেনদেন হবে না কিছুই, সেক্ষেত্রে বিক্ষেপণের ফলে আলোর কম্পাঙ্ক বদলাবে না - র‍্যালে এবং আইনস্টাইন যেমন বলেছিলেন। তাই মূল তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলোও দেখা যাবে, যেমন দেখেছিলেন রামন ও তাঁর সহকর্মীরা।

পদার্থের অণুর সঙ্গে ধাক্কাধাক্কিতে আলোকণার শক্তি ঠিক কতোটা বাড়বে বা কমবে? এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য জানতে হবে, অণু কী পরিমাণ শক্তি দিতে বা নিতে পারে। এবং সে প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য জানা দরকার, একটা অণুর কী কী পরিমাণ শক্তি থাকা সম্ভব।

এইখানে আর একটা বড়ো ধাক্কা খেয়েছিলো সনাতনী পদার্থবিদ্যা। নিউটন-ম্যাক্সওয়েল ইত্যাদিদের সূত্র অনুসারে যদি ভাবা হয়, তাহলে একটা অণুর যে কোনো পরিমাণ শক্তিই থাকা সম্ভব ছিলো। কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষদিক থেকেই নানা পরীক্ষানিরীক্ষায় বোঝা যাচ্ছিলো, অণু বা পরমাণুর শক্তি সে রকম নয়। আনতাবড়ি যে কোনো একটা পরিমাণ শক্তি বলে দিলাম, আর একটা অণুকে ওমনি সেই পরিমাণ শক্তি দিয়ে সাজিয়ে আনা হলো, এ রকম হয় না। বরং যা ঘটে, সেটাকে ঠিক করে বলতে গেলে বলা উচিত, অণুর অনেক শক্তিস্তর আছে, (২৯পৃষ্ঠায়) ৭ নম্বর ছবিতে যে রকম দেখানো হয়েছিলো হাইড্রোজেন পরমাণুর জন্য।

ব্যাপারটা যেন আলমারিতে বই রাখা বা আলনায় কাপড় ঝোলানোর মতো। মাটি থেকে কতো উঁচুতে রাখা হবে বই বা কাপড়, তার উত্তর যথেচ্ছ পরিমাণ হতে পারে না। সবচেয়ে নিচের তাকটা ধরা যাক মাটি থেকে ১০ সেন্টিমিটার ওপরে, সেখানে রাখা যেতে পারে। পরের তাকটি মাটি থেকে ৪০ সেন্টিমিটার ওপরে, সেখানেও রাখা যেতে পারে। কিন্তু মাটি থেকে ২২ বা ৩৭ সেন্টিমিটার ওপরে রাখার কোনো উপায় নেই। অণুরও সে রকম শক্তিস্তর থাকতে পারে -- কয়েকটি বিশেষ বিশেষ শক্তিতে তাকে পাওয়া সম্ভব, অন্য শক্তিতে নয়।

এইটুকু মনে রাখলে বাকিটা সহজ। শক্তির ক্ষয়-ব্যয় নেই, যে কোনো ঘটনায় মোট শক্তি বাড়েও না কমেও না। এখানে যে ঘটনাটা ঘটছে তা হলো আলোকণার সঙ্গে তরলের অণুর সংঘর্ষ। তাতে আলোকণার শক্তি যদি কমে যায়, অণুর শক্তি সেই পরিমাণে বাড়তে হবে। আমরা বললাম, অণুর শক্তি আনতাবড়ি যে কোনো পরিমাণে বাড়তে পারে না -- কিছু কিছু নির্দিষ্ট পরিমাণেই অণুর শক্তির বদল হওয়া সম্ভব। অতএব আলোকণার শক্তি কমতে পারে কিছু কিছু নির্দিষ্ট পরিমাণেই। সংঘর্ষে আলোকণার শক্তি বাড়তেও পারে, কিন্তু সেক্ষেত্রেও একই কথা -- কতোটা বাড়বে তা নির্ধারিত হবে তরলের অণুর শক্তিস্তর দিয়ে।

একবার এই ব্যাখ্যাটা মেনে নিলে সঙ্গে সঙ্গে বোঝা যায়, কোনো একটা নির্দিষ্ট তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলো পাঠিয়ে বিক্ষেপণের পরে অন্য কোন কোন তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলো পাওয়া গেলো, তা দেখে অণুর শক্তিস্তরগুলোর হদিশ পাওয়া যায়। রামনের আবিষ্কারের সবচেয়ে সুদূরপ্রসারী ফল হলো এটাই। এতে ব্যবহারিক দিক থেকেও লাভ আছে। ধরা যাক, আমরা কোনো একটা তরল পদার্থ পেয়েছি, কী তরল তা জানি না। তার মধ্যে দিয়ে আলো পাঠিয়ে সেই আলোর রঙ কী রকম বদলায়, তা দেখে নেওয়া যায়। এইবার চেনা সব তরলের সঙ্গে মিলিয়ে দেখলেই বোঝা যাবে, কোন তরল পাওয়া গেছে। অনেকটা হাতের ছাপ মিলিয়ে মানুষ চেনার মতো।

এইভাবে আণবিক পদার্থবিদ্যা ও রসায়নের জগতে বিপ্লব এনে দিয়েছিলেন রামন। ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে নোবেল পুরস্কার এলো তাঁর হাতে। কিন্তু তার চেয়েও বড়ো পুরস্কার আছে। রামনের নেতৃত্বে এই আবিষ্কারটা হয়েছিলো বলে আলোর রঙ পরিবর্তনের এই প্রক্রিয়াটার নামই হয়ে গেলো *'রামন ক্রিয়া'* বা *'রামন বিক্ষেপণ'*। এইভাবে বিক্ষেপণ করে আলো যে রেখাগুলো দেখা যায় সেগুলোকে বলা হয় *'রামন রেখা'*। বিভিন্ন তরলের জন্য রামন রেখাগুলি নির্ণয় ও লিপিবদ্ধ করার কাজ নিয়ে গড়ে উঠলো পদার্থবিদ্যা তথা রসায়নের বিশাল একটি প্রশাখা। এই গোটা প্রশাখাটির নামই রামনের নামে। এ সম্মান নিতান্ত মুষ্টিমেয় বিজ্ঞানীর ভাগ্যে জোটে, রামন সেই দুর্লভ খ্যাতির অধিকারী।

সাগরের জল ছেঁচে ডুবুরিরা পায় মণিমুক্তো। সাগরের জলের রঙ নিয়ে চিন্তা করতে শুরু করে রামন পেয়েছিলেন তার চেয়েও অনেক মূল্যবান রত্ন।

● — ○ — ● — ○ — ●

অবশ্য সমুদ্রের জলের রঙ সম্পর্কে আসল কথাটা এখোনো বলা হয়নি। এই সূত্র ধরেই রামন তাঁর বৈপ্লবিক আবিষ্কারটা করেছিলেন বটে, কিন্তু সমুদ্রের জলের নীল রঙে রামন-বিক্ষেপণের পরিমাণ ধর্তব্যের মধ্যে নয়। প্রথমে রামন ভেবেছিলেন র‍্যালে-বিক্ষেপণের ফলে সমুদ্রে নীল রঙ হতে পারে। মূল কারণ সেটাও নয় – তা যদি হতো, তাহলে যে কোনো তরলই বেশি পরিমাণে থাকলে নীল দেখাতো। ব্যাপারটার মধ্যে জলের নিজস্ব কোনো ধর্ম জড়িত আছে নিশ্চয়ই।

আমরা জানি, জলের প্রতিটি অণুতে দুটি হাইড্রোজেনের পরমাণু এবং একটি অক্সিজেনের পরমাণু থাকে, যে জন্য জলের সাঙ্কেতিক নাম H_2O। তিনটে পরমাণু দিয়ে গড়া এই অণুটিতে ইলেকট্রনের শক্তির ধাপগুলো কী রকম হবে তা হিসেব করা যায় কোয়ান্টাম তত্ত্বের নিয়ম দিয়ে।

অণুর মোট শক্তির মধ্যে নানা জিনিশের অবদান রয়েছে। প্রতিটি পরমাণুর মধ্যে ইলেকট্রন আছে। নিউক্লিয়াসের চারদিকে ঘোরার জন্য সেই ইলেকট্রনের শক্তি আছে একটা। আগেই বলা হয়েছে, সে শক্তির পরিমাণ যা খুশি তাই হতে পারে না, ধাপে ধাপে

বাড়ে। এর মধ্যে সবচেয়ে নিচের ধাপের শক্তিকে যদি শূন্য বলি, তাহলে পরবর্তী ধাপটির শক্তি ৪ ইলেকট্রন-ভোল্ট। হাজার-হাজার ডিগ্রি তাপমাত্রা না হলে ইলেকট্রনগুলো সবই থাকে ওই প্রথম ধাপে, দ্বিতীয় বা আরো ওপরের ধাপের ইলেকট্রনের সংখ্যা হয় অতি নগণ্য। জলের ওপরে তাই যদি ৪ ইলেকট্রন-ভোল্টের চেয়ে কম শক্তিসম্পন্ন আলোকণা এসে পড়ে তাহলে সেই আলো একেবারেই শুষে নিতে পারবে না ইলেকট্রনগুলো, কেননা ইলেকট্রনকে দ্বিতীয় ধাপে তোলার মতো শক্তি সে আলোকণার নেই।

কিন্তু জলের অণুর শক্তি শুধু ইলেকট্রনের গতি থেকেই আসে না। তিনটে পরমাণু যে আছে, তাদের মধ্যে দূরত্ব সব সময়ে সমান থাকে না, তালে তালে সেটা বাড়ে কমে। টেনিস বা ক্রিকেট খেলার দুটি বল যদি একটা স্প্রিঙের দু প্রান্তে জোড়া হয় এবং তারপর বলদুটিকে একটু টেনে নিয়ে ছেড়ে দেওয়া হয়, তাহলে বল দুটি যেমন কাছে আসবে ও দূরে সরে যাবে, আবার কাছে আসবে, দূরে সরে যাবে, এবং এইভাবে ক্রমাগত কাঁপতেই থাকবে — পরমাণুগুলোর ক্ষেত্রেও তাই হয়। এই দোলার সঙ্গে যে শক্তি জড়িত তাও পড়ে কোয়ান্টাম তত্ত্বের আওতায়। সে তত্ত্ব কাজে লাগিয়ে এই কাঁপুনির শক্তি বার করা যায়। জলের ক্ষেত্রে, একটি হাইড্রোজেন এবং একটি অক্সিজেন পরমাণুর যে বাঁধন, যাকে লেখা হয় 'O–H', তার কাঁপুনির শক্তি হিসেব করে দেখা গেছে যে প্রথম ধাপটির থেকে পরেরটির শক্তি ০.৪৫ ইলেকট্রন-ভোল্ট বেশি। এর ওপরে যে সব ধাপ আছে, সেগুলোও সমান দূরত্বে, অর্থাৎ দ্বিতীয়টি থেকে তৃতীয়টিও ০.৪৫ ইলেকট্রন-ভোল্ট বেশি শক্তি ধরে, তৃতীয়টি থেকে চতুর্থটিও তাই।

অর্থাৎ ০.৪৫ ইলেকট্রন-ভোল্ট শক্তির আলোকণা যদি জলে এসে পড়ে, তাহলে সে শক্তিটা শুষে নিয়ে O–H জুটির কাঁপুনিটা বেড়ে যেতে পারে। তেমনি, ইলেকট্রন-ভোল্টে শক্তির পরিমাণ যদি ০.৪৫-এর কোনো গুণিতক হয়, তাহলেও আলো শুষতে পারবে O–H জুটি, সে ক্ষেত্রে একাধিক ধাপ উঠে যাবে তার কাঁপুনির শক্তি। কতো ধাপ উঠলে শক্তির কতো তফাত হবে, তা দেখানো হয়েছে ১ নম্বর ছকে, এবং সেই সঙ্গে দেখানো হয়েছে, প্লাঙ্কের সূত্র অনুযায়ী কোন তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলোতে সেই শক্তির আলোকণা থাকে।

মনে রাখতে হবে, আমরা চোখে দেখতে পাই ৪০০ থেকে ৭০০ ন্যানোমিটার তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলো। ১ নম্বর ছকে এই সীমার মধ্যে রয়েছে তিনটি তরঙ্গদৈর্ঘ্য। তাহলে দৃশ্যমান আলোর চৌহদ্দির মধ্যে ৬৮৯, ৫৫১ এবং ৪৫৯ ন্যানোমিটারের আশেপাশের আলোকেই জল শুষে নিতে পারে। কিন্তু সবাইকে সমানভাবে নয়। কোয়ান্টাম তত্ত্ব পরিষ্কার বলছে, যতো বেশি ধাপ অতিক্রম করতে হবে আলো শুষে নিতে গেলে, ততোই আলো শোষার ক্ষমতা কমবে। তার মানে জলের ওপরে সাদা আলো যদি পড়ে, জল তার ৬৮৯ ন্যানোমিটারের দিকটা, অর্থাৎ লাল অংশটা যতোটা শুষবে, ৫৫১ ন্যানোমিটারের সবুজ ততোটা শুষতে পারবে না, ৪৫৯-এর নীলকে আরোই কম শুষতে

১ নং ছক॥ *ক ধাপ উঠে কতো শক্তি শুষে নিতে পারে জলের অণু।*

কতো ধাপ	কাঁপুনির শক্তি (ইলেকট্রন-ভোল্টে)	আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য (ন্যানোমিটারে)
১	০·৪৫	২৭৭৫
২	০·৯০	১৩৭৮
৩	১·৩৫	৯১৮
৪	১·৮০	৬৮৯
৫	২·২৫	৫৫১
৬	২·৭০	৪৫৯
৭	৩·১৫	৩৯৪
৮	৩·৬০	৩৪৪

পারবে। সাদা আলোর মধ্যে লালের দিকটা বেশি শোষিত হবে বলে জলের রঙ দেখাবে নীল।

এক গেলাস জল হাতে ধরলে এই নীল রঙ আমাদের চোখে পড়ে না। তার কারণ, অতোটুকু জলে খুবই কম পরিমাণ আলো শোষিত হয়, খালি চোখে তাতে কোনো তফাত বোঝা যায় না। কিন্তু অনেকটা জল থাকলে এই তফাত ধরতে পারে আমাদের চোখ। তাই দিঘির জল থেকে শুরু করে সমুদ্রের জল, সবই নীল দেখায়।

প্রশ্ন করেন চন্দ্রশেখর রামন
সমুদ্দুরের রঙ কেন নীল অমন?
বলে গেছেন স্বয়ং র‍্যালে
বাতাস আলো ঠিকরে ফেলে,
জলেও আলো ছড়ায় নাকি তেমন?

১১ : শিখার রঙ ধোঁয়ার রঙ

পলাশ বরন পাল

আগুনের লেলিহান শিখার বর্ণনা কাব্যে-সাহিত্যে অনেক জায়গায় পাওয়া যায়। সেখানে আগুনের রঙের বর্ণনা কী রকম হয়? চিত্রশিল্পী যখন ছবি আঁকেন, তখন তিনিই বা কী রকম রঙ দেন আগুনের?

উত্তর হচ্ছে লাল। বা তার সঙ্গে মেশানো খানিকটা হলুদ। খুব উজ্জ্বল হলুদ, যাতে চোখ প্রায় ধাঁধিয়ে যায়। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'দিবারাত্রির কাব্য' উপন্যাসের শেষের দিকে একটা আগুনের বর্ণনা আছে, তাতে আগুনকে বলা হয়েছে সোনালি সে-ও এই লাল আর হলুদের মিশ্রণ।

সব আগুনই কি এই রকম রঙের হয়? অবশ্যই না, এবং অন্য রঙের আলোর জন্য খুব বেশি দূরে যাওয়ার দরকার নেই। আমাদের দৈনন্দিন জীবনেই অন্য রঙের আগুন আমরা দেখি। রান্নার জন্য যে গ্যাসের উনুন ব্যবহার করা হয় বাড়িতে বাড়িতে, তার শিখা মোটেই লাল হয় না, হয় নীল। কেরোসিন তেলের স্টোভ এখন খুব কম দেখতে পাওয়া যায়। যে সব পাঠকের মনে আছে স্টোভের কথা, তাঁরা বলতে পারবেন, সলতের মুখে নীল রঙেরই শিখা জ্বলতো, কদাচিৎ হয়তো তার মধ্যে দেখা যেতো একটু হলদে বা লালের ছোঁয়া। ঝালাই করার জন্য যে শিখা দিয়ে লোহা বা ওই জাতীয় ধাতু গলানো হয়, তারও রঙ নীল।

নানা রঙের আগুনের জন্য নানা রকমের শিখার সন্ধান না করে আমরা একটি জ্বলন্ত মোমবাতির দিকে তাকাতে পারি। সেখানে দেখতে পাবো, একই শিখায় নানা রঙের আগুন। সলতের ঠিক পাশ দিয়ে খানিকটা কালো জায়গা। তার বাইরে দিয়ে হলুদ আগুন। হলুদের নিচে ছোট্টো একটু নীল অংশ।

কেন এ রকম বিচিত্র বর্ণের সমাহার? তার কারণ বুঝতে গেলে আমাদের প্রথমেই মনে করে দেখতে হবে, মোমবাতিতে আগুন জ্বলে কী উপায়ে। মোম এমন এক রকমের পদার্থ, যাকে কঠিন থেকে তরল, এবং তরল থেকে বাষ্প করার জন্য খুব আহামরি রকমের বেশি তাপমাত্রায় যেতে হয় না। সলতেয় যখন আগুন দেওয়া হয়, তখন তার
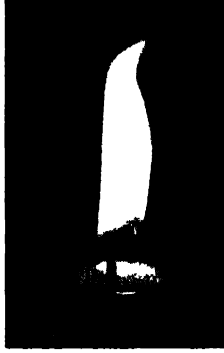
১৯ নং ছবি॥ *মোমবাতির শিখার বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন রকম রঙ। (এ ছবিটি রঙে দেখা যাবে ৪৮ ও ৪৯ পৃষ্ঠার মাঝখানে রঙিন ছবির জন্য নির্ধারিত আলাদা পাতায়।)*

গরমে তলার মোম গলতে থাকে। সেই গলা মোমে সলতে ভিজে যায়, অর্থাৎ গলিত মোম সলতে বেয়ে উঠতে থাকে ধীরে ধীরে। খানিকটা বাষ্প হয়ে সলতের আশেপাশে ছড়িয়ে পড়ে। ওপরে আগুন তো ছিলোই, সেই আগুনে এর পর মোম পুড়তে শুরু করে। পোড়ার সময়ে বেশ কিছুটা শক্তি বেরিয়ে আসে মোম থেকে সেই শক্তিরই বহিঃপ্রকাশ হয় আলো এবং তাপ হিসেবে।

তাহলে মোদ্দা কথা হলো, মোম পুড়ছে। আর একটু ভারি কথায় বলে, দহন। দহন মানে কী? বাতাসের অক্সিজেনের সঙ্গে কিছু একটা রাসায়নিক বিক্রিয়া হওয়া। শিখার মাঝখানের কালচে অংশের রহস্য তাহলে খুবই সহজ। এখানে বাইরে থেকে অক্সিজেন ভালো করে পৌঁছোতেই পারে না, তাই দহন ভালোভাবে হতে পারে না। দহন না হলে শক্তিও বেরোবে না, আলোও হবে না। জায়গাটা অন্ধকার-অন্ধকার, বা কালো দেখাবে।

দহন সবচেয়ে ভালো হয় শিখার একেবারে নিচের দিকটায়। গলা মোম নিচ থেকে ওঠে বলে এখানে মোমের জোগান বেশ ভালো, অক্সিজেনেরও কোনো অভাব নেই। ওপরের দিকে, শিখার বাইরের অংশে, অক্সিজেন অপর্যাপ্ত কিন্তু নিচের তুলনায় মোমের জোগান কম। এই তফাতের জন্য দু জায়গায় আলোর রঙ দু রকম।

আমরা যা বললাম তার অর্থ দাঁড়ায় এই যে, ভালো করে পুড়লে আগুন নীল হবে, তেমন ভালো করে না পুড়লে হলুদ-লাল হবে। এ কথাটা প্রকারান্তরে আগেও বলা হয়েছিলো, নক্ষত্রদের রঙের কথা বলতে গিয়ে। দহন যতো জোরালো হবে, তার থেকে যে বিকিরণ বেরোবে তার তরঙ্গদৈর্ঘ্য ততোই ছোটোর দিকে যাবে। রান্নার গ্যাস-উনুনে, বা ঝালাই করার শিখায় দহন খুব ভালো হয় বলেই সেই সব শিখার রঙ নীল। কাঠ পোড়ালে নীল আগুন হয় না, কারণ কাঠের তন্তুর মধ্যে জলীয় অংশ থাকে অনেকটা,

বলা বাহুল্য সেটা জ্বলার কাজে একটু বাধার সৃষ্টি করে। কোথাও যখন আগুন লাগে, তখনও তার রঙ মোটামুটি লাল-হলুদের মধ্যেই থাকে, কারণ সে আগুনের কবলে পড়ে নানা রকমের নানা জিনিশ, এমনকি কিছু কিছু অদাহ্য বস্তুও। সব মিলিয়ে আগুনটা জোরদার হয় না, রঙটাও নীলের দিকে যায় না।

●—○—●—○—●

শিখার বা আগুনের কথা বললেই তার সঙ্গে অন্য একটি বিষয়ের কথাও মনে আসতে বাধ্য। ধোঁয়া। বিজন পথের অভিযাত্রীরা দূর থেকে ধোঁয়া দেখলেই বুঝতে পারেন, কোথায় আগুন আছে, অতএব মনুষ্য-বসতি আছে। সব শিখার যেমন এক রকম রঙ হয় না, সব ধোঁয়ারও তেমনি। অযত্নে রাখা গাড়ি চললে তার যে ধোঁয়া বেরোয় তার রঙ কালো, আবার জল ফুটালে যে ধোঁয়া বেরোয় তা মোটামুটি স্বচ্ছ।

গাড়ি থেকে কেন কালো ধোঁয়া বেরোয় তা বোঝা খুব সহজ। গাড়ির জ্বালানি হলো পেট্রোল বা ডিজেল। এগুলো সবই একই জাতের রাসায়নিক পদার্থ, পরিভাষায় এদের গোষ্ঠীটিকে বলে হাইড্রোকার্বন। অর্থাৎ এই গোষ্ঠীভুক্তদের আণবিক গঠনের মধ্যে থাকে হাইড্রোজেন এবং কার্বন। দহন যখন হয়, তখন বাতাসের অক্সিজেনের সঙ্গে রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটে। তার ফলে হাইড্রোজেন আর কার্বন আর একসঙ্গে থাকে না, বাঁধন টুটে যায়। হাইড্রোজেন মিলিত হয় অক্সিজেনের সঙ্গে, তৈরি হয় জল। তাপমাত্রা বেশি থাকে বলে এই জল তৈরি হয় বাষ্পের আকারে, সেই স্বচ্ছ বাষ্প উড়ে যায়, আমরা দেখতে পাই না। আর কার্বনও অক্সিজেনের সঙ্গে মিলিত হয়, তৈরি হয় কার্বন ডাই-অক্সাইড। এটিও স্বচ্ছ গ্যাস, তাই এটিও আমরা দেখতে পাই না।

জ্বালানি তরলের সমস্ত হাইড্রোজেন এবং সমস্ত কার্বন যদি পুড়ে গিয়ে জল ও কার্বন ডাই-অক্সাইডে পরিণত হতো, তাহলে আমরা ধোঁয়ার রঙ দেখতে পেতাম না। মুশকিল হচ্ছে, দহন সব জায়গায় খুব সম্পূর্ণ হয় না। মোমবাতির শিখার বেলায় যেমন সলতের কাছের অংশে ভালো করে অক্সিজেন পৌঁছোতে পারে না বলে দহন ভালো হয় না, তেমনি গাড়ির তলায় বা সামনের হুডের নিচে রাখা ছোট্টো যে কুঠুরিতে জ্বালানিটা পোড়ানো হয়, তার সব অংশে ঠিকমতো অক্সিজেনের জোগান থাকে না। তার ফলে যদি হাইড্রোজেন না পোড়ে তাতে রঙের কিছু আসে যায় না, কারণ হাইড্রোজেনও স্বচ্ছ গ্যাস। কিন্তু যে কার্বনটুকু পোড়ে না? অতিসূক্ষ্ম গুঁড়োর আকারে তা বেরিয়ে আসে, ধোঁয়ার সঙ্গে মিশে। কার্বনের রঙ কালো, তাই ধোঁয়ায় কালো রঙ দেখা যায়।

একই ব্যাপার ঘটতো আগেকার কালের ট্রেনে। তার জ্বালানি অবশ্য তরল হাইড্রোকার্বন হতো না, হতো কয়লা, যার মূল উপাদান হলো কার্বন। কার্বন দিয়ে তৈরি কোনো যৌগ নয়, একেবারে মৌলিক কার্বন। দহনের ফলে কার্বন ডাই-অক্সাইড তৈরি হতো। কিন্তু কিছুটা না-পোড়া কার্বন থাকতোই, জানলার পাশে-বসা যাত্রীদের

চোখে-মুখে এসে পড়তো সেই সূক্ষ্ম কয়লা-গুঁড়ো। এখন কয়লার ইঞ্জিন উঠেই গেছে। অনেক ট্রেনে জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করা হয় ডিজেল, মানে হাইড্রোকার্বন। এ রকম ট্রেনের ধোঁয়া মোটোরগাড়ির ধোঁয়ার মতোই — এতেও না-পোড়া কার্বন থাকে, তবে সে কার্বন আণবিক গঠন ভেঙে বার হয়। কয়লার একটা ছোট্টো গুঁড়োতেও যতো কার্বন পরমাণু থাকে ততোগুলো পরমাণু একসঙ্গে দানা বাঁধার সময় ও সুযোগ পায় না, তাই হাইড্রোকার্বনের ধোঁয়ায় ভাসতে থাকা দানাগুলো কয়লার গুঁড়োর মতো অতো বড়ো হয় না। খুব ছোটো হয়, একটা দানা আলাদা করে চোখে দেখা যায় না, কিন্তু রেললাইনের পাশে, বা যে সব রাস্তায় বেশি গাড়ি চলে তার আশেপাশের বাড়ি-ঘর-দোরে এই গুঁড়ো জমা হতে হতে কালির আস্তরণ পড়ে যায়।

গাড়ির নির্মাতাদের কাজ, এই ব্যাপারটা যাতে না হয় তা দেখা, অর্থাৎ দহন-কুঠরির সর্বত্র যাতে পর্যাপ্ত অক্সিজেন যায় তার ব্যবস্থা করা। নতুন গাড়ি থেকে তাই কালো ধোঁয়া বেরোতে দেখা যায় না। কিন্তু ব্যবহার করতে করতে সব যন্ত্রাংশের কর্মক্ষমতা কমে আসে, নিয়মিত যত্ন করে তাদের চাঙ্গা করতে হয়। যাঁরা সে কাজে অবহেলা করেন, তাঁদের গাড়ি থেকেই কালো ধোঁয়া বেশি ছড়ায়।

এই কালো ধোঁয়া তাই অনেক কিছুর সঙ্কেত বহন করে আনে। না-পোড়া কার্বন থেকে যাওয়া মানে জ্বালানির অপচয় হচ্ছে। সেই কার্বন-গুঁড়ো আশেপাশের মানুষজন জন্তুজানোয়ারের শরীরে ঢুকে শ্বাসকষ্ট এবং অন্যান্য রোগের কারণ হচ্ছে। তার ওপর, অক্সিজেনের অভাব ঘটলে শুধু যে বিশুদ্ধ কার্বন পড়ে থাকে তা নয়, অল্প পরিমাণ অক্সিজেনের সঙ্গে কার্বনের মিলনে কার্বন-মনক্সাইড নামক আর একটি গ্যাস তৈরি হতেও পারে। এই গ্যাসটি অতি বিষাক্ত। অন্তত তার হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যই কালো ধোঁয়া দেখলেই সতর্ক হওয়া উচিত, গাড়ির যত্ন নেওয়া উচিত।

● — ○ — ● — ○ — ●

ধোঁয়া শুধু কালো রঙেরই হয় না। ধোঁয়ার সঙ্গে যদি কার্বন না থেকে অন্য কোনো কণা মিশে থাকে, তাহলে সেই কণার রঙ ধোঁয়ায় দেখা যাবে। তাছাড়া ধোঁয়ায় যে গ্যাস বেরোচ্ছে, তারও নিজস্ব একটা রঙ থাকতে পারে — সব গ্যাসই কার্বন ডাই-অক্সাইডের মতো স্বচ্ছ হয় না। ক্লোরিন গ্যাস হয় নীলচে সবুজ বা সবজেটে নীল। সাঁতারের চৌবাচ্চায় জলের মধ্য দিয়ে জীবাণুনাশক হিসেবে এই ক্লোরিন পাঠানো হয় বলে জলের রঙ একটু বেশি নীল দেখায়।

বায়ু রঙহীন স্বচ্ছ, তার মধ্যে রঙিন কোনো ধোঁয়ার আবির্ভাব ঘটলে সেটিকে সহজেই দেখা যায়। তেমনি, গুঁড়ো কার্বনের মতো অস্বচ্ছ কিছু মিশে গেলে সেটাও দেখা যায়।

কিন্তু জলীয় বাষ্পের বেলা কী হয়? বাটিতে জল ফোটানো হলে জলীয় বাষ্প উড়ে যেতে তো দিব্যি দেখা যায়। বিষ্টি হয়ে যাওয়ার পরে ভেজা রাস্তা থেকে যখন জল বাষ্পীভূত হতে থাকে, তখনও একটা শিরশিরে ঢেউয়ের মতো তা দেখতে পাওয়া যায়। অথচ জলীয় বাষ্পও বর্ণহীন এবং স্বচ্ছ। তবু কেন তা দেখতে পাওয়া যায় সাদা ধোঁয়ার মতো? খুঁটিয়ে বলতে গেলে এটা ঠিক রঙ নিয়ে প্রশ্ন নয়, কিন্তু যে সমস্ত কারণে রঙ দেখা যায় তাদের সঙ্গে এর একটা নিবিড় সম্পর্ক আছে। তাই এ নিয়ে একটু না বললে এই প্রসঙ্গটি অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।

স্বচ্ছ জিনিশ বলতে আমরা কী বুঝি? এক কথায় বলা যায়, যে পদার্থের মধ্যে দিয়ে আলো গেলে পদার্থ সেই আলোর রশ্মিকে শুষে নেয় না, সেটাই স্বচ্ছ। অর্থাৎ স্বচ্ছ পদার্থের ভেতর দিয়ে আলো অবাধে যেতে পারে। পুরোপুরি অবাধেই যদি যেতে পারে, তাহলে জিনিশটাকে আমরা দেখতে পাবো না। কোথাও আলো বাধা পেয়ে আমাদের চোখের দিকে এলে তবেই না দেখা যাবে!

ডেকচিতে যখন জল ফুটছে, তখন তার ওপরে যদি পুরোটা জায়গা জুড়েই থাকতো জলীয় বাষ্প, তাহলে সত্যিই তার মধ্যে দিয়ে অবাধে আলো যেতো, এবং সেই বাষ্পকে দেখা যেতো না। কিন্তু পুরো জায়গাটায় জলীয় বাষ্প থাকে না। কী থাকে, তার ইঙ্গিত পাওয়া যেতে পারে ডেকচিটার দিকে তাকালে। দেখবো, পুরো জায়গার জল এক সঙ্গে বাষ্পীভূত হচ্ছে না। একটা ছোট্টো অংশ গরম হচ্ছে, সেখানে বাষ্প বুদবুদের আকারে সঞ্চিত হচ্ছে, তারপর ঠেলাঠেলি করে বেরিয়ে আসছে ওপর দিকে।

ডেকচির ভেতরে যেমন তরল জল আর তার বাষ্প মিলেমিশে আছে, ডেকচির ওপরে তেমনি বাতাস আর বাষ্প। বাষ্প এসে সমস্ত বাতাসকে এক ফুঁয়ে সরিয়ে দিচ্ছে না। বাতাসের মধ্যে ঠেলেঠুলে জায়গা করে নিচ্ছে। বাষ্পের ছোটো ছোটো কণা ভাসতে ভাসতে ঘুরে বেড়াচ্ছে বাতাসের মধ্যে। আবার, ডেকচির খানিকটা ওপরে যেখানে তাপমাত্রা কম, সেখানে জলীয় বাষ্প একটু একটু করে জমে গিয়ে তৈরি হচ্ছে জলকণা। খুব ছোটো ছোটো কণা। এরাও ভেসে বেড়াচ্ছে বাতাসের মধ্যে। ফলে সব মিলিয়ে ডেকচির ওপরে যা দাঁড়াচ্ছে, সে একটি আশ্চর্য চিড়িয়াখানা। তার মধ্যে বাতাস আছে, জলীয় বাষ্প আছে, জলকণাও আছে।

এখন কথা হচ্ছে, আলো এই সব কিছুর মধ্যে দিয়ে একভাবে পথ চলে না। এই একটু বাতাস, এই একটু জলকণা, এই একটু বাষ্প, এর মধ্যে দিয়ে যেতে গিয়ে আলোর অবস্থাটা হয় ব্যাগাটেলি খেলার গুলির মতো — একটু এগোচ্ছে, তারপর বাতাস আর জলকণার যেখানে সীমানা সেখানে ঠোকা খেয়ে ঘুরে যাচ্ছে — বিচিত্র পথে বারংবার প্রতিফলিত হতে হতে চলে আলো। সেই প্রতিফলনের সময়ে খানিকটা আলো ঠিকরে আমাদের চোখেও আসে, তাই বাষ্পকে আমরা দেখতে পাই।

কথাটা খেয়াল করার মতো। শুধু যদি জলীয় বাষ্প সমানভাবে ছড়িয়ে থাকতো খানিকটা জায়গা জুড়ে, তাহলে তা দেখা যেতো না, কারণ আলো তার মধ্যে দিয়ে অবাধে যেতে পারতো। জলকণা মিশে থাকার জন্য সেটি আমাদের দৃষ্টির গোচর হচ্ছে, কারণ নানা জায়গা থেকে প্রতিফলিত হচ্ছে আলো। এই বহু-প্রতিফলনের সঙ্গে জড়িত আছে আমাদের দৃষ্টি সংক্রান্ত আরো অনেক বিষয়, সে সব আলাদা করে আলোচনা করা হয়েছে পরের অধ্যায়ে।

এসো এসো দেখে যাও ভ্রাতা আর ভগ্নী,
ধিকি-ধিকি, দাউ-দাউ, গনগনে অগ্নি।
লাল, নীল, সাদা, পীত
নানা রঙে বিরাজিত
কেন তা? বুঝতে করো বিজ্ঞানে লগ্নি।

১২ : সাদা কথা

শেখর গুহ

কোন কোন জিনিশ সাদা তার একটা তালিকা বানাতে কারুরই খুব বেশি অসুবিধা হবে না। আকাশের মেঘ, মাঠের কাশফুল, শিমুলগাছের তুলো এবং তা দিয়ে বানানো রঙ না-করা কাপড়, গেলাস ভরা দুধ, হাতে ধরা এই বইটার পাতা, চুনকাম করা দেয়াল, সাবানের ফেনা, কৌটো ভরা চিনি অথবা নুন, শীতের জায়গায় তুষার — সাদা জিনিশের অভাব নেই দুনিয়ায়। তার উপর, সূর্যের আলো, বিজলি বাতির আলো, এগুলোও তো সাদাই। কীসের থেকে আসে এই সাদা রঙ?

বেশির ভাগ জিনিশেরই রঙ নির্ভর করে বর্ণালির কোন কোন অংশগুলি সেই জিনিশটা শুষে নিতে পারে অথবা বিশেষভাবে ঠিকরোতে বা প্রতিফলিত করতে পারে তার উপরে। সব সাদা জিনিশেরই একটা বিশেষত্ব হলো, দৃশ্যমান আলোর কোনো রঙকেই সেগুলি শুষে নেয় না। সাধারণ সাদা জিনিশ যে উপাদানে গড়া হয় সেগুলি নিজেরাই হয় স্বচ্ছ। স্বচ্ছ বলতে আমরা এমন জিনিশ বুঝি, যার মধ্যে দিয়ে আলো বিনা বাধায় স্বচ্ছন্দে চলতে পারে — অর্থাৎ যার ভেতর দিয়ে আমরা পরিষ্কার দেখতে পারি। যেমন জানলার কাচ বা স্থির হয়ে থাকা জল, কিংবা স্রেফ বাতাস। আমাদের চোখের সামনে থাকলেও পুরোপুরি স্বচ্ছ বলে বাতাস যেমন চোখেই পড়ে না, তেমনি খুব পরিষ্কার কাচও এমনই স্বচ্ছ হতে পারে যে তা সামনে আছে কি নেই তা বোঝাই মুশকিল হয়ে পড়ে। যেমন মহাভারতের গল্পে পাণ্ডবদের নতুন সভাগৃহ দেখতে গিয়ে দুর্যোধনের হয়েছিলো। এইচ-জি-ওয়েল্সের বিখ্যাত গল্পেও একজন মানুষ রাসায়নিক উপায়ে নিজের শরীরকে পুরো স্বচ্ছ করে দিয়ে 'অদৃশ্য' হয়ে গেছিলো।

মসৃণ এবং পরিষ্কার কাচ আমরা প্রায় দেখতেই পাই না বলা যায়, কেননা তার উপরে পড়া আলোর প্রায় সবটাই কাচটার মধ্যে দিয়ে চলে যায়। শুধু অল্প একটু, যতোটা আলো এসে পড়েছিলো তার আট শতাংশ মতো, কাচটার দুধার থেকে প্রতিফলিত হয়ে আসে। কিন্তু সেই স্বচ্ছ কাচও যদি শিরিষ কাগজ বা একটা উখা দিয়ে

২০ নং ছবি॥ *বাঁদিকের ছবিতে মসৃণ আয়না থেকে সুষমভাবে প্রতিফলন হচ্ছে। ডানদিকের ছবিতে দেখা যাচ্ছে এবড়ো-খেবড়ো তল থেকে ব্যাপ্ত প্রতিফলন।*

ঘষা হয় তাহলে দেখা যায় যে ঘষা কাচটা আর স্বচ্ছ নেই, হয়ে গেছে সাদা। এরকম হয় কেন?

ঘষে দেওয়ার ফলে যখন কাচের উপরিতলটা এবড়ো-খেবড়ো হয়ে যায়। সেখানে আলো এসে পড়লে তা কেবল একদিকে প্রতিফলিত না হয়ে নানা দিকে ছড়িয়ে পড়ে, আর অনেকটা আলোই ভেতরে না ঢুকে চলে আসে বাইরের দিকে, ২০ নম্বর ছবিতে যেমন দেখা যাচ্ছে। এ রকম ছড়িয়ে পড়াকে বিজ্ঞানের ভাষায় বলে *ব্যাপ্ত প্রতিফলন* সহজ বাংলায় হয়তো বলা যায় 'ছড়ানো প্রতিফলন'। প্রতিদিনের জগতে বেশিরভাগ জিনিশই আমরা দেখতে পাই এই ব্যাপ্ত প্রতিফলনের সাহায্যে। বই-খাতা, জামা-কাপড়, দেয়াল-মেঝে, টেবিল-চেয়ার ইত্যাদি যে কোনো কিছুরই উপর আলো পড়লে সেটা এই ব্যাপ্ত প্রতিফলনের জন্য নানা দিকে ছড়িয়ে পড়ে। একটা জিনিশ থেকে প্রতিফলিত সেই ছড়ানো আলোর যেটুকু আমাদের চোখে আসে তা দিয়েই আমরা জিনিশটাকে 'দেখি'। য়োহান হাইনরিখ লামবের্ট নামে এক জার্মান গণিতবিদ ও জ্যোতির্বিজ্ঞানী ১৭৬০ সালে লাতিন ভাষায় প্রকাশ করেন এই ব্যাপ্ত প্রতিফলনের তত্ব এবং তার হিসাব কষার গাণিতিক উপায়। কিন্তু ব্যাপ্ত প্রতিফলনের কারণটা আরো ভালো করে বোঝা গেলো আরো অনেক পরে ১৮০১ সাল নাগাদ যখন ইংল্যান্ডের টমাস ইয়াং আর ফরাসীদেশের জঁ অগুস্ত্যাঁ ফ্রেনেলের গবেষণা থেকে নিশ্চিতভাবে মেনে নিতে হলো যে আলো একটা ঢেউ।

ঘষে দেওয়া কাচের উপরটা কতোটা এবড়ো-খেবড়ো হলে সেখান থেকে ব্যাপ্ত প্রতিফলন দেখা যাবে তার একটা মাপ আছে। উপরিতলের এবড়ো-খেবড়ো আঁচড়গুলো যদি আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য থেকে অনেক ছোটো হয় তাহলে আলোর কাছে উপরিতলটা মসৃণ বলেই মনে হবে, আর তখন ব্যাপ্ত প্রতিফলন হবে খুব কম। এবড়ো-খেবড়ো উঁচু-নিচু জায়গাগুলি আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্যের চেয়ে অনেক অনেক বড়ো হলেও আবার ব্যাপ্ত প্রতিফলন কমে যাবে — কারণ তখন জায়গাটা আলোর কাছে আর এবড়ো-খেবড়ো লাগবে না, মনে হবে অনেকগুলো মসৃণ জায়গার সমাহার। সেই মসৃণ অংশগুলি দিয়ে আলো কাচের ভিতরে চলে যেতে পারবে ব্যাপ্ত প্রতিফলন ছাড়াই। কিন্তু উঁচু-নিচুগুলো আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্যের কাছাকাছি যদি হয় ··· অর্থাৎ ওগুলোর মাপ যদি
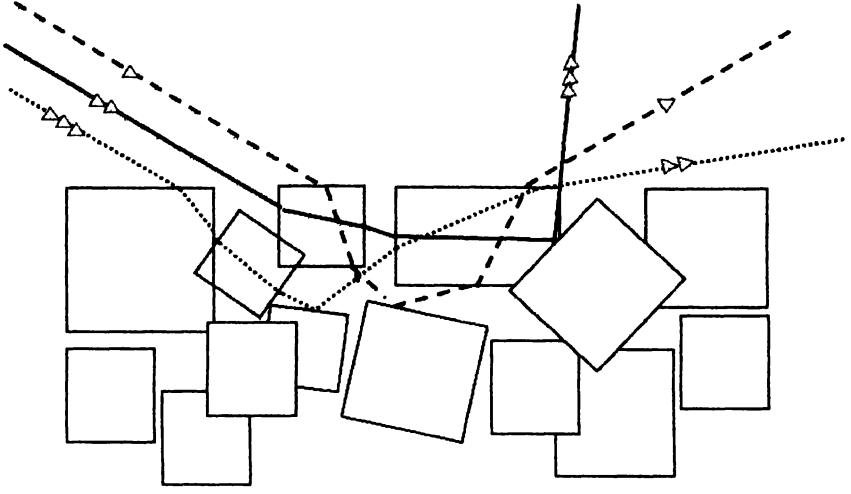
২১ নং ছবি॥ *বহু প্রতিফলন।*

আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্যের ২০ ভাগের একভাগ থেকে ২০ গুণ পর্যন্ত বড়ো, এই সীমানার মধ্যে পড়ে   তাহলে আলো তাদের মধ্যে দিয়ে সহজে ঢুকতে পারবে না, সেই এবড়ো-খেবড়ো তল থেকে আলো নানাদিকে ঠিকরোবে। সেই ঠিকরানো, বা বিজ্ঞানের ভাষায় বিক্ষেপণ, সাদা আলোর সব রঙের জন্যই মোটামুটি সমান পরিমাণে হয়, তাই ঘষে দেওয়া কাচটা দেখায় সাদা।

অন্য একভাবেও স্বচ্ছ কাচকে সাদা করে দেওয়া যায়। ঘুড়ির সুতোয় মাঞ্জা দেওয়া এককালে প্রায় সব বাঙালি ছেলেদের অবশ্যকর্তব্যের মধ্যে পড়তো। সুকুমার রায় 'পাগলা দাশু' বইতে তা নিয়ে একটি চমৎকার গল্প লিখেছেন। মাঞ্জার একটা প্রধান উপকরণ হলো মিহি কাচের গুঁড়ো। হামানদিস্তায় গুঁড়ো করার পর পুরো স্বচ্ছ কাচও সাদা দেখায়। যেমন দেখায় কৌটো বা চামচভরা নুন বা চিনি। গুঁড়ো কাচের একটা কণা, বা নুন কি চিনির একটা দানা অণুবীক্ষণের তলায় ফেললে দেখা যাবে যে ওই কণা বা দানাগুলি মোটামুটি স্বচ্ছ। কিন্তু দানাগুলি যখন একসঙ্গে গায়ে গায়ে লেগে থাকে তখন তাদের উপরে পড়া আলো ওগুলির একটা থেকে আর একটায় বার বার প্রতিফলিত হয়। এই বহু বার প্রতিফলিত আলোর যে অংশটুকু বাইরের দিকে আসে, সেটা নানা দিকে ছড়ায়, ২১ নম্বর ছবিতে যেমন দেখানো হয়েছে। অর্থাৎ বহু প্রতিফলনই গুঁড়োগুলোর গা থেকে ব্যাপ্ত প্রতিফলনের কারণ। সব রঙের জন্যই এই বহু-প্রতিফলন মোটামুটি একই পরিমাণে হয় বলে প্রতিফলিত আলোটা আমাদের চোখে পড়লে গুঁড়োটাকেও আমরা সাদাই দেখি।

একটা নুন বা চিনির দানা, কিংবা কাচের গুঁড়োর একটা কণা, আমাদের কাছে দেখতে খুব ছোটো হলেও আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্যের চেয়ে এরা অনেক গুণ বড়ো। কিন্তু

ক্রমাগত যদি ওরকম স্বচ্ছ একটা দানার মাপ কমানো যেতো তাহলে কী হতো? ১৯০৮ সালে জার্মান বিজ্ঞানী গুস্টাফ মী আর ডেনমার্কের লুডভিগ লোরেন্স সেই প্রশ্নের উত্তর হিসাব কষে বার করেন। তাঁদের হিসাবটা থেকে দেখা গেলো যে একটা স্বচ্ছ দানার মাপ আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্যের কুড়ি গুণের চেয়ে কম হলে আলো বিক্ষেপিত হয় একটু বিশেষ ভাবে। সব রকম রঙের আলোর জন্যই এই বিক্ষেপণ মোটামুটি সমান হয়। দৃশ্যমান আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য ৪০০ থেকে ৭০০ ন্যানোমিটার, তার ২০-গুণ দৈর্ঘ্য হলো ৮ থেকে ১৪ মাইক্রোমিটার। কোনো দানার মাপ এই আট-দশ মাইক্রোমিটারের কম হলে তা থেকে সব রঙের আলোই মোটামুটি সমান ঠিকরোবে। সে দানাটার নিজস্ব রঙ তাই বলা যায় সাদা, মী ও লোরেন্সের হিসাবটার এটা একটা প্রধান ফল। মী-লোরেন্স তত্ত্বটা দিয়ে অনেক জিনিশেরই সাদা রঙ হওয়ার কারণ বোঝা গেলো।

প্রথমত আকাশের মেঘ যার মধ্যে জলকণাগুলির মাপ আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্যের চেয়ে দুই থেকে দশগুণ মতো বড়ো। তাদের মধ্যে এই মী-লোরেন্স বিক্ষেপণ এবং তার সাথে খানিকটা বহু-প্রতিফলন এনে দেয় ওই সাদা রঙ। বর্ষার জল ভরা মেঘের রঙ অবশ্য কালো হয় — সে মেঘে জলকণাগুলি অনেক বড়ো বলে সেগুলির ভেতরে আলো অনেকটাই ঢুকতে পারে — কিন্তু বহু-প্রতিফলনের জন্য, অথবা জলের মধ্যে শুষে গিয়ে আলোটা বেরোতে পারে না -- তাই তাদের কালো দেখায়।

বড়ো মাপের জলকণাভরা মেঘ কখনো আবার নীলও দেখায়। তার কারণ সে কণাগুলির উপর তেরচা ভাবে সাদা আলো পড়লে সে আলোর লাল অংশটা শুষে যায় অপেক্ষাকৃত বেশি। বেরিয়ে আসা আলোতে বাকি রঙগুলি মিশে ওগুলিকে নীল করে তোলে। যদিও রবীন্দ্রনাথ আষাঢ় গগনে তিল ঠাঁই না রেখে ভরে থাকা নীল নব ঘনের কথা লিখেছেন, সাধারণত একেবারে মাঝ-আকাশের মেঘ নীল হয়না, শুধু সাদা বা কালোই হয়।

মী-লোরেন্সের তত্ত্ব দিয়ে দুধের সাদা রঙ হওয়ার কারণও চমৎকার বোঝা গেলো। দুধে থাকে ক্যাসেইন নামে ছোটো ছোটো প্রোটিনের অণু, যাদের মাপ ১০০ ন্যানোমিটারের মতো। আর থাকে অপেক্ষাকৃত বড়ো স্নেহ পদার্থের অণু, চার-পাঁচশো ন্যানোমিটারের মতো সেগুলোর মাপ। দু রকম অণুই আলোর বিক্ষেপণ ঘটায় — এবং মী ও লোরেন্সের তত্ত্ব অনুযায়ী সে বিক্ষেপণ আলোর রঙের উপর বিশেষ নির্ভর করে না — তাই বিক্ষেপিত আলোটা সাদা দেখায়। মাখন তোলার পরে দুধে রয়ে যায় শুধু ক্যাসেইন, অর্থাৎ প্রোটিনের অণুগুলো। তাদের মাপ ছোটো হওয়ার জন্য তাদের থেকে বিক্ষেপণের পরিমাণটা কম হয় — তাই সে দুধের সাদা রঙটা দেখায় অনেক হাল্কা।

রঙ না করা কাগজ ও কাপড় যে সাদা দেখায় তার কারণও মী-লোরেন্স বিক্ষেপণ। কাগজ এবং তুলো দুটোই সেলুলোজ নামক স্বচ্ছ তন্তু দিয়ে তৈরি। আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য যে মাপের, এই তন্তুগুলোর প্রস্থও তার কাছাকাছি। তাই আলো ওদের উপর পড়ে

মী-লোরেন্স তত্ত্ব অনুযায়ী বিক্ষেপিত হয়, আর আমরা সে বিক্ষেপণটা দেখি সাদা রঙ হিসাবে।

যে সব জিনিশ আমাদের চোখে সাদা দেখায় সেগুলি যে স্বচ্ছ জিনিশেই গড়া, সেটা বোঝাতে একটা স্বচ্ছ কাচকে ঘষে দেওয়া বা গুঁড়ো করার কথা আমরা আগে আলোচনা করেছি। এর উল্টোটাও হয় — অর্থাৎ অস্বচ্ছ সাদা জিনিশও বদলে স্বচ্ছ করে দেওয়া যায়।

সাদা কাগজের উপর একটু তেল, ঘি বা মাখন লাগলে সেটা যে স্বচ্ছ দেখায় তা বোধহয় সকলেরই জানা আছে। তার কারণটা বোঝা খুব কঠিন নয়। সেলুলোজের যে আঁশ দিয়ে কাগজ তৈরি, তেল বা ঘি জাতীয় জিনিশ তার মধ্যে সহজেই ঢুকে যেতে পারে। আঁশগুলির মধ্যের ফাঁক এইভাবে কোনো তরল পদার্থ দিয়ে ভরিয়ে দিলে আঁশগুলি থেকে আলোর বিক্ষেপণ বা বহু-প্রতিফলন দুটোই অনেক কমে যায় - ফলে কাগজের একদিক থেকে অন্য দিকে যেতে আলো অনেক কম বাধা পায়। কাগজের একদিকে থাকা কোনো জিনিশের আলো যদি কাগজের অন্যদিকে এভাবে পৌঁছোতে পারে তাহলেই তো জিনিশটা অন্যদিক থেকেও দেখা যাবে — তাই কাগজটা বেশ স্বচ্ছই মনে হয়।

সাদা খবরের কাগজ কিছুদিন রেখে দিলে ধীরে ধীরে হলদেটে হয় যায়। কিন্তু খাতা বা বইয়ের কাগজ বহুদিন ধরে সাদাই থাকে। তার কারণ কী?

কাগজ বানানো হয় কাঠ দিয়ে, যার প্রধান উপাদান হলো স্বচ্ছ সেলুলোজ। কাঠের মধ্যে সেলুলোজ ছাড়াও আর একটা কালচে খয়েরি রঙের জিনিশ থাকে, যার নাম লিগনিন। লিগনিনের কাজ আঠার মতোন। সেলুলোজের তন্তুগুলোকে বেঁধে রেখে লিগনিন কাঠকে শক্ত করে — তাই গাছেরা খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে। লিগনিন না থাকলে গাছেরা দেড়-দু মিটারের বেশি উঁচু হয়ে দাঁড়াতে পারতো না। লিগনিনের অণুগুলি বেশ জটিল ধরণের, তার মধ্যে মিশে থাকে নানান রঙিন পদার্থ, যাদের বলে বর্ণবাহক, ইংরিজিতে ক্রোমোফোর। কাগজ বানানোর আগে হাইড্রোজেন পেরক্সাইড ইত্যাদি বিরঞ্জক বা ব্লীচ দিয়ে সে বর্ণবাহকগুলি সমেৎ প্রায় সবটা লিগনিনই সরিয়ে দেওয়া হয়। আঁট বাঁধার জন্য সে কাগজে সেলুলোজের সঙ্গে মেশানো হয় ক্যালশিয়াম কার্বনেট, অর্থাৎ চুনোপাথরের গুঁড়ো, যার রঙও খুব সাদা। বিরঞ্জন করার পদ্ধতিটা বেশ ব্যয়বহুল, তাই সাদা কাগজের দাম বেশি হয়।

কিন্তু খবরের কাগজ তো সাধারণত ব্যবহার করার এক-দু দিন পরেই বাতিল করে দেওয়া হয়। তাছাড়া সকলের কাছে খবর পৌঁছোনোর জন্য খবরের কাগজ শস্তাও হওয়া চাই। তাই খবরের কাগজ ছাপা হয় 'নিউজপ্রিন্ট' নামে যে বিশেষ ধরণের কাগজে তা সাদা করার জন্য কাঠের গুঁড়ো থেকে বর্ণবাহকগুলি সরানো হয় বটে কিন্তু আঁট বাঁধার জন্য প্রয়োজনীয় বাকি লিগনিনটা রেখেই দেওয়া হয়। ব্যয়বহুল বিরঞ্জন পদ্ধতিটা কম

ব্যবহৃত হয় বলে লেখা বা বই-ছাপার কাগজের তুলনায় নিউজপ্রিন্টের দাম কম হয়। কিন্তু যে লিগনিনটুকু ওই কাগজে থেকে যায় তা বাতাসের অক্সিজেনের সংস্পর্শে আর আলোয় থাকা অতিবেগুনি এবং খানিকটা নীল আলোর সহায়তায় ধীরে ধীরে সৃষ্টি করে নতুন বর্ণবাহক। এই বর্ণবাহকগুলি আলোর নীল অংশটা খুব ভালোরকম শুষে নিতে পারে। সাদা আলো পড়লে তখন সে কাগজ থেকে প্রতিফলিত হয় নীল ছাড়া অন্য রঙগুলি সেই রঙগুলির মিশ্রণ আমাদের চোখে মনে হয় হলুদ।

কোনো একদিনের কাগজ যদি কেউ বহুদিন নতুনের মতো করে জমিয়ে রাখতে চায়, তাহলে সেটাকে বাতাসহীন এবং আলো ঢুকতে পারে না এমন একটা বাক্সে বন্ধ করে রাখলেই হবে। আলো-বাতাস না পেলে কাগজটা বহুদিন ধরে সাদাই থাকবে, বাইরে রাখা খবরের কাগজের মতো তার ভিতরের লিগনিন পাল্টে হলুদ হয়ে যাবে না।

ঠোঙা, বাক্স ইত্যাদি বানানোর জন্য যে সব মোটা কাগজ বা পিচবোর্ড লাগে সেগুলি আর বিরঞ্জিত করাই হয়না, তাই ওগুলোর রঙ কাঠের রঙের মতোই খয়েরি থাকে। বিরঞ্জনের খরচটা বেঁচে যায় বলে ওগুলির দামও সাদা কাগজের বা নিউজপ্রিন্টের তুলনায় অনেক কম হয়।

সাদা পোশাক, বিশেষ করে গেঞ্জি ইত্যাদি ভিতরের জামা অনেকদিন ব্যবহার করলে একটু হলদেটে হয়ে যায়, সাবান দিয়ে বারবার ধুলেও তা আর সাদা হতে চায় না। তার কারণ গায়ের ঘামের সঙ্গে বেরোনো কিছু পদার্থ কাপড়ের সেলুলোজের সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে যায়, সেগুলি আর শুধু ধুয়ে বের করা যায় না। ওই পদার্থগুলি সাদা আলোর নীল অংশটা শুষে নেয় বলে সে কাপড় দেখায় হলুদমতো। তাদের সাদা রঙটা ফেরানোর একটা উপায় হলো কাচার পরে একটু নীল রঞ্জকে ছুপিয়ে নেওয়া। শোকানোর পরে সে কাপড়ে নীল রঞ্জকটা থেকে যাওয়ার জন্য সাদা আলোতে নীলের প্রতিফলন একটু বেড়ে যায়। হলদে পদার্থগুলি যতোটা নীল শুষে নিচ্ছিলো, সেই ঘাটতিটা এইভাবে মেটাতে পারলে আবার কাপড়টা সাদা দেখতে লাগে।

আজকাল আবার ব্রাইটেনার বা ঔজ্জ্বলক মেশানো কাপড়কাচার সাবানও কিনতে পাওয়া যায়। ঔজ্জ্বলকগুলি সাধারণত স্টিলবিন বা কুমারিন নামে রঞ্জক দিয়ে তৈরি। এমন সব স্টিলবিন বা কুমারিন অণু আছে যা দেখতে সাদা, অর্থাৎ দৃশ্যমান আলো যা শুষতে পারেনা, কিন্তু অতিবেগুনি আলো খুব ভালোমতোন শুষতে পারে। সেই শুষে নেওয়া অতিবেগুনি আলোটা অণুগুলি থেকে বেরিয়ে আসে নীলচে আভায়। সে নীল আভাটা ঢেকে দেয় কাপড়ের হলদেটে ময়লা ভাব, কাপড়টা দেখায় ধবধবে সাদা। শুধু কাপড়েই নয়, কাগজেও ঔজ্জ্বল্য বাড়ানোর জন্য ওরকম ঔজ্জ্বলক যোগ করা হয়। সেরকম কাপড় বা কাগজ অন্ধকারে নিয়ে তার উপর অতিবেগুনি আলো ফেললে তা থেকে নীলচে আভা বেরোতে দেখা যাবে।

ঘরবাড়ির দেওয়াল সাদা রঙ করার জন্য চুণজল ব্যবহার করা হয়, কিন্তু তাছাড়া বেশির ভাগ জিনিশেই সাদা রঙ করতে গেলে কাজে লাগানো হয় টাইটানিয়াম ডাই-অক্সাইড নামে স্বচ্ছ পদার্থের গুঁড়ো। সেটা জলে বা তেলে মিশিয়ে তৈরি হয় ছবি আঁকার রঙ। খাবার জিনিশ রঙ করার কাজেও ওটা ব্যবহৃত হয়। এমনকি টুথপেস্টও টাইটানিয়াম ডাই-অক্সাইড বা সিলিকন ডাই-অক্সাইড, মানে কাচের গুঁড়ো দিয়ে তৈরি করা হয়, তাই সাধারণত টুথপেস্টের রঙ হয় সাদা।

জানলা দরজা সব করে দিয়ে বুন্ধ
সারাদিন ভাবি বসে, সাদা কেন দুগ্ধ?
দুধে ভাসা মিহি দানা
ছড়ায় আলোর কণা
গুস্টাফ মী কহেন, জেনে হই মুগ্ধ!

১৩ : বুদবুদ ও প্রজাপতির পাখা

শেখর গুহ

সাবান-গোলা জলে একটা নল ডুবিয়ে ফুঁ দিলে ফুটে ওঠে গোল বুদবুদ। হাওয়ায় সেটা ভাসিয়ে দিয়ে তাকে ধরার জন্য ছোটাছুটি খেলা ছোটোবেলায় কে না খেলেছে? যে সাবানজল দিয়ে বুদবুদটা তৈরি, সেটা দেখতে মোটামুটি স্বচ্ছ হলেও বুদবুদের গায়ে কিন্তু দেখা যায় নানান রকম রঙ। কোথা থেকে আসে ওই সব রঙ?

বুদবুদ যেমন বাতাসে ভেসে বেড়ায় তেমনি প্রজাপতিও পাখা মেলে বাতাসে ওড়ে। মনে হতে পারে যে বুদবুদ আর প্রজাপতির মধ্যে মিল শুধু এইটুকুই। তা কিন্তু ঠিক নয় — আরো একটা ব্যাপারে এদের মধ্যে একটা বড়ো মিল রয়েছে। সেটা হলো তাদের রঙ। বুদবুদের গায়ে যে কারণে নানান রঙ দেখা যায়, প্রজাপতির পাখাতে রঙ-বেরঙের বাহার দেখতে পাওয়ার কারণও প্রধানত তাই।

বুদবুদ আর প্রজাপতির পাখা, দুটোই তৈরি খুব স্বচ্ছ এবং সূক্ষ্ম পর্দা দিয়ে। বুদবুদের পর্দাটা জলে গড়া, আর প্রজাপতির পাখায় থাকে স্তরে স্তরে সাজানো কাইটিন নামে একটা স্বচ্ছ পদার্থ। স্বচ্ছ পদার্থ থেকে রঙ আসতে পারে নানা ভাবে। আইজ্যাক নিউটন তাঁর পরীক্ষায় দেখিয়েছিলেন যে সাদা আলোতে মিশে থাকা বিভিন্ন রঙ কাচের মধ্যে দিয়ে যাওয়ার সময়ে বিভিন্ন পরিমাণে বেঁকে যায় বলে প্রিজমের মধ্যে দিয়ে সাদা আলো পাঠালে তা ভেঙে যায় নানা রঙে। লর্ড র‍্যালে বুঝিয়েছিলেন বাতাসে থাকা অক্সিজেন, নাইট্রোজেন ইত্যাদি পুরোপুরি স্বচ্ছ গ্যাসের অণু থেকে বিভিন্ন রঙের আলো বিভিন্ন পরিমাণে ঠিকরানোর জন্য আকাশে নীল রঙ দেখা দেয়। অর্থাৎ আলোর বেঁকে যাওয়া বা প্রতিসরণ, আর ঠিকরানো বা বিক্ষেপণ, এ দুটি প্রক্রিয়া স্বচ্ছ জিনিশেও রঙ সৃষ্টি করতে পারে।

প্রতিসরণ আর বিক্ষেপণ ছাড়াও আলোর আর একটা ধর্ম বিজ্ঞানীরা লক্ষ করেছিলেন। তা হলো আলোর ছড়িয়ে পড়া। মনে করা যাক সব জানলা দরজা বন্ধ অন্ধকার কোনো ঘরের এক দেওয়ালে ঠিক এক সেন্টিমিটার ব্যাসের একটা গোল ফুটো করা হয়েছে আর সূর্যের আলো সরাসরি ওই ফুটোটা দিয়ে ঘরে ঢুকেছে মেঝের সঙ্গে
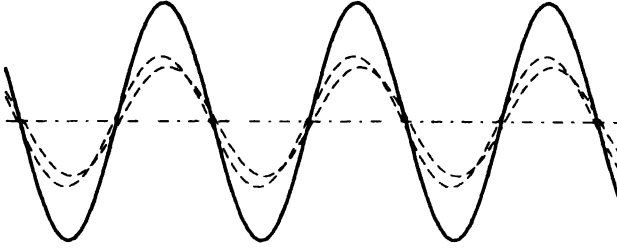
২২ নং ছবি॥ *গঠনমূলক ব্যতিচার। মাঝখানের সোজা দাগটা হচ্ছে কোনো ঢেউ না থাকার অবস্থা। দুটি ড্যাশ-দেওয়া লাইন দুটি ঢেউ। দুটিই যদি একসাথে এসে পড়ে, তাহলে কী হবে, তা দেখানো হয়েছে মোটা টানা দাগ দিয়ে।*

সমান্তরাল ভাবে। উল্টোদিকের দেওয়ালে যেখানে সে আলোটা গিয়ে পড়বে, সেখানে আলোকিত গোল জায়গাটার ব্যাস মাপলে দেখা যাবে সেটা যে শুধু এক সেন্টিমিটারের চেয়ে বড়ো তাই নয়, সে আলোটার সীমানাও খুব একটা স্পষ্ট নয়। তার কারণ এক দেওয়াল থেকে অন্য দেওয়ালে যেতে আলোর ঢেউ খানিকটা ছড়িয়ে পড়ে। বিজ্ঞানের ভাষায় এই ছড়ানোটার নাম হলো অপবর্তন। আরও সহজেই অবশ্য এই ব্যাপারটার একটা ধারণা পাওয়া যায়। দিনের রোদে হাতের একটা আঙুলের ছায়াটা ভালো মতো লক্ষ করলে দেখা যাবে যে আঙুল থেকে ছায়াটার দূরত্ব যদি কেবল কয়েক সেন্টিমিটার হয়, তাহলে ছায়াটা বেশ স্পষ্টই দেখায়, কিন্তু সে দূরত্বটা বাড়িয়ে আধ-মিটার মতো করলে ছায়ার সীমারেখাটা হয়ে যায় আবছা — ঠিক কোথায় ছায়াটা শেষ হচ্ছে তা আর স্পষ্ট থাকে না। তার কারণ আলোর গতিবিধি ঢেউয়ের মতো। আঙুলটা সে ঢেউ আটকে দিলেও আধ-মিটার মতো দূরত্বের পথ চলে সে ঢেউয়ের খানিকটা উপচে ছায়ার ভিতরে চলে আসতে পারে।

আলো যে একটা ঢেউয়ের মতো বেড়ে-কমে এগিয়ে চলে তা ১৮০৩ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজ বিজ্ঞানী টমাস ইয়াং হাতেনাতে প্রমাণ করে দেখিয়েছিলেন। তাঁর প্রথম পরীক্ষাটা ছিলো অতি সরল, কেবল সূর্যের রশ্মি আর একটা শক্ত কাগজ দিয়েই সেটা করে দেখানো যায়। একটি বেশ সরু পেন্সিলের মতো আলোর একটা রশ্মি তিনি প্রথমে দেওয়ালে ফেললেন। তারপরে সে রশ্মিটার মাঝ দিয়ে কাগজটা আড়াআড়িভাবে ধরে রশ্মিটাকে দুভাগে ভাগ করে দেওয়া হলো এমন ভাবে যাতে কাগজটার দুপিঠ বেয়েই আলোটা চলে। সেই দ্বিধাবিভক্ত আলোর রশ্মিটা দেওয়ালে যেখানে এসে পড়লো, সেখানে তখন আলোকিত জায়গাটার গায়ে অনেকগুলি কালো কালো দাগ দেখা গেলো। ইয়াং বোঝালেন যে আলো যে ঢেউয়ের মতো চলে তা ধরে নিলে এই কালো দাগগুলি দেখা
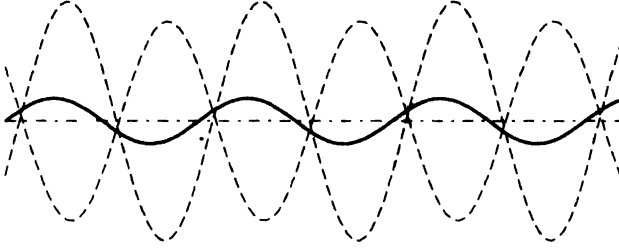
২৩ নং ছবি॥ *বিনাশমূলক ব্যতিচার। দুটি ড্যাশ-দেওয়া ঢেউ মিলে তৈরি হচ্ছে মোটা টানা দাগের ঢেউ।*

যাওয়ার কারণটা সহজে ব্যাখ্যা করা যায়। দুটি ঢেউ যখন এক জায়গায় আসে, তখন একটার যেখানে চূড়ো, সেখানে অন্যটারও চূড়োটা যদি থাকে, তাহলে সেখানে দুটি ঢেউ যোগ হয়ে আলো হবে উজ্জ্বল। এ রকম দুটো ঢেউ, এবং তাদের সম্মিলিত প্রভাব, দেখানো হয়েছে ২২ নম্বর ছবিতে। আর ঢেউ দুটি যদি ২৩ নম্বর ছবির মতো বেতালা হয়, অর্থাৎ যেখানে একটা ঢেউয়ের চূড়ো সেখানে যদি অন্যটার খাদটা এসে মেলে, তাহলে দুটোতে কাটাকাটি হয়ে সেখানে কোনোই আলো থাকবে না, সেখানটা দেখাবে কালো। একাধিক আলোর ঢেউয়ের এভাবে পরস্পরকে প্রভাবিত করার ব্যাপারটাকে বিজ্ঞানীরা বলেন আলোর ব্যতিচার। যে জায়গাটা উজ্জ্বল সেখানটাতে আলোর 'সংপোষী ব্যতিচার' হচ্ছে আর যেখানে কালো দাগ সেখানে 'বিনাশী ব্যতিচার' হচ্ছে বলা হয়। পোশাকি পরিভাষা ব্যবহার করতে ইচ্ছা না করলে আমরা সংপোষী আর বিনাশী ব্যতিচারের জায়গায় বলতে পারি যে সেখানে দুটি আলোর ঢেউ পরস্পরের উপর যথাক্রমে 'গঠনমূলক' আর 'বিনাশমূলক' প্রভাব ফেলছে।

বুদবুদের গায়ে নানান রঙ দেখা যায় আলোর ব্যতিচারের জন্য। প্রজাপতির পাখায় রঙ দেখা যাওয়ার মুখ্য কারণটাও ওই, যদিও সে পাখার রঙে আলোর অপবর্তনও খানিকটা সাহায্য করে। যে স্বচ্ছ জলের পর্দাটা দিয়ে বুদবুদ গড়া, তার উপরে আলো পড়লে পর্দাটার উপরিতল থেকে আলোর খানিকটা প্রতিফলিত হয় --- বাকিটা ঢুকে যায় পর্দার ভিতরে। ভিতরে ঢোকা এই আলোটারও খানিকটা আবার পর্দার অন্য ধারটা থেকে প্রতিফলিত হয়ে বাইরের দিকে ফিরে আসে। ২৪ নম্বর ছবিতে মনে করা যাক AB দাগটা বোঝাচ্ছে একটা জলের পর্দার একটা ধার, আর CD দাগটা বোঝাচ্ছে অন্য ধারটা। P নাম দিয়ে দেখানো তীরচিহ্নটা পর্দার উপরে পড়া একটা আলোর রশ্মি বোঝাচ্ছে, আর Q ও R হলো পর্দার দুটো ধার থেকে P-এর প্রতিফলন। প্রতিফলিত আলোটা যে দেখছে তার চোখে এসে পড়ছে Q এবং R-এর মেশানো আলো।
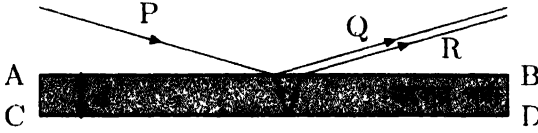
২৪ নং ছবি॥ *জলের পাতলা পর্দায় ব্যতিচার।*

Q এবং R রশ্মিদুটি নিজেদেরকে গঠনমূলকভাবে প্রভাবিত করবে নাকি বিনাশমূলকভাবে, তা নির্ভর করছে পর্দাটা কতোটা মোটা, অর্থাৎ ২৪ নম্বর ছবিতে *d*-এর পরিমাণ কী, তার উপরে। এবং অবশ্যই আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্যের উপরেও।

মনে করা যাক সাধারণ সাদা আলো এসে পড়েছে সূক্ষ্ম একটা পর্দার উপরে। ধরা যাক পর্দাটা এমনই মোটা যে কেবল নীল আলোর যা তরঙ্গদৈর্ঘ্য সেটাই প্রতিফলিত আলোতে বিনাশমূলকভাবে প্রভাবিত হয়। অর্থাৎ পর্দাটার দুটো ধার থেকে প্রতিফলিত রশ্মিগুলি কেবল ওই নীল তরঙ্গদৈর্ঘ্যের হলেই তারা নিজেদের বিনাশমূলকভাবে প্রভাবিত করতে পারে। প্রতিফলিত আলোতে তাহলে নীল আলোটা একেবারেই থাকবে না, এবং নীলের কাছাকাছি তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলোর পরিমাণ হবে খুব কম। প্রতিফলিত আলোতে থাকবে শুধু খানিকটা সবুজ, আর হলদে কমলা লাল। তাদের মিশ্রণে পর্দাটা তখন দেখাবে সোনালি।

শুধু বুদবুদ আর প্রজাপতির পাখাতেই নয় খুব বৃষ্টি হলে যদি রাস্তায় জল দাঁড়িয়ে যায়, তখন তার উপরে ভেসে ওঠে রাস্তায় পড়ে থাকা মটোরগাড়ির পেট্রোল বা ইঞ্জিনের তেল। জলের উপরে সেগুলোও খুব সূক্ষ্ম পর্দার মতোই কাজ করে তাই তাদের গায়েও রঙ দেখা যায় কোনো কোনো তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলোর বিনাশমূলক প্রভাবের জন্য।

জলে ভাসা তেলের গায়ে অথবা জল দিয়ে তৈরি বুদবুদের গায়ে আমরা রঙ দেখি, কিন্তু জানলার কাচ অথবা স্বচ্ছ সেলোফেনের মোড়কের গায়েও তো আলো উপর নিচের দুটো ধার থেকে প্রতিফলিত হয়ে এসে মেশে। তাহলে কাচের গায়ে কিম্বা সেলোফেনে সেরকম রঙ দেখি না কেন? তার কারণ হলো আলোর আর একটা ধর্ম, যার নাম 'সুসঙ্গতি'।

যে কোনো আলোর উৎসেরই একটা নিজস্ব 'সুসঙ্গতি-দৈর্ঘ্য' বা 'সুসঙ্গতি-কাল' আছে। মনে করা যাক ২৫ নম্বর ছবিতে A বিন্দুতে আলোর একটা উৎস রয়েছে, আর সেখান থেকে একটা রশ্মি বের হয়ে B বিন্দুতে এসে পড়েছে। আবার A থেকে আর একটা রশ্মি বেরিয়ে C বিন্দুতে এসে পড়েছে এবং C থেকে প্রতিফলিত হয়ে চলে এসেছে B বিন্দুতে। B বিন্দুতে তাহলে দুটো পথ ধরে আলো এসে একসঙ্গে মিশেছে — একটা এসেছে AB রেখা বরাবর, অন্যটা AC+CB পথ ধরে। মনে
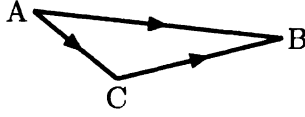
২৫ নং ছবি॥ *সুসঙ্গতির ব্যাখ্যা।*

করা যাক AC+CB দূরত্বের যোগফলটা AB দূরত্বের চেয়ে d পরিমাণ বেশি। অর্থাৎ $(AC + CB) - AB = d$। এই d-এর পরিমাণটা যদি আলোর উৎসের সুসঙ্গতি দৈর্ঘ্যের চেয়ে কম হয়, কেবল তাহলেই AB পথ আর AC+CB ধরে আসা আলোর রশ্মিদুটি গঠনমূলক বা বিনাশমূলক প্রভাব নিয়ে মিশতে পারবে। d দূরত্বটা যদি সুসঙ্গতি দৈর্ঘ্যের চেয়ে বেশি হয়, তাহলে আর তা হবে না। তখন এক একটা রশ্মিতে আলোর যা তেজ, দুটো রশ্মি মিলিয়ে আলোটার মোট তেজ হবে তাদের যোগফল - কিন্তু একটা ঢেউয়ের বাড়া-কমার সঙ্গে অন্য ঢেউটার বাড়া-কমা বেতাল হয়ে মোট ঢেউটা 'বিনাশ' করতে কখনোই পারবে না।

সূর্যের আলো বা বিজলি বাতির আলোর সুসঙ্গতি-দৈর্ঘ্য হলো ১ থেকে ২ মাইক্রোমিটার। বুদবুদের গা-টা বা জলে ভাসা তেল ১ থেকে ২ মাইক্রোমিটারের চেয়ে কম মোটা হয় বলেই তাদের দুধার থেকে আসা আলোর রশ্মিগুলির মধ্যে পথের পার্থক্যটা আলোর উৎসের সুসঙ্গতি-দৈর্ঘ্যের চেয়ে কম হয় --- সেইজন্যেই তারা বিনাশমূলক প্রভাবে কোনো কোনো রঙে প্রতিফলনটা কমিয়ে দিতে পারে, এবং সে কারণে ওই পর্দাগুলিকে রঙিন করে তুলতে পারে। জানলার কাচ অন্তত ১ মিলিমিটার মোটা, এমনকি সাধারণ সেলোফেন বা প্লাস্টিকের মোড়কও অন্তত ৫ বা ১০ মাইক্রোমিটার পুরু। তাই এদের দুধার থেকে প্রতিফলিত আলোর মধ্যে পথের পার্থক্য সুসঙ্গতি-দৈর্ঘ্যের চেয়ে অনেক বেশি, তাই এরা কখনো নিজেদের মধ্যে বিনাশমূলক প্রভাব ঘটাতে পারে না, আর সে জন্য এদের গায়ে আমরা রঙ-বেরঙের বাহারও দেখি না।

লেসার রশ্মির সুসঙ্গতি-দৈর্ঘ্য কিন্তু ১ বা ২ মাইক্রোমিটারের চেয়ে অনেক বেশি। খুব সাধারণ এবং শস্তা লেসারেরও সুসঙ্গতি-দৈর্ঘ্য বেশ কয়েক মিটার বা তার চাইতেও বেশি হতে পারে। সে রকম একটা লেসার থেকে আসা আলো মোটা কাচের জানলায় ফেললে দেখা যাবে যে প্রতিফলিত আলোতে জায়গায় জায়গায় রয়েছে কালো কালো দাগ। কেননা সেই কালো জায়গাগুলোতে জানলাটার দুধার থেকে আসা আলো পরস্পরের উপর বিনাশমূলক প্রভাব ফেলে মিশেছে।

সূর্যের আলো বা বিজলি বাতির আলোর সঙ্গে লেসার রশ্মির এমন পার্থক্য দেখা যায় কেন? তার কারণ, সূর্যের আলো বা বিজলি বাতির আলো আসে আলোর

উৎসটাতে থাকা যে সব পরমাণু থেকে, সেগুলির একটার সঙ্গে অন্যটার প্রায় কোনোই সম্পর্ক নেই। এই রকম এলোপাথাড়ি ভাবে আসা আলোতে নানা তরঙ্গদৈর্ঘ্যের ঢেউ মিশে থাকে। হিসেব করে দেখানো যায় যে আলোর মধ্যে তরঙ্গদৈর্ঘ্যের বিস্তার যতোই বড়ো হবে, আলোর উৎসটার সুসঙ্গতি-দৈর্ঘ্যও হবে ততো কম।

সূর্যের আলোতে তরঙ্গদৈর্ঘ্যের বিস্তার প্রায় ৫০০ ন্যানোমিটার (৩০০ থেকে ৮০০ ন্যানোমিটার অবধি), তাই সে আলোর সুসঙ্গতি দৈর্ঘ্যও খুব ছোটো — ১ থেকে ২ মাইক্রোমিটার মাত্র। লেসার রশ্মি হলো মানুষের বুদ্ধি খাটিয়ে বের করা আলো। যে মাধ্যম থেকে লেসার রশ্মি আসে, তাতে বাইরে থেকে কোনো একটা শক্তি জুগিয়ে তার পরমাণুর ইলেকট্রনগুলিকে উঁচু শক্তির অবস্থায় তুলে দেওয়া হয় -- কিন্তু গাছে তুলে মই কেড়ে নেওয়ার মতো তাদের ওপরের স্তরেই আটকে রাখা হয়, ইচ্ছামতো নিচে নামতে দেওয়া হয় না। উঁচু শক্তির অবস্থায় ক্রমাগত অনেক পরমাণু জমা হলে আচমকা তাদের নিচে নামার বাধাটা সরিয়ে দেওয়া হয়। ফলে এক ধাক্কায় ঝপাস করে সব পরমাণুগুলি উঁচু শক্তি থেকে নিচু শক্তিতে নেমে আসে, আর সে শক্তির তফাতটা বেরিয়ে আসে আলোর রশ্মি রূপে। লেসার মাধ্যমে অজস্র পরমাণু এলোপাথাড়ি না চলে যৌথভাবে সহযোগিতা করে আলোর সৃষ্টি করে। তাই লেসার রশ্মির সুসঙ্গতি-দৈর্ঘ্য হয় বিরাট লম্বা -- এবং সে আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্যের বিস্তারও হয় খুবই ছোটো। সূর্যের আলোর মধ্যে তরঙ্গদৈর্ঘ্যের বিস্তার ৫০০ ন্যানোমিটার, লেসার রশ্মির তরঙ্গদৈর্ঘ্যের বিস্তার সে জায়গায় ১ ন্যানোমিটারের চেয়েও অনেক অনেক ছোটো হতে পারে।

প্রজাপতি নিয়ে এতোক্ষণ প্রায় কিছুই বলা হয়নি। দক্ষিণ আমেরিকার ব্রাজিল ও গায়ানায় মর্ফ নামে এক ধরণের প্রজাপতি পাওয়া যায়। সেগুলি পৃথিবীর সবচেয়ে বড়ো প্রজাপতি বলে গণ্য হয়। তাদের পাখার বিস্তার সাড়ে সাত থেকে কুড়ি সেন্টিমিটার মতো। সে পাখাগুলির ওপর দিকটা অতি সুন্দর উজ্জ্বল নীল আর ধারগুলি ঘন কালো। কালো রঙটা আসে মেলানিন নামে একটা রঞ্জক পদার্থ থেকে। পাখাটার বেশিরভাগ অংশ স্বচ্ছ আঁশ দিয়ে তৈরি, যার নীল রঙটা আসে আলোর অপবর্তন এবং ব্যতিচার থেকে। আঁশগুলিতে রয়েছে খুব ছোট মাপের চৌকো চৌকো খোপ, এবং খোপগুলির ভিতরে রয়েছে আরো সূক্ষ্ম দাগ। পাখায় সাদা আলো পড়লে সেই দাগগুলি থেকে সে আলো ছড়িয়ে যায় নানা দিকে, ও তাদের গঠনমূলক ব্যতিচার ঘটে কেবল ৪২০ ন্যানোমিটার তরঙ্গদৈর্ঘ্যের নীল রঙা আলোতে।

আজকাল কমপিউটারের সঙ্গে তথ্য আদানপ্রদান করার জন্য যেসব 'কমপ্যাক্ট ডিস্ক' বা সিডি ব্যবহার করা হয় সেগুলির গায়ে রামধনুর নানা রঙের খেলা দেখতে পাওয়া যায় আলোর অপবর্তনের জন্যই। সিডিগুলি স্বচ্ছ প্লাস্টিক দিয়ে তৈরি। একটা সিডির যে পিঠটাতে লেবেল সাঁটা থাকে, সে পিঠে অ্যালুমিনিয়ামের একটা স্তর আর তার উপরে রঞ্জক পদার্থের আর একটা স্তর থাকে। জলে ভাসা পেট্রোল বা বুদবুদের গা

থেকে নানা রঙ দেখা যায় যে কারণে, সিডিতেও একটি বা একাধিক স্তর থেকে আলোর সেইরকম গঠনমূক বা বিনাশমূলক ব্যতিচারের জন্যই নানা রঙ দেখা যায়। তার উপরে, সিডিগুলিতে তথ্য লেখা থাকে আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্যের কাছাকাছি মাপের দাগ দিয়ে। সেই দাগগুলি থেকে আলোর অপবর্তন ও ব্যতিচার সৃষ্টি করে রামধনুর মতো নানা রঙ। মর্ফ প্রজাপতির গায়ে যে দাগগুলি থাকে তাদের মধ্যের দূরত্ব মোটামুটি ২১০ ন্যানোমিটার, তাই তাদের থেকে কেবল ৪২০ ন্যানোমিটার তরঙ্গদৈর্ঘ্যটাই গঠনমূলকভাবে প্রভাবিত হয়। সিডিতে দাগগুলি বিভিন্ন দূরত্বে থাকে, তাই সিডিতে নানা রঙ দেখা যায়।

দৈনন্দিন জীবনে কাজে লাগে এমন আর একটা প্রযুক্তির কথা বলে এ আলোচনাটা শেষ করা যাক। আজকাল বৈদ্যুতিন মাধ্যম কোথায় না দেখতে পাওয়া যায়? কম্পিউটার, টেলিভিশন, হাতে-ধরা টেলিফোন ইত্যাদি নানান যন্ত্রেরই রঙিন পর্দা থাকে — যেখানে লেখা, ছবি ইত্যাদি দেখা যায়। সেই লেখা বা ছবিগুলি এবং তাদের রঙ-বেরঙের বাহারও কিন্তু সৃষ্টি করা হয় অতি সূক্ষ্ম পর্দায় আলোর গঠনমূলক ও বিনাশমূলক প্রভাবের সাহায্যে, অর্থাৎ বুদবুদ আর প্রজাপতির পাখা যে ভাবে রঙিন হয় ঠিক সেই উপায়ে। যন্ত্রের এই পর্দাগুলি তরল কেলাস নামে এক জাতীয় রাসায়নিক পদার্থ দিয়ে তৈরি হয়।

বেড়ে-কমে আপন মনে চলছিলো এক ঢেউ
আর একটি তার পিছু পিছু লাগলো যেন ফেউ।
তালে তালে মিললে দুটি
অধিক তেজী হবে জুটি
বেতাল হলেই কাটাকুটি, রইবে না আর কেউ।

১৪ : সোনা রুপো তামার রঙ

শেখর গুহ

ছোটোবেলা থেকে আমাদের শেখানো হয়, চকচক করলেই সোনা হয় না। অর্থাৎ বাইরের চাকচিক্য বা রূপ দেখেই কোনোকিছুর আসল মূল্য কী তা স্থির করা উচিত না। সোনা ছাড়া অন্য যে সব ধাতু দৈনন্দিন জীবনে আমরা দেখি, যেমন রুপো, তামা, লোহা, অ্যালুমিনিয়াম ইত্যাদি, ঘষে মেজে নিলে সেগুলি সবই সত্যি বেশ চকচকে। তাই প্রবচনটি একটু ঘুরিয়েও বলা যায় — শুধু সোনাই চকচক করে তা নয়, অন্য ধাতুও করে। বিভিন্ন ধাতু মিশিয়ে যে সব মিশ্রধাতু বা সংকর তৈরি করা হয় — যেমন পিতল বা কাঁসা — সেগুলোও এমনই চকচকে।

তার মানে, চকচকানিতে ও আয়নার মতো আলো ঠিকরানোর কাজে অনেক ধাতুই বেশ পারদর্শী। এ রকম আরো কিছু কিছু বৈশিষ্ট্যে মোটামুটি সব ধাতুই এক রকম — যেমন এদের সহজে গরম করা যায়, যে কারণে ধাতু দিয়ে রান্নার বাসন বানানো হয়। এরা সহজে বিদ্যুৎ পরিবহন করতে পারে। তাছাড়া অনেক ধাতুকেই পিটিয়ে ধারালো অস্ত্র বা মুদ্রা বানানো যায়। রুপো, অ্যালুমিনিয়াম ইত্যাদি কয়েকটা ধাতুর রঙ মোটামুটি একই রকম, সাদাটে। বর্ণালির মধ্যে যে বেগুনি থেকে লাল অবধি নানান রঙ রয়েছে তার কোনোটার উপরেই এদের কোনো বিশেষ পক্ষপাতিত্ব নেই — সাদা আলোর সব রঙিন উপাদানকেই এরা সমানভাবে প্রতিফলন করে। তাই পালিশ করা হলে এদের কাচের আয়নার মতোই ঝকঝকে সাদাটে দেখায়। কিন্তু কয়েকটা ধাতু বা ধাতু-সংকর, যেমন সোনা, তামা বা পিতল হলো একটু ব্যতিক্রম। এদের গা থেকেও আয়নার মতো আলো ঠিকরে পড়ে বটে, কিন্তু তার উপরে আবার এরা রঙিন। তামার রঙ 'তামাটে', পিতল আর সোনা হলদেটে 'সোনালি'। কেন এককেটা ধাতুর রঙ একেক রকম?

সব ধাতুরই পরমাণুর গঠন এমন যে সাধারণ তাপমাত্রায় সে পরমাণু থেকে একটা বা একাধিক ইলেকট্রন বেশ সহজেই পরমাণুর বাঁধন ছিঁড়ে বেরিয়ে আসতে পারে। মুক্তি পাওয়া এই সব ইলেকট্রনগুলি ছাড়া গরুর মতো ঘুরে বেড়ায় নানান পরমাণুর গায়ে গায়ে, কোনো একটা বিশেষ পরমাণুতে আটকে না থেকে।

মাঠে ছেড়ে দেওয়া গরুর পাল যেমন রাখালের তাড়নায় দল বেঁধে ঘরে ফেরে, তেমনই মুক্ত ইলেকট্রনগুলিও আলোর প্রভাবে ঝাঁক বেঁধে চলে। এই ঝাঁক বাঁধা মুক্ত ইলেকট্রনের দলকে বলা হয় 'প্লাসমা'। আলো ও ইলেকট্রনের প্লাসমা কীভাবে পরস্পরকে প্রভাবিত করে তা হিসাব করার উপায়টা ১৯০০ খ্রিস্টাব্দে বের করেন জার্মানির বিজ্ঞানী পাউল ড্রুডে। তাঁর হিসাব দেখায় যে মুক্ত ইলেকট্রনেরা দৃশ্যমান আলোর প্রতিফলনে খুব পারদর্শী। যে জিনিশেই মুক্ত ইলেকট্রন থাকে সেটাই তাই আয়নার মতো·কাজ করে।

আলো তো বিদ্যুৎ ও চুম্বক-ক্ষেত্রের একটা ঢেউ। সে ঢেউটার তরঙ্গদৈর্ঘ্য যখন ৪০০ থেকে ৭০০ ন্যানোমিটারের মধ্যে পড়ে, তখনই শুধু সেটা আমাদের চোখে সাড়া জাগায় এবং তখন আমরা সে ঢেউটাকে বলি 'আলো'।

দৃশ্যমান আলোরই শুধু নয়, যে কোনো বিদ্যুৎ-চুম্বকীয় ঢেউয়েরই কোন কোন তরঙ্গদৈর্ঘ্যগুলি ইলেকট্রন-প্লাসমায় প্রতিফলিত হয় সেটাও ড্রুডের তত্ত্ব থেকে বের করা যায়। সে তত্ত্ব অনুযায়ী, তরঙ্গদৈর্ঘ্য যদি মোটামুটি ৮০ ন্যানোমিটার থেকে ১৫০ ন্যানোমিটারের চেয়ে বেশি হয় তাহলে সোনা, রুপো, তামা, অ্যালুমিনিয়াম ইত্যাদি ধাতুতে ইলেকট্রন-প্লাসমা সে ঢেউয়ের প্রায় ১০০ শতাংশ প্রতিফলিত করতে পারে। অ্যালুমিনিয়ামের বেলা সত্যি করেই তা দেখা যায়। ৮০ ন্যানোমিটারের চেয়ে বড়ো তরঙ্গদৈর্ঘ্যওয়ালা সব ঢেউই অ্যালুমিনিয়ামের গায়ে প্রায় পুরোপুরি প্রতিফলিত হয় -- তাই ৪০০ ন্যানোমিটার থেকে ৭০০ ন্যানোমিটারের দৃশ্যমান আলোতে অ্যালুমিনিয়াম দেখায় সাদা।

রুপোর বেলা ব্যাপারটা হয় একটু অন্যরকম। দৃশ্যমান সব রঙের আলোই রুপোর গায়ে মোটামুটি সমান ভাবে প্রতিফলিত হয় ঠিকই, এবং সে জন্যই রুপোর রঙ সাদাই দেখায় বটে, কিন্তু ৪০০ ন্যানোমিটারের চেয়ে কম, অর্থাৎ অতিবেগুনি আলোতে পরীক্ষা করলে দেখা যায় যে রুপোতে ড্রুডের প্লাসমাতত্ত্বটা ঠিক খাটছে না। সে তত্ত্ব অনুযায়ী তরঙ্গদৈর্ঘ্য ১৩৮ ন্যানোমিটারের চেয়ে বেশি হলেই রুপোর গা থেকে তার প্রতিফলন হবে শতকরা প্রায় ১০০ ভাগ। কিন্তু কার্যত তা দেখা যায় না। ২০০, ৩০০, ৩৫০ ন্যানোমিটার তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলোতে রুপোর প্রতিফলন ১০০ শতাংশের চেয়ে অনেক কম। ৩১৮ ন্যানোমিটার তরঙ্গদৈর্ঘ্যের অতিবেগুনি আলোতে রুপোর গা থেকে প্রতিফলন একেবারে কমে প্রায় শূন্য হয়ে যায়। তার কারণটা বোঝা যায় এইভাবে — রুপোর পাতে আলো পড়লে শুধু যে মুক্ত ইলেকট্রনগুলিই সাড়া দেয় তাই না, পরমাণুতে বাঁধা 'বদ্ধ' ইলেকট্রনগুলিও সে আলোকে প্রভাবিত করে। সে বদ্ধ ইলেকট্রনের প্রভাব হিসেব করার জন্য দরকার পড়ে কোয়ান্টাম তত্ত্বের। ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে অস্ট্রিয়ার বিজ্ঞানী এরউইন শ্রোয়েডিঙ্গের দেখান পরমাণুতে বদ্ধ ইলেকট্রনের শক্তি কীভাবে কোয়ান্টাম তত্ত্ব অনুযায়ী হিসেব করা যায়। বদ্ধ ইলেকট্রনের শক্তির সে হিসেব থেকে বের করা যায় কোনো

পদার্থে কোন কোন রঙের আলোর অবশোষণ এবং প্রতিফলন কতোটা হবে। সে হিসেব অনুযায়ী রুপোর ক্ষেত্রে বন্ধ ইলেকট্রনের শক্তির স্তরগুলি এমনই যে ৩১৮ ন্যানোমিটার তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলো রুপোর গায়ে পড়লে সেটার প্রতিফলন খুবই কম হওয়া উচিত, আর ঠিক সেটাই দেখা যায় বাস্তবে।

তামার ক্ষেত্রেও ব্যাপারটা হয় সে রকমই। তামার পরমাণুতে বন্ধ ইলেকট্রনের শক্তি শ্রোয়েডিঙ্গেরের তত্ব অনুযায়ী এবং মুক্ত ইলেকট্রনের চালচরিত্র ড্রুডের তত্ব অনুযায়ী হিসাব করে দেখা যায় যে ৫৬০ ন্যানোমিটার (অর্থাৎ সবুজ রঙের) ও তার চেয়ে কম তরঙ্গদৈর্ঘ্যের (অর্থাৎ নীল-বেগুনি রঙের) আলো তামার গা থেকে প্রতিফলিত হয় অপেক্ষাকৃত কম। তামার গা থেকে সবুজ, নীল, বেগুনি এইসব রঙের আলোর প্রতিফলন কম আর সে তুলনায় হলুদ, কমলা আর লালের প্রতিফলন বেশি বলেই তামার গা-টা দেখায় ওরকম লালচে-কমলা।

সেই একই পথ ধরে সোনার রঙ কেন 'সোনালি' তার ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বিজ্ঞানীদের একটু হোঁচট খেতে হলো। শ্রোয়েডিঙ্গেরের পেশ করা কোয়ান্টাম তত্ব দিয়ে সোনার পরমাণুতে বন্ধ ইলেকট্রনের শক্তি হিসেব করে দেখা গেলো সোনার রঙ রুপোর মতোই সাদা হওয়া উচিত। কারণ যে তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলো থেকে শুরু করে ধাতুর গা থেকে আলোর প্রতিফলন কমে আসা উচিত, রুপোর মতোই সোনার বেলাতেও সেটা পড়ছে অতিবেগুনিতে।

বাস্তবক্ষেত্রে তা যে ঠিক নয় সে তো সবাই চোখের সামনেই দেখতে পাই। সোনার রঙ মোটেও রুপোর মতো সাদা নয়। তার কারণটা শেষ পর্যন্ত বের হলো ১৯৭১ সালে। ওই বছর মার্কিন দেশের বের্নহার্ড সেরাফিন (তাঁর জন্ম জার্মানীতে) ও ডেনমার্কের এগেডে খ্রিস্টেনসেন সোনাকে নিয়ে একটা নতুন হিসেব করলেন। সোনার পরমাণুর নিউক্লিয়াসে প্রোট্নের সংখ্যা ৭৯টি। রুপোর ক্ষেত্রে এই সংখ্যাটি ৪৭, আর তামার বেলায় মাত্র ২৯। সোনার নিউক্লিয়াসে এতো বেশি সংখ্যক প্রোটন আছে বলে সোনার পরমাণুতে ইলেকট্রনগুলির গতিবেগ অত্যন্ত দ্রুত। নিউক্লিয়াসের কাছের ইলেকট্রনগুলির গতিবেগ আলোর গতিবেগের প্রায় ৬০ শতাংশ।

জার্মানীর বিজ্ঞানী আলবার্ট আইনস্টাইন ১৯০৫ সালে তাঁর জগদ্বিখ্যাত 'আপেক্ষিকতার তত্বে' দেখান কোনো বস্তুর গতিবেগ যতোই আলোর গতিবেগের কাছাকাছি আসে, সে বস্তুটি ততোই ভারি হতে থাকে। কোয়ান্টাম তত্ব ব্যবহার করে যেভাবে হিসেব করা হয় পরমাণুর মধ্যে ইলেকট্রনের শক্তি কতো বা কোন তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলো তারা শুষে নেবে, সোনার বেলায় সেই হিসেব করতে গেলে সোনার ইলেকট্রনগুলির ভর বেড়ে যাওয়ার ব্যাপারটাও ধরতে হবে। আপেক্ষিকতাবাদ ও কোয়ান্টাম তত্ব দুটোকেই ধরে নিয়ে কীভাবে ইলেকট্রনের শক্তি হিসাব করা যায় সেটা প্রথম দেখান ইংরেজ পদার্থবিদ পল ডিরাক, ১৯৩০ সালে। ডিরাক শুধু হাইড্রোজেনের

২ নং ছক ॥ *সোনা এবং অন্য ধাতুর সংকরের রঙ।*

সোনার পরিমাণ	অন্যান্য ধাতু	মিশ্রণের রঙ
৭৫%	তামা ২৫%	লাল
৭৫%	তামা ২২·২৫%, রুপো ২·৭৫%	গোলাপি
৭৫%	প্ল্যাটিনাম ২৫%	সাদা
৭৫%	লোহা ১৭%, তামা ৮%	ধূসর
৭৫%	রুপো ২৫%	হাল্কা সবুজ
৭৫%	রুপো ২০%, তামা ৫%	সবুজ
৭৫%	লোহা ২৫%	নীল
৮০%	অ্যালুমিনিয়াম ২০%	বেগুনি

ওপরে তাঁর সমীকরণ ব্যবহার করেছিলেন। সোনার মতো বড়ো নিউক্লিয়াসের জন্য হিসেবটা খাতাকলমে কষা খুব সহজ নয়। কম্পিউটার প্রযুক্তির উন্নতির পরেই সে জটিল হিসেবটা করা সম্ভব হলো। তা থেকে খ্রিস্টেনসেন ও সেরাফিন দেখালেন ৫২০ ন্যানোমিটার তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলো সোনার পরমাণুতে থাকা ইলেকট্রনেরা বিশেষ ভালো করে শুষে নিতে পারে। এই অবশোষণের জন্য সোনার গা থেকে বিভিন্ন রঙের আলোর প্রতিফলন হয় বিভিন্ন পরিমাণে। ৫২০ ন্যানোমিটারের চেয়ে কম তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলোর প্রতিফলন হয় বেশ কম, আর তার থেকে বেশি তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলোর প্রতিফলন হয় অনেক বেশি, প্রায় ১০০ শতাংশের কাছাকাছি। তাই সাদা আলো সোনার গায়ে এসে পড়লে বর্ণালির যে অংশটা প্রতিফলিত হয় তার মধ্যে থাকে খানিকটা সবুজ, আর অনেকটা হলুদ কমলা লাল --- যাদের মিশ্রণ আমাদের চোখে আর মনে সাড়া জাগায় ওই সুন্দর হলদেটে 'সোনালি' রঙ হিসেবে।

যে সোনার রঙ নিয়ে এতোক্ষণ আলোচনা করা হলো, ধরেই নিয়েছিলাম যে সেটা খাঁটি সোনা। আজকালকার এই ভেজালের যুগেই শুধু নয়, চিরকালই মানুষ ব্যবহার্য সোনায় খানিকটা খাদ মিশিয়েছে। সাধারণত সে খাদের পরিমাণ এতোই অল্প হয় যে সোনার হলদেটে রঙটাই বজায় থাকে। কিন্তু খাদের পরিমাণ অনেক বাড়ালে পরমাণুগুলিতে ইলেকট্রনের অবস্থান এমন পাল্টে যায় যে কোন কোন রঙের আলোকে তারা শুষে নেবে সেটাও পাল্টাতে থাকে --- অর্থাৎ সেই খাদ মেশানো সোনার রঙও হয় অন্যরকম। সোনার সঙ্গে রুপো মিশিয়ে এ রকম 'সংকর' বা মিশ্রধাতু তৈরি করা

হয়েছে, যার রঙ সোনা বা রুপো কোনোটারই মতো নয়। ২ নম্বর ছকে এ রকম কয়েকটা উদাহরণ দেওয়া হলো।

তামার নিজস্ব রঙ লালচে আর দস্তা হলো নীলচে-সাদা একটা ধাতু। তামার সঙ্গে বিভিন্ন পরিমাণ দস্তা মিশিয়ে তৈরি হয় পিতল এবং কাঁসা, যাদের রঙ তামা ও দস্তার রঙ থেকে একেবারেই আলাদা। মৌলিক উপাদানগুলিতে ইলেকট্রনের যা শক্তিস্তর, মিশ্রণটাতে তা পাল্টে যাওয়ার জন্যই এটা হয়।

কোনোরকম খাদ না মিশিয়েও কিন্তু সোনার রঙ পালটে দেওয়া যায়। ইউরোপে খ্রিস্টীয় দশম ও একাদশ শতক থেকেই রঙিন কাচ বানানোর কারখানা চালু হয়েছিলো। গলানো কাচে সোনা মেশালে যে লাল কাচ পাওয়া যায়, কোবাল্ট মেশালে নীল আর তামার একটা যৌগ মেশালে মেলে সবুজ, তা সে সময় থেকেই জানা ছিলো। ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজ রসায়নবিদ তথা পদার্থবিদ মাইকেল ফ্যারাডে-ই সম্ভবত এ বিষয়ে প্রথম বৈজ্ঞানিক গবেষণাপত্রটি লেখেন। খুব মিহি করে গুঁড়ো করা সোনার দানা জলে বা অন্য তরলে মেশালে দেখা যায় যে সেগুলি থিতিয়ে পড়ে না - জলে গোলা রঙের মতোই সেটা তরলটাতে মিশে থাকে। দানাগুলির ব্যাস আড়াই ন্যানোমিটার থেকে ১০ ন্যানোমিটার পর্যন্ত হলে তাদের রঙটা দেখায় একেবারে টুকটুকে লাল। ব্যাসের মাপটা আরো বাড়ানো হতে থাকলে রঙটাও ক্রমশ পাল্টাতে থাকে, পরপর দেখা যায় ময়ূরপঙ্খী, বেগুনি, নীল, হাল্কা নীল এসব রঙ।

সোনার গুঁড়ো থেকে এইরকম নানা রঙ দেখা যায় কেন? খুব ছোটো ছোটো জিনিশ থেকে কীভাবে আলো ঠিকরোয় তা বুঝিয়েছিলেন ইংরেজ বিজ্ঞানী র‍্যালে। কিন্তু র‍্যালের তত্ত্বটা দিয়ে সোনাগুঁড়োর রঙ নানারকম হয় কেন তা বোঝা যায় না। সে তত্ত্বটা খাটে কেবল স্বচ্ছ পদার্থের বেলা, আর সোনা তো মোটেই স্বচ্ছ নয়, অন্তত আমাদের চোখে সাড়া জাগানো দৃশ্যমান আলোতে। যে সব জিনিশে আলো শুষে যায় সেগুলির খুব ছোটো দানা থেকে আলো ঠিকরোয় কীভাবে তা হিসেব করার উপায়টা জার্মানির পদার্থবিদ গুস্টাফ মী বের করেন ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ। মী-এর তত্ত্ব অনুযায়ী সত্যিই দেখা গেলো যে সোনার দানাগুলি আড়াই থেকে ১০ ন্যানোমিটার হলে তাতে ৫২০ ন্যানোমিটার তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলো তো খুব বেশি রকম শুষে যায়ই, তার সঙ্গে ৪০০ থেকে ৬০০ ন্যানোমিটার তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলোও শুষে যায় মোটামুটি ভালোই। সে তুলনায় লাল রঙের আলোর অবশোষণ হয় খুবই কম। নীল, সবুজ, হলুদ আলো ভালোভাবে শুষে যাচ্ছে আর লাল আলো একেবারে শুষে যাচ্ছে না, তাই দানাগুলি তো অমন লাল দেখাবেই। অন্য মাপের দানাগুলিতেও মী-এর তত্ত্ব প্রয়োগ করে দেখা গেলো যে সেগুলির রঙের ঠিক ঠিক ব্যাখ্যা পাওয়া যাচ্ছে।

এক ন্যানোমিটারের কাছাকাছি মাপের কণাগুলির বিশেষ বিশেষ ধর্ম কী তা বুঝতে এবং তা মানুষের কাজে লাগাতে 'ন্যানোবিজ্ঞান' ও 'ন্যানোপ্রযুক্তি' নামে বিজ্ঞান আর

প্রযুক্তির নতুন শাখাই তৈরি হয়ে গেছে। ফ্যারাডের দেখানো পথ ধরে এগিয়ে আজকাল চিকিৎসায়, বৈদ্যুতিন যন্ত্রে, কাপড়ে, খাদ্যে, গাড়িতে, প্রসাধন সামগ্রীতে এবং আরও কতো না ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হচ্ছে এই বিষয়ে গবেষণা করে শেখা কতো নতুন কৌশল।

রুপো পুরো রুপোলি, তো সোনা কেন সোনালি?
আরে ভাই, তাজ্জব হেঁয়ালি যে শোনালি!
ডুড়ে, শ্রোয়েডিঙ্গের
বোঝান কারণ এর,
ডিরাক, আইনস্টাইন দেন বাকি প্রণালী।

১৫ : মণিমাণিক্যের রঙ

শেখর গুহ

মার্কিন দেশের রাজধানী ওয়াশিংটন ডি-সি শহরে দ্রষ্টব্য জিনিশের অভাব নেই। প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ লোক সেখানে দেখতে আসে পৃথিবীর সবচেয়ে বড়ো পাঠাগার (দি লাইব্রেরি অফ কংগ্রেস), বাতাস ও মহাকাশের জাদুঘর (এয়ার অ্যান্ড স্পেস মিউজিয়াম) ইত্যাদি। তার সঙ্গে আর একটা জিনিশও দেখতে যাওয়া অনেক দর্শনার্থীর অবশ্য-কর্তব্যের মধ্যে পড়ে, তা হলো 'প্রাকৃতিক ইতিহাসের জাদুঘরে' রাখা 'হোপ ডায়মন্ড' নামের একটি গাঢ় নীল হীরে। বেশ বড়োসড়ো একটা লিচুর মাপের এই হীরেটির বিচিত্র ইতিহাস এবং অসাধারণ সৌন্দর্য সকলের মন কেড়ে নেয়। পৃথিবীর আর একটি নামকরা হীরে হলো 'কোহিনুর'। সেটা রাখা আছে লন্ডন শহরে টেমস নদীর ধারে টাওয়ার অফ লন্ডন নামে উঁচু একটা কেল্লায়, বিলেতের রাজকীয় গয়নাগাটির সংগ্রহশালাতে।

হোপ ডায়মন্ড ও কোহিনুর -- দুটোরই উৎস হলো অন্ধ্রপ্রদেশে কোল্লুর অঞ্চলে গোলকোণ্ডা খনি। শুধু হীরেই নয়, চুনি, নীলা, ইত্যাদি নানা রত্নের জোগান আসে ভারত, শ্রীলঙ্কা, আফগানিস্তান, বা বর্মা থেকে। এ ছাড়াও পান্না, পোখরাজ, স্ফটিক, স্যাফায়ার বা কুরুন্দম ইত্যাদি কতো মণিমাণিক্য কতো দেশে পাওয়া যায়।

এই সব নানা রত্নের দীপ্তি যেমন চোখ ধাঁধায়, তেমনই তাদের রঙের বাহার মানুষকে মুগ্ধ করে। চুনির রঙ টুকটুকে লাল, পান্নার রঙ সবুজ, পোখরাজ হাল্কা হলদেটে, আর হীরে তো একেবারে স্বচ্ছ সাদাটে থেকে শুরু করে হলদেটে, লালচে, নীলচে বা ঘন নীল এইসব নানা রঙেরই হতে পারে। কোথা থেকে আসে নানা রত্নে এতো রকম রঙ?

সব রত্নগুলিকেই মোটামুটি দুটি দলে ভাগ করা যায়, 'স্ববর্ণ' আর 'পরবর্ণ'। একটা রত্ন প্রধানত যে উপাদানটা দিয়ে গড়া কেবল তার উপরেই যদি রত্নটার রঙ নির্ভর করে, তাহলে সে রত্নটা পড়ে স্ববর্ণ রত্নের দলে। যেমন, অ্যাজুরাইট, ম্যালাকাইট বা রোডোনাইট নামে কয়েকটি রত্ন। ম্যালাকাইট রত্নটা গড়া তাম্র-কার্বোনেট হাইড্রক্সিল অণু

দিয়ে। সে রত্নটার রঙ সবসময়েই সবুজ, কেননা রত্নটা কেবল একটি উপাদানে গড়া এবং সেই উপাদানটার রঙ সবুজ।

পরবর্ণ রত্নগুলিতে রঙ আসে প্রধান উপাদানটির সঙ্গে মিশে থাকা অল্প-পরিমাণ খাদ থেকে অথবা রত্নটির গঠনে কোনো খুঁত থেকে। খাদ বা খুঁত না থাকলে ঐ রত্নগুলির রঙ হতো পুরো সাদা বা স্বচ্ছ। বিভিন্ন ধরণের খাদ বিভিন্ন পরিমাণে থাকার ফলে পরবর্ণ রত্নগুলিতে দেখা যায় নানা রকম রঙ। পরিচিত রত্নগুলির বেশির ভাগই পড়ে এই পরবর্ণের দলে।

যেমন, হীরে। পুরোপুরি নিখাদ ও নিখুঁত হীরে একেবারেই বর্ণহীন হয়। সেগুলি খুবই দুষ্প্রাপ্য ও দামী, কোহিনুর নামে ঐতিহাসিক হীরেটি হলো তার একটি উদাহরণ। সাধারণত যেসব হীরে গয়নাগাটিতে ব্যবহার করা হয় তাতে থাকে একটা ফিকে হলুদ রঙ। স্ফটিক আর কুরন্দমও হীরের মতোই পরবর্ণ রত্ন।

কাচ, স্ফটিক, হীরে ইত্যাদি পদার্থগুলি স্বচ্ছ। তার মানে, ওগুলির ভিতর দিয়ে যে কোনো রঙের আলোই অবাধে চলে যেতে পারে, কোনো রঙই বিশেষ ভাবে শুষে যায় না। কেন যায় না, তা বুঝতে গেলে কঠিন পদার্থের গঠন নিয়ে একটু আলোচনা করা দরকার।

যে কোনো জিনিশই অণু বা পরমাণু দিয়ে গড়া, আর অণু-পরমাণুগুলি গড়া ইলেকট্রন ও নিউক্লিয়াস দিয়ে। একটা জিনিশের উপর আলো পড়লে সে আলোর সঙ্গে জিনিশটার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ঘটে প্রধানত ওই ইলেকট্রনগুলির মাধ্যমে। পদার্থবিদ্যার একটি প্রধান সূত্র হলো শক্তির সংরক্ষণ সূত্র, অর্থাৎ শক্তির ক্ষয়ব্যয় নেই, শক্তি অবিনশ্বর, তা বাড়েও না, কমেও না। কোনো ইলেকট্রন যদি আলো শুষে নেয়, তবে সেই আলোর শক্তিটা সঞ্চারিত হবে ইলেকট্রনটাতে, ফলে ইলেকট্রনটার শক্তি যাবে বেড়ে।

কিন্তু পরমাণুতে বাঁধা ইলেকট্রনের শক্তি যা ইচ্ছা তাই হতে পারে না। একটা বিচ্ছিন্ন পরমাণুতে ইলেকট্রনের শক্তি কেবল নির্দিষ্ট ধাপে ধাপে বাড়তে পারে। সে ধাপগুলির মাপ হিসেব করা যায় কোয়ান্টাম তত্ত্ব দিয়ে।

বিচ্ছিন্ন পরমাণুগুলি যখন একটার সঙ্গে একটা জুড়ে জুড়ে কঠিন পদার্থ তৈরি করে তখন ইলেকট্রনেরা কী কী শক্তির ধাপে থাকতে পারে সেটাও কোয়ান্টাম তত্ত্ব দিয়ে হিসেব করা যায়। সে হিসেব থেকে দেখা যায় যে কঠিন পদার্থে ইলেকট্রনের শক্তির অবস্থাগুলি এক-একটা বিশেষ মাপের না হয়ে এক-একটা চৌহদ্দির মধ্যে পড়ে। ছবিতে সেটা দেখানো হয় মোটা ফিতে বা পট্টির মতোন করে — পরমাণুর শক্তির মতোন সরু রেখা দিয়ে নয়। (৩২ পৃষ্ঠায়) ৮ নম্বর ছবিতে সে রকম ইলেকট্রনের শক্তির পট্টি দেখানো হয়েছিলো।

অনেক পদার্থতে এই পট্টিগুলোর মধ্যে এক একটা ফাঁক থাকে। সাধারণ তাপমাত্রায় হয় কী, অল্প শক্তির পট্টিটাতে যতো না শক্তি আছে, কোনো না কোনো ইলেকট্রনের

সেই শক্তি থাকে। আর বেশি শক্তির পট্টিটায় যা যা শক্তি, তেমন শক্তিওয়ালা কোনো ইলেকট্রনই প্রায় পদার্থটাতে পাওয়া যায় না। বিজ্ঞানের ভাষায় বলা হয়, নিরুত্তেজিত অবস্থায় অল্প শক্তির পট্টিটা ইলেকট্রনে ভরা আর বেশি শক্তির পট্টিটা খালি। আলো ফেলে, তাপমাত্রা বাড়িয়ে বা অন্য কোনো উপায়ে যথেষ্ট শক্তি জোগালে ভরা পট্টি থেকে ইলেকট্রন ফাঁকা পট্টিটাতে যেতে পারবে। পট্টিগুলির মধ্যে ফাঁকটা এক এক জিনিশের জন্য এক এক মাপের হয়। হীরের বেলায় ফাঁকটার মাপ ৫ · ৪ ইলেকট্রন-ভোল্ট, স্ফটিক আর স্যাফায়ারের জন্য মাপটা যথাক্রমে ৮ · ৪ ও ৯ · ৯ ইলেকট্রন-ভোল্ট।

পদার্থের সঙ্গে আলো শক্তি আদানপ্রদান করে আলোকণার মাধ্যমে। আলোকণার কাজই হলো শক্তি বহন করা, এবং সে শক্তির পরিমাণ নির্ভর করে আলোর রঙের উপর। আলোর রঙ যতো লাল থেকে নীলের দিকে যায়, সে আলোতে থাকা আলোকণার শক্তিও ততোই বাড়তে থাকে। কোন রঙের আলোকণা কী পরিমাণ শক্তি বহন করে তা বের করা যায় প্লাঙ্কের ফর্মুলা থেকে। আলোর ঢেউয়ের তরঙ্গদৈর্ঘ্য যতো ন্যানোমিটার, ১২৪০ সংখ্যাটা তা দিয়ে ভাগ করলে পাওয়া যাবে সে আলোতে থাকা আলোকণার শক্তি কতো ইলেকট্রন-ভোল্ট, তার মাপ। ৫৫০ ন্যানোমিটার তরঙ্গদৈর্ঘ্যের সবুজ আলোতে প্রতিটি আলোকণা বহন করে ১২৪০ ÷ ৫৫০ = ২ · ২৫ ইলেকট্রন-ভোল্ট শক্তি। দৃশ্যমান আলোর পরিধিতে রয়েছে ৪০০ থেকে ৭০০ ন্যানোমিটার তরঙ্গদৈর্ঘ্যের ঢেউ, অর্থাৎ সে আলোতে পাওয়া যায় কেবল ১ · ৮ থেকে ৩ · ১ ইলেকট্রন-ভোল্ট শক্তির আলোকণা।

আবার ফিরে যাওয়া যাক হীরে, স্ফটিক আর স্যাফায়ারের কথায়। এদের উপর সাদা আলো পড়লে কী হবে? হীরের দুই পট্টির মধ্যে শক্তির ব্যবধান ৫ · ৪ ইলেকট্রন-ভোল্টের। তাই হীরের ইলেকট্রনকে উত্তেজিত অবস্থায় তুলতে প্রয়োজন অন্তত ৫ · ৪ ইলেকট্রন-ভোল্ট শক্তি। সাদা আলোতে অতো শক্তিমান আলোকণা একেবারেই নেই বলে সাদা আলোর কোনো অংশই হীরের ইলেকট্রনেরা শুষে নিতে পারে না তাই সাদা আলোর সব রঙই হীরের ভিতর দিয়ে চলে যায় মোটেই না শুষে গিয়ে, এবং তাই নিখুঁত ও নিখাদ হীরে অমন স্বচ্ছ দেখায়। স্ফটিক ও স্যাফায়ারের বেলাতেও ব্যাপারটা একই রকম হয়।

বেশির ভাগ প্রাকৃতিক হীরেই নিখুঁত এবং নিখাদ হয় না। পৃথিবীর গভীর অভ্যন্তরে বিশাল চাপে পরপর কার্বনের পরমাণু জুড়ে জুড়ে তৈরি হয় হীরে। সেই গড়াপেটার সময় হীরেতে কয়েকটা কার্বন পরমাণুর জায়গা ফাঁকা হয়ে থাকতেই পারে। সেরকম খুঁত-ওয়ালা হীরের টুকরোতে ইলেকট্রনের শক্তির অবস্থাগুলিও একটু তো পাল্টে যাবেই। হীরের গঠনে খুঁত থাকলে সে হীরেতে ইলেকট্রন-ভরা পট্টি আর ফাঁকা ইলেকট্রনের পট্টিদুটির মধ্যে শক্তির ব্যবধানটা নিখুঁত হীরের তুলনায় খানিকটা কমে আসে। ৫ · ৪ ইলেকট্রন-ভোল্ট থেকে কমে সেটা যখন ৩ ইলেকট্রন-ভোল্টের কাছাকাছি আসে তখন
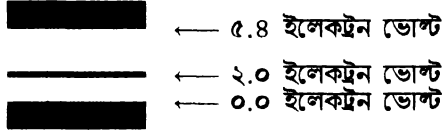
২৬ নং ছবি॥ *দুই পট্টির মাঝে একটি বাড়তি শক্তিস্তর।*

হীরে আর বর্ণহীন থাকে না। সাদা আলো তার উপর পড়লে সে আলো থেকে বেগুনি ও খানিকটা নীল রঙ যায় শুষে। বাকি সব রঙের আলোগুলি মিশে সৃষ্টি করে হলদেটে রঙ।

কার্বন পরমাণুর অনুপস্থিতি ছাড়াও আর এক ধরণের খুঁত হলো হীরেটার গঠনে কোনো বিকৃতি। থিয়েটার হলে বসার চেয়ারগুলি যেমন সারি সারি সমান দূরত্বে সাজানো থাকে, নিখুঁত হীরেতে কার্বন পরমাণুগুলিও থাকে সেইরকম সামঞ্জস্যপূর্ণ। কয়েকটা সারির চেয়ার একদিকে ঠেলে একটু সরিয়ে দিলে সামঞ্জস্যটায় যেমন খানিকটা বিচ্যুতি দেখা যায়, হীরেতেও প্রাকৃতিক কারণে কিছু সারির কার্বন পরমাণু অন্য সারিগুলি থেকে একটু সরে গিয়ে একটা বিচ্যুতি সৃষ্টি করতে পারে। তার ফলেও হীরেতে শক্তির পট্টিগুলির মধ্যে ফাঁকটা আসে কমে। ৫ · ৪ ইলেকট্রন-ভোল্ট থেকে কমে সেটা ২ · ৫ ইলেকট্রন-ভোল্টের কাছাকাছি এলে সে হীরেতে সাদা আলোর নীল-সবুজ অংশগুলো যায় শুষে, সেটা দেখায় লালচে, কমলা বা গোলাপি। দরিয়া-ই-নূর বা আলোক-সমুদ্র নামে একটি অতি প্রাচীন হীরের রঙ ফিকে গোলাপি, সম্ভবত এই বিচ্যুতির কারণে। ১৭৩৯ খ্রিস্টাব্দে নাদির শাহ কোহিনুরের সঙ্গে এই হীরেটাও ভারত থেকে লুঠ করে নিয়ে যায়। এখনো এটি ইরানের জিম্মাতেই রয়েছে।

প্রাকৃতিক হীরেতে কার্বনের জায়গাটা কখনো নাইট্রোজেন, বোরন বা অন্য কোনো পদার্থের পরমাণু দখল করে থাকে। তার ফলে ৫ · ৪ ইলেকট্রন-ভোল্টের চেয়ে কম তফাতেই নতুন একটা পট্টি এসে পড়তে পারে, যেমন দেখানো হয়েছে ২৬ নম্বর ছবিতে। ধরা যাক ইলেকট্রনের নতুন একটা পট্টি এভাবে সৃষ্টি হয়েছে যেটা ২ ইলেকট্রন-ভোল্ট শক্তি থেকে শুরু। তাহলে যে আলোকণার শক্তি ২ ইলেকট্রন-ভোল্ট সেটা সেই হীরের টুকরোতে পড়লে হীরে তাকে শুষে নেবে। যে আলোর আলোকণাতে ২ ইলেকট্রন-ভোল্ট শক্তি থাকে তার তরঙ্গদৈর্ঘ্য হলো ৬২০ ন্যানোমিটারের মতো - অর্থাৎ তার রঙ লাল। সাদা আলো পড়লে লাল রঙটা যদি শুষে যায়, তাহলে হীরের টুকরোটার রঙ দেখাবে নীল হলুদ সবুজ মেশানো সবজে-নীল, যেমন হয় বোরনের খাদ মেশানো হীরেতে। হোপ ডায়মন্ড নামে হীরেটার ঘন নীল রঙের উৎস হলো তাতে মিশে থাকা বোরন ও

নাইট্রোজেন। অতিবেগুনি রশ্মিতে বেশির ভাগ নীল হীরে থেকেই নীল আলো বেরোতে দেখা যায়। কিন্তু হোপ ডায়ামন্ডে নাইট্রোজেন থাকার জন্য ওটাতে অতিবেগুনি রশ্মি ফেললে দেখা যায় লাল আলো বেরোচ্ছে।

প্রকৃতিতে নানা রঙের হীরে তো পাওয়া যায়ই, কৃত্রিমভাবেও হীরেতে রঙ ফুটিয়ে তোলার উপায় বিজ্ঞানীরা বের করেছেন। একটা উপায় হলো তেজস্ক্রিয় রশ্মি দিয়ে হীরেকে বিকিরিত করা। সেই বিকিরিত হীরে হলুদ, খয়েরি, ধূসর, নীল ইত্যাদি নানা রঙের হতে পারে। কিন্তু সেরকম বিকিরিত হীরে অনেক সময় নিজেই তেজস্ক্রিয় হয়ে পড়ে। শরীরের পক্ষে সেটা ক্ষতিকর, তাই গয়নাগাটিতে তা আর ব্যবহার করা যায় না।

হীরে যেমন বর্ণহীন স্বচ্ছ থেকে শুরু করে হলুদ, সবুজ, নীল, লাল এসব নানা রঙের হতে পারে, তেমনই স্যাফায়ারও অতি স্বচ্ছ বর্ণহীন এবং নানা রঙের হয়। রত্ন নিয়ে যাদের কারবার তাদের প্রয়োগে, যে খনিজ পদার্থ থেকে স্যাফায়ার পাওয়া যায় তার নাম কুরন্দম, ইংরিজিতে কোরান্ডাম। কুরন্দম বা স্যাফায়ার হলো অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড নামে একটি রাসায়নিক পদার্থ। কুরন্দমের আকরে নানা ধাতুর মিশ্রণে পাওয়া যায় নানা রঙের রত্ন। কুরন্দমে টাইটেনিয়ামের খাদ মেশানো থাকলে রঙ হয় নীল, বাংলায় ও সংস্কৃত ভাষায় তার নাম নীলা। সেগুলি খুবই দামী হয়। ভ্যানেডিয়াম মেশানো কুরন্দম বেগুনি মতো দেখতে হয়। লোহা মেশানো কুরন্দম হয় হলুদ বা সবুজ। অল্প একটু ক্রোমিয়াম থাকলে কুরন্দম গোলাপি দেখায়। এ সবগুলোকেই ফেলা হয় স্যাফায়ারের দলে।

কুরন্দমে ক্রোমিয়ামের পরিমাণ যদি এতোই বেশি হয় যে রঙটা একেবারে টুকটুকে লাল দেখায় তখন তাকে আর স্যাফায়ারের পর্যায়ে না ফেলে চুনি নামে আলাদা একটি রত্ন বলেই গণ্য করা হয়। বহুকাল ধরে মানুষ এই রত্নটিকে সমাদর করে এসেছে। সংস্কৃতে চুনিকে পদ্মরাগমণি বলা হয়।

কুরন্দম, অর্থাৎ অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইডের পরিবেশে ক্রোমিয়ামের পরমাণু তার তিনটি ইলেকট্রন হারিয়ে ফেলে। ইলেকট্রন হারানো (অথবা বাড়তি ইলেকট্রন জোড়া) পরমাণুকে বলা হয় 'আয়ন'। অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইডে ঘেরা ক্রোমিয়াম আয়নের বাকি ইলেকট্রনগুলির শক্তি কী হবে তা কোয়ান্টাম তত্ত্ব দিয়ে হিসেব করা যায় এবং গবেষণাগারে মেপেও সে হিসেবটা যাচাই করা যায়। তা থেকে দেখা যায় যে সে ইলেকট্রনগুলিকে উত্তেজিত করলে সেগুলির যা যা সম্ভাব্য শক্তি হতে পারে তা দৃশ্যমান আলোর আওতায় দুটি পট্টিতে পড়ে। একটি পট্টির বিস্তার ২ থেকে ২·৪ ইলেকট্রন-ভোল্ট পর্যন্ত এবং অন্যটি পড়ে ২·৫ থেকে ৩ ইলেকট্রন-ভোল্ট শক্তির মধ্যে। প্লাঙ্কের ফর্মুলা অনুযায়ী ১২৪০ সংখ্যাটাকে এই শক্তির মাপগুলি দিয়ে ভাগ দিয়ে সহজেই বের করা যায় যে চুনিতে ক্রোমিয়াম আয়ন ৪০০ থেকে ৪৫০ এবং ৫০০ থেকে ৬২০ ন্যানোমিটার তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলো শুষে নেয়। চুনিতে সাদা আলো পড়লে প্রতিফলিত হয় ৬২০

ন্যানোমিটারের চেয়ে বেশি তরঙ্গদৈর্ঘ্যের, অর্থাৎ লাল রঙের আলো এবং খানিকটা নীলচে সবুজ আলো, যার তরঙ্গদৈর্ঘ্য পড়ে ৪৫০ থেকে ৫০০ ন্যানোমিটারের মধ্যে। তাই চুনি অমন সুন্দর গাঢ় লাল টুকটুকে দেখায়।

১৯৬০ সালে থিয়োডোর মেইমান নামে এক মার্কিন বিজ্ঞানী চুনি পাথরের একটা টুকরোতে আলোর ঝলকানি ফেলে দেখান কীভাবে চুনিতে সবুজ ও নীল আলো শুষে গিয়ে লাল আলোর লেসার রশ্মি সৃষ্টি হয়। মানুষের চোখে দৃশ্যমান আলোতে এটাই প্রথম লেসার। এই বছরটাকে চুনীর জয়জয়কারের বছর বলা যায় হয়তো, কারণ সেই ১৯৬০ সালেই এক অসাধারণ খেলোয়াড়ের অধিনায়কত্বে একটি ফুটবলের দল একই বছরে আই-এফ-এ শিল্ড, কলকাতা লীগ ও ডুরান্ড কাপ জয় করে। বাঙলা তথা ভারতের ক্রীড়ার ইতিহাসে সেই রত্নটিরও নাম ছিলো 'চুনী'।

চুনির লাল রঙ মূলত ক্রোমিয়াম আয়ন থেকে আসে। তার মানে কিন্তু এই নয় যে, যে কোনো স্বচ্ছ জিনিশে ক্রোমিয়াম মেশালেই সেটার রঙ লাল হবে। অর্থাৎ শুধু মেশালটার থেকেই জিনিশের রঙ আসে না; কোন মাধ্যমে ওটা মেশানো হচ্ছে রঙের ব্যাপারে তারও একটা বড়ো ভূমিকা রয়েছে। একই ক্রোমিয়াম ধাতু যদি কুরন্দমে না মিশিয়ে বেরিল বা বেরিলিয়াম অ্যালুমিনিয়াম সিলিকেট নামে একটা স্বচ্ছ পদার্থে মেশানো হয়, তাহলে সেটার রঙ হয় সবুজ, এবং সেটা আমরা চিনি 'পান্না' বা মরকত নামের রত্নটি বলে। জনপ্রিয় শ্যামাসঙ্গীত গায়ক পান্নালাল ভট্টাচার্যের জন্যই হয়তো, পান্নালাল একটি বেশ পরিচিত বাংলা নাম। কিন্তু পান্নার রঙ লাল হয় না, শুধু সবুজই হয়। পান্নালাল নামটিতে লাল বলতে সম্ভবত 'প্রিয়' বোঝানো হয়, অর্থাৎ যে পান্নার মতো প্রিয়, সেই পান্নালাল।

চুনি আর পান্না, এই দুটি রত্নতেই ক্রোমিয়ামের পরমাণুগুলি অ্যালুমিনিয়ামের পরমাণুর জায়গা দখল করে থাকে। চুনিতে ক্রোমিয়ামের পরমাণুর উপর কাছাকাছি থাকা অক্সিজেন পরমাণুর প্রভাব পড়ে, আর পান্নাতে ক্রোমিয়ামের পরমাণুর উপর পড়ে বেরিলিয়াম, সিলিকন আর অক্সিজেনের প্রভাব - ফলে পান্নাতে ইলেকট্রনের শক্তির ধাপগুলি চুনিতে যেমন, পান্নাতে ঠিক তেমন না হয়ে একটু অন্য মাপের হয়।

বেরিল অণুর ধারেকাছে থাকা ক্রোমিয়ামের ইলেকট্রন যে যে শক্তির পট্টিতে উত্তেজিত হতে পারে তাদের বিস্তার ১.৮ থেকে ২.৩ ইলেকট্রন-ভোল্ট এবং ২.৪ থেকে ২.৮ ইলেকট্রন-ভোল্ট পর্যন্ত। অর্থাৎ পান্নাতে ক্রোমিয়াম আয়ন ৪৪০ থেকে ৫১৬ এবং ৫৪০ থেকে ৬৯০ ন্যানোমিটার তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলো শুষে নেয়। নীল আর লাল রঙের আলো পান্নাতে মোটামুটি পুরোই শুষে যায় বলে কেবল হাল্কা সবুজ রঙটা পান্না থেকে প্রতিফলিত হয়, তাই রত্নটা অমন সবুজ দেখায়।

পোখরাজ রত্নটাতে অ্যালুমিনিয়াম ফ্লোরোসিলিকেটের মধ্যে মেশানো থাকে লোহার খাদ। পোখরাজে ইলেকট্রনের উত্তেজিত অবস্থার শক্তি শুরু হয় ২.৭ ইলেকট্রন-ভোল্ট

থেকে যার ফলে পোখরাজে নীল আর বেগুনি আলো শুষে যায়। যা বাকি থাকে তাদের মিশ্রণে পোখরাজের রঙ দেখায় হাল্কা স্বর্ণাভ হলুদ।

নানান রত্নের রঙ যে কেবল মাধ্যমটা কী এবং তাতে কোন ধাতুর খাদ মেশানো থাকে শুধু তার উপরেই নির্ভর করে তা নয়। রঙটা ঠিক কী হবে সেটা মিশে-থাকা খাদটার পরিমাণ কতো তা দিয়েও স্থির হয়। যেমন চুনিতে যদি ক্রোমিয়ামের পরিমাণ বাড়িয়ে দেওয়া যায় তাহলে উত্তেজিত ইলেকট্রনের শক্তি খানিকটা নেমে আসে ফলে চুনির রঙ পাল্টে সবুজ হয়ে যায়। শুধু তাই নয়, লাল চুনির টুকরো গরম করলে পরমাণুগুলি একটু দূরে দূরে সরে যায় - তার ফলে তাদের উত্তেজিত ইলেকট্রনের শক্তিও নেমে আসে খানিকটা, তাতেও চুনির রঙ লাল থেকে পাল্টে সবুজ হয়ে যায়। সেরকম সবুজ কোনো চুনির টুকরোকে যদি যথেষ্ট চাপ দেওয়া যায়, তাহলে পরমাণুগুলি সেই চাপে কাছাকাছি এসে উত্তেজিত ইলেকট্রনের শক্তিকে দেয় বাড়িয়ে - ফলে সবুজ রঙ পাল্টে আবার ফিরে আসতে পারে লালে।

আগেকার দিনে বিবাহিত বাঙালি হিন্দু মেয়েদের মাথায় সিঁদুর পরাটা সামাজিক আচারে প্রায় বাধ্যতামূলক ছিলো। সিঁদুর তৈরি হয় পারা আর গন্ধক মেশানো একটা যৌগ থেকে। যদিও সিঁদুরকে ঠিক রত্ন বলা যায় না, এবং কখনো তা বলা হয়ও না বস্তুবিজ্ঞানের দিক দিয়ে দেখতে গেলে সিঁদুর তৈরি হয় যা দিয়ে, সেই হিঙ্গল অন্য অনেক রত্নের মতোই খনি থেকে পাওয়া একটি রঙিন জিনিশ, এবং অনেক ব্যাপারেই মণিমাণিক্যের সঙ্গে তার মিল আছে। রত্নের রঙ নিয়ে এই আলোচনায় তাই সিঁদুরের রঙ সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলা যাক।

সিঁদুর বা হিঙ্গলের অণু তৈরি হয় পারা ও গন্ধকের পরমাণু জুড়ে। সাধারণ থার্মোমিটারের কাচের ভিতর দিয়েই দেখা যায় যে পারা হলো উজ্জ্বল রুপোলি একটা তরল ধাতু। আর গন্ধক তো হলুদ রঙের গুঁড়ো গুঁড়ো জিনিশ। জিনিশদুটির রঙ আলাদা, কারণ পারার পরমাণুতে ইলেকট্রনের শক্তি যা যা হতে পারে, গন্ধকের পরমাণুতে সম্ভাব্য শক্তির স্তরগুলি তা থেকে আলাদা।

পারা আর গন্ধকের পরমাণু কাছাকাছি এসে যখন হিঙ্গলের অণু তৈরি করে, তখন সে অণুতে ইলেকট্রনের শক্তির অবস্থাগুলি যায় আরো পাল্টে। হিঙ্গলে উত্তেজিত ইলেকট্রনের প্রথম ধাপটা শুরু হয় ২ ইলেকট্রন-ভোল্ট শক্তি থেকে। সাদা আলোতে লাল ছাড়া অন্য সব রঙের আলোর আলোকণারই শক্তি ২ ইলেকট্রন-ভোল্টের চেয়ে বেশি। তাই সাদা আলো হিঙ্গল বা সিঁদুরে পড়লে ওই সব উঁচু শক্তিওয়ালা আলোকণাই অণুতে শুষে গিয়ে ইলেকট্রনকে উত্তেজিত করতে পারে। কেবল লাল আলোর আলোকণা সেটা করতে পারে না - কেননা তাদের শক্তি ২ ইলেকট্রন-ভোল্টের চেয়ে কম ইলেকট্রনকে উত্তেজিত করার পক্ষে সেটা যথেষ্ট নয়। তাই সিঁদুরে সাদা আলো পড়লে

লাল ছাড়া অন্য সব রঙ যায় শুষে — লাল রঙটা শুষে যায় না বলে সিঁদুরকে অমন লাল দেখায়।

হীরে এবং অন্য অনেক মণিমাণিক্যের একটা বৈশিষ্ট্য হলো তাদের ঔজ্জ্বল্য বা দীপ্তি। কাচও স্বচ্ছ আর হীরে এবং স্যাফায়ারও স্বচ্ছ --- তাহলে কাচের চেয়ে হীরে বা স্যাফায়ার অতো বেশি ঝলমলে দেখতে লাগে কেন? তার কারণ হলো কাচের গা থেকে আলো যে পরিমাণে প্রতিফলিত হয়, হীরে বা স্যাফায়ারে হয় তার চেয়ে অনেক বেশি। কাচ, জল ইত্যাদি স্বচ্ছ মাধ্যমে আলো পড়লে তার কতোটা সে মাধ্যমের উপরিতল থেকে প্রতিফলিত হবে তা নির্ভর করে মাধ্যমটার *প্রতিসরাঙ্কের* উপর। প্রতিসরাঙ্ক যতোই বাড়ে, মাধ্যমটার গা থেকে প্রতিফলনের পরিমাণও ততোই বেড়ে যায়। কাচের প্রতিসরাঙ্ক ১·৫-এর মতো, স্যাফায়ারের প্রতিসরাঙ্ক কাচের চেয়ে বেশি, মোটামুটি ১·৮। হীরের প্রতিসরাঙ্ক তার চেয়েও অনেকটা বড়ো, ২·৪ ছাড়িয়ে। জলের উপর আলো পড়লে শতকরা ২ ভাগ মতো প্রতিফলিত হয় -- বাকি ৯৮ ভাগই জলের ভেতরে ঢুকে যায়। কাচের প্রতিসরাঙ্ক জলের চেয়ে বেশি বলে কাচের গায়ে পড়া আলোর শতকরা ৪ ভাগ প্রতিফলিত হয়। স্যাফায়ারের ক্ষেত্রে প্রতিফলিত আলোর পরিমাণ শতকরা ৮ ভাগ মতো, মানে কাচের চেয়ে দু গুণ বেশি। আর হীরের গা থেকে প্রতিফলিত হয় শতকরা ১৭ ভাগ আলো, অর্থাৎ স্যাফায়ারে যতোটা হয় তার দু গুণেরও বেশি। হীরের টুকরো যে তাই অমন উজ্জ্বল দেখতে হবে তাতে আর আশ্চর্য কী?

একটা মাধ্যমের প্রতিসরাঙ্ক কতো সেটা কোন রঙের আলো দিয়ে প্রতিসরাঙ্কটা মাপা হচ্ছে তার উপরেও নির্ভর করে। সাদা আলোতে মিশে রয়েছে লাল কমলা হলুদ সবুজ নীল ইত্যাদি নানা রঙ --- একেক রঙের আলোতে প্রতিসরাঙ্কের পরিমাণ হয় একেক রকম। তরঙ্গদৈর্ঘ্যের হিসেবে লাল আলো আর বেগুনি আলো হলো মানুষের চোখে দেখতে পাওয়া আলোর দুই সীমানা। বেগুনি রঙের আলোতে একটা মাধ্যমের প্রতিসরাঙ্কের থেকে লাল আলোতে সেটার প্রতিসরাঙ্কের তফাতটাকে বলা হয় *'বিচ্ছুরণ'*। একটা মাধ্যমের বিচ্ছুরণ যতো বেশি হয়, তার উপরে তেরচাভাবে সাদা আলো পড়লে সে আলোর লাল-হলুদ-সবুজ-নীল অংশগুলি আলাদাও হয় ততো বেশি। আইজ্যাক নিউটন একটা কাচের প্রিজমে ফেলে সাদা আলোকে নানা রঙে ভাগ করেছিলেন বিচ্ছুরণের সাহায্যে।

সাধারণ কাচের বিচ্ছুরণ হলো ০·০১-এর মতো, স্যাফায়ারের বিচ্ছুরণ তার প্রায় দু গুণ, ০·০১৮। আর হীরের বিচ্ছুরণ তার চেয়েও অনেক বেশি, ০·০৪৪। তাই কাটা

হীরে দিয়ে তৈরি আঙটি দুল ইত্যাদি নানা গয়নায় সাদা আলো পড়লে রামধনুর নানা রঙের অমন চমৎকার ঝলকানি তাতে দেখা যায়।

> চুনি লেসারের পিতা থিয়োডোর মেইমান
> গাই তাঁর গুণগান, নই মোরা বেইমান।
> তীব্র সে লাল আলো
> কতো না রোগ সারালো
> নানা উপকারে আজো লাগে তাঁর সেই দান!

১৬ : গাছের পাতা সবুজ কেন

শেখর গুহ

উদ্ভিদের জগৎ ফুলে ফলে নানা রঙে ভরা হলেও সব মিলিয়ে সেখানে সবুজ রঙটারই প্রাধান্য। মরুভূমি আর রুক্ষ পাহাড়ি অঞ্চল বাদ দিলে ডাঙার বেশির ভাগটাই সবুজ ঘাসে আর সবুজ পাতায় ছাওয়া। কেন প্রকৃতির মধ্যে সবুজ রঙটারই এতো ছড়াছড়ি?

গাছপালা, কীটপতঙ্গ, পশুপাখি বা জলের প্রাণী জীবনধারণের জন্য সব জীবেরই প্রয়োজন শক্তি। উঠতে বসতে চলতে ফিরতে, এমনকি চুপচাপ বসে নিশ্বাস নিতেও শক্তি চাই। এতো শক্তি আসে কোথা থেকে? পৃথিবীতে শক্তির সবচেয়ে বড়ো উৎস হলো সূর্য। সাড়ে চারশো কোটি বছর আগে যখন পৃথিবীর সৃষ্টি হয়েছে তখন থেকে প্রত্যেক দিন নিয়ম করে মহাশূন্যে প্রায় ১৫ কোটি কিলোমিটার পথ পাড়ি দিয়ে সূর্যের বিকিরণ পৃথিবীতে এনে দিচ্ছে শক্তি। আরো কয়েকশো কোটি বছরেও সে শক্তির জোগানে কোনো ভাঁটা পড়বে না। কিন্তু শুধু শক্তিটা এলেই তো আর হলো না, মানুষ বা অন্য জীবজন্তুরা সরাসরি সূর্যের আলোর শক্তিকে নিজেদের জীবনধারণের জন্য কাজে লাগাতে পারে না। তার জন্য তাদের দরকার গাছপালার। গাছের পাতা হলো সূর্য থেকে আসা শক্তিকে প্রাণীদের খাদ্যের অন্তর্গত শক্তিতে পাল্টানোর কারখানা।

গাছের শিকড় মাটি থেকে জল শুষে নিয়ে পৌঁছে দেয় পাতায় পাতায়। ছোট্টো ছোট্টো অজস্র ফুটো দিয়ে বাতাসের কার্বন ডাই-অক্সাইড ঢোকে পাতার ভিতরে। সূর্যের আলো থেকে পাওয়া লাল ও নীল রঙের আলোর শক্তি সে জল ও কার্বন ডাই-অক্সাইডের মধ্যে ঘটায় এক রাসায়নিক বিক্রিয়া। জল হলো অক্সিজেন আর হাইড্রোজেন দিয়ে গড়া এক যৌগ পদার্থ। রাসায়নিক বিক্রিয়াটার ফলে জলের অক্সিজেন ছাড়া পেয়ে বেরিয়ে আসে, আর হাইড্রোজেনটা কার্বন ডাই-অক্সাইডকে পরিণত করে শর্করা জাতীয় খাদ্যে - যার মধ্যে সঞ্চিত থাকে শক্তি। ছাড়া পাওয়া সেই অক্সিজেন দুনিয়ার তাবত প্রাণী নিশ্বাস নেওয়ার কাজে তো লাগায়ই, তার উপর পাতায় তৈরি সেই জটিল শর্করা জাতীয় কার্বোহাইড্রেট-গুলি খেয়ে তারা শক্তিও পায়। প্রাণীদের পরিপাক যন্ত্র যখন খেয়ে ফেলা জটিল কার্বোহাইড্রেট অণুগুলিকে ভেঙে ফেলে ছোটো ছোটো অণুতে, তখন সূর্যের আলো
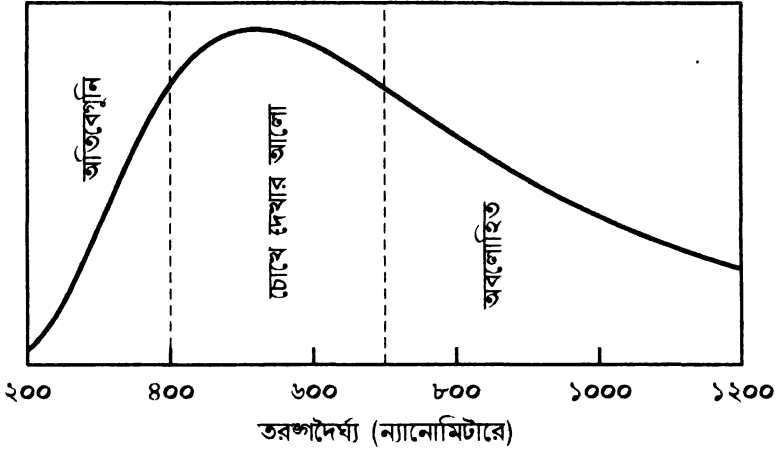
২৭ নং ছবি॥ *সূর্য থেকে কোন তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলো কতোটা আসে।*

থেকে পাওয়া সেই শক্তি বেরিয়ে আসে আর কাজে লাগে তাদের চলাফেরায় ও জীবনধারণে।

আলোর সাহায্যে খাদ্য তৈরি করার প্রক্রিয়াটাকে বিজ্ঞানীরা নাম দিয়েছেন *'সালোক সংশ্লেষণ'*। বহুদূর থেকে আসা সূর্যের আলোর শক্তি যে গাছের পাতায় ধরা পড়ে প্রাণীদের বেঁচে থাকার জন্য অক্সিজেন আর খাবার জুগিয়েছে শুধু তা-ই নয়, বহু কোটি বছর ধরে মাটির নীচে চাপা পড়ে তা পরিবর্তিত হয়েছে কয়লা, পেট্রোল, ডিজেল ইত্যাদি জ্বালানী পদার্থে যাদের কাজে লাগিয়ে মানুষ আজ সারা পৃথিবী দাপিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

গাছের পাতায় থাকে ক্লোরোফিল নামে একটা রাসায়নিক পদার্থ। সূর্যের আলোর নীল (৪০০ ৪৫০ ন্যানোমিটার) আর লাল-হলুদ (৬০০ -৭০০ ন্যানোমিটার) অংশগুলি সেটা বেশ ভালো রকম শুষে নিতে পারে। সূর্যের সাদা আলো গাছের পাতায় পড়লে ক্লোরোফিল শুষে নেয় তার লাল-হলুদ আর নীল-বেগুনি অংশগুলি। পাতাটা থেকে প্রতিফলিত আলোতে তাই লাল হলুদ আর নীল-বেগুনি থাকে না সেগুলো তো পাতার মধ্যে শুষে গেছে। প্রতিফলিত আলোতে থাকে শুধু আলোর সবুজ অংশটুকু, তাই গাছের পাতার রঙ আমরা সবুজই দেখি।

এটুকু বলেই হয়তো এ আলোচনাটা শেষ করে দেওয়া যেতো। কেন গাছের পাতার রঙ সবুজ, এ প্রশ্নের উত্তরে তো বলেই দেওয়া হলো যে সালোক সংশ্লেষণ করার জন্য পাতায় থাকে ক্লোরোফিল। তার রঙ সবুজ, তাই পাতাও সবুজ। কিন্তু সত্যি বলতে

শুধু এটুকুতে কিছুই প্রায় বলা হলো না। সবুজ ক্লোরোফিলের বদলে অন্য কোনো রঙের রাসায়নিক পদার্থ কাজে লাগালো না কেন গাছের পাতারা?

সূর্যের আলোর শক্তিকে বাঁধনে ফেলে পৃথিবীর বুকে প্রাণের উচ্ছাস সৃষ্টি করেছে গাছের পাতার ক্লোরোফিল। কিন্তু ক্লোরোফিলের অণুগুলোর রাসায়নিক গঠন এমনই যে ওগুলো সবুজ রঙের আলোকে শুষে নিতে পারে না। তাই সূর্যের আলোর সবুজ অংশটা সালোক সংশ্লেষণের কাজে লাগে না। এ ব্যাপারটা নেহাত শক্তির অপচয় মনে হতে পারে, কারণ ২৭ নম্বর ছবিতে দেখা যাচ্ছে যে সূর্যের বিকিরণের মধ্যে সবুজের কাছাকাছি রঙের আলোর তেজই সবচেয়ে বেশি। গাছের পাতা যদি সূর্যের আলোর সবটাই খাদ্য এবং অক্সিজেন বানানোর কাজে লাগাতো তাহলে তো পাতার রঙ হতো কালো - কেননা কালো পাতা সূর্যের আলোর কোনো অংশ বাদ না দিয়ে সবটাই নিতো শুষে।

সে রকম হয়নি কেন? আর পুরো কালো না হোক, অন্তত এমন জিনিশ তো কাজে লাগানো যেতো যেগুলি সূর্যের আলোর সবচেয়ে জোরালো অংশটা, অর্থাৎ সবুজের কাছাকাছি রঙের আলোটাকে শুষে নেয়। সাদা আলোতে সে রকম জিনিশের রঙ হতো লাল-নীল মেশানো ময়ূরপঙ্খী — কেননা সবুজ শুষে নিয়ে খালি লাল-নীলটাই প্রতিফলিত হয়ে আসতো তা থেকে। তাহলে গাছের পাতা কালো অথবা ময়ূরপঙ্খী রঙের নয় কেন?

এ রহস্যটা সমাধানের একটা হদিশ দিয়েছেন ইংল্যান্ডের বিজ্ঞানী অ্যান্ড্রু গোল্ডসওয়ার্দি। তাঁর মতে, সূর্যের আলো শুষে নিয়ে সেই আলোর শক্তিকে খাদ্যের রাসায়নিক শক্তিতে রূপান্তরিত করার কাজে, অর্থাৎ সালোক সংশ্লেষণে, ক্লোরোফিলই যে প্রথম এবং একমাত্র উপায় তা নয়। পৃথিবীর ৪৫০ কোটি বছরের লম্বা ইতিহাসে ক্লোরোফিলের উদ্ভব হওয়ার আগেই অন্য একটি জীব সম্ভবত সালোক সংশ্লেষণ কাজে লাগিয়ে পৃথিবীতে প্রাণশক্তি বিস্তারের গোড়াপত্তন করেছিলো। আজও সেটিকে বা সেটির বেশ নিকট আত্মীয়দের দেখতে পাওয়া যায় খুব বেশি নোনা জলের এলাকায়।

সমুদ্রের জলও তো নোনাই, তাতে নুনের পরিমাণ শতকরা চার ভাগের মতো। কিন্তু জল কমে গিয়ে নুনের ভাগ অনেক বেশি (প্রায় ২০%) হয়ে গেছে এ রকম বদ্ধ হ্রদ বা পুকুরও অনেক আছে। সেগুলিতে লাল নীল মেশানো ময়ূরপঙ্খী রঙের একটা আভা দেখতে পাওয়া যায়। সে আভাটা আসে হ্যালোব্যাকটিরিয়াম হ্যালোবিয়াম নামে এক ধরণের জীবাণু থেকে। যে প্রচণ্ড নোনা জলে অন্য কোনো প্রাণীই বাঁচতে পারে না, সেখানেই এই হ্যালোবিয়াম মনের সুখে খেলে বেড়ায়। কিন্তু জলে নুনের পরিমাণ কমে গেলেই তার বিপদ। অন্য প্রাণীদের বাঁচার পক্ষে অনুকূল অপেক্ষাকৃত কম নোনা জলে হ্যালোবিয়ামের মৃত্যু নিশ্চিত। তাই হ্যালোবিয়ামকে অন্য প্রাণীদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নেমে বিবর্তনের মাধ্যমে পাল্টাতে হয়নি — মোটামুটি আদিম রূপেই তা বজায় রেখেছে পৃথিবীর বুকে একেবারে আদি প্রাণীদের নানা বৈশিষ্ট্য।

সালোক সংশ্লেষণের ব্যাপারটা বিশদভাবে বোঝানোর জন্য বিখ্যাত হয়েছেন মেলভিন ক্যালভিন নামে এক মার্কিন বিজ্ঞানী। হ্যালোব্যাকটিরিয়ামের গায়ে যে বিশেষ ধরণের একটা পর্দা থাকে (যা এখনকার অন্য প্রায় কোনো প্রাণীর মধ্যেই পাওয়া যায় না) সেটার মতোন দেখতে পর্দা তিনি তিনশো কোটি বছর পুরোনো পাথরের মধ্যে খুঁজে দেখিয়েছেন। তা থেকে আন্দাজ করা হয় যে হ্যালোব্যাকটিরিয়ামের উদ্ভব হয়েছিলো ৩০০ থেকে ৪০০ কোটি বছর আগে।

ওয়াল্টার স্টোয়েকিনিয়াস নামে আর এক মার্কিন বিজ্ঞানী ১৯৭০-এর দশকে হ্যালোব্যাকটিরিয়াম নিয়ে প্রচুর গবেষণা করেছেন। তাঁর কাজ থেকে জানা গেছে যে এই হ্যালোব্যাকটিরিয়ামের গায়ে থাকে ব্যাকটিরিয়ো-রোডপসিন নামে একটা রঞ্জক পদার্থ, যেটা ক্লোরোফিলের মতোই সালোক সংশ্লেষণ করতে পারে। সূর্যের আলোর সবুজ অংশটা শুষে নিয়ে রোডপসিন সেটাকে রাসায়নিক শক্তিতে রূপান্তরিত করে। পৃথিবীর বুকে, বিশেষ করে জলের নিচে, সূর্যের আলোর নানা রঙের মধ্যে সবুজ রঙটার তেজই সবচেয়ে বেশি জোরালো হয় বলেই নিশ্চয়ই হ্যালোব্যাকটিরিয়ামের গায়ে এই সবুজ আলো-শোষা রোডপসিনের উদ্ভব হয়েছিলো। সবুজ এবং সবুজের কাছাকাছি হলুদ রঙ শুষে নেয় বলে হ্যালোব্যাকটিরিয়ামের গায়ে সাদা আলো পড়লে সে আলোর কেবল লাল কমলা আর নীল বেগুনি অংশগুলোই বেশি প্রতিফলিত হয়, তাই ওগুলোর মিশ্রণে রঙটা দেখায় লাল-নীল মেশানো ময়ূরপঙ্খী।

অফুরন্ত সূর্যের আলো সালোক সংশ্লেষণের মাধ্যমে নিজেদের প্রাণধারণের কাজে লাগিয়ে হ্যালোব্যাকটিরিয়ামের দল বেশ জাঁকিয়ে বসেছিলো। সে যুগের অন্য সব প্রাণীদের ছাপিয়ে সারা পৃথিবীর সমুদ্র ছেয়ে ফেলেছিলো তারা, আর তাদের দাপটে তখনকার সমুদ্র সম্ভবত ময়ূরপঙ্খী রঙের হয়ে গেছিলো।

কিন্তু ব্যাকটিরিয়ো-রোডপসিন যেভাবে সালোক সংশ্লেষণ করে সে পদ্ধতিটা ছিলো খুবই আদিম ও সরল। সেটা সূর্যের আলোকে রাসায়নিক শক্তিতে রূপান্তরিত করতে পারতো বটে, কিন্তু কার্বন ডাই-অক্সাইডকে বেঁধে রাখতে আর তা থেকে শর্করা-জাতীয় জটিল অণু আর খাদ্য তৈরি করতে মোটেই পারতো না। হ্যালোব্যাকটিরিয়াম যখন পৃথিবীর সব সমুদ্র জুড়ে জাঁকিয়ে বেড়াচ্ছে তখন সাগরের জলে অন্য রকম প্রাণীদেরও উদ্ভব ঘটেছে, যারা সালোক সংশ্লেষণ করতে পারতো না। অর্থাৎ প্রাণধারণের শক্তি তারা আকাশের আলো থেকে নয়, অন্য কোনো উৎস থেকে সংগ্রহ করতো। সেই প্রাণীদের শরীর থেকে বেরোতো বিশাল পরিমাণে কার্বন ডাই-অক্সাইড, আর তা জমা হতো বাতাসে। এভাবে সমুদ্রের জল থেকে ক্রমশই কার্বন কমে যেতে থাকলো — ওই অবস্থা চলতে থাকলে পৃথিবীর সব প্রাণীই অবলুপ্ত হয়ে যেতো, কেননা সব প্রাণীর শরীরই কার্বন দিয়ে গড়া। তার উপর বায়ুমণ্ডলে জমা ওই বিশাল পরিমাণ কার্বন ডাই-

অক্সাইড পৃথিবীর তাপমাত্রাও ক্রমশ বাড়িয়ে দিচ্ছিলো। বেশির ভাগ প্রাণীদের বাঁচার পক্ষে সেই উঁচু তাপমাত্রাটা মোটেই সুবিধার নয়।

সৌভাগ্যবশত অবস্থাটা একেবারে খারাপ পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছোয়নি। হ্যালোব্যাকটিরিয়ামের অতো আধিপত্যের তলে তলে, কংসরাজের চোখের আড়ালে গোকুলে কৃষ্ণের মতো বাড়ছিলো আর এক জীবাণু। অ্যান্ড্রু গোল্ডসওয়ার্দির মতে সে জীবাণুটার উদ্ভব হয়েছিলো সম্ভবত জলের তলায় পলিতে। এই জীবাণুটার মধ্যে আজকের গাছ গাছালিতে থাকা ক্লোরোফিলের মতো একটা সবুজ পদার্থ ছিলো। সেই পদার্থটা এক নতুন ধরণের সালোক সংশ্লেষণ করতে সক্ষম হলো — সূর্যের আলোকে শুষে নিয়ে সেই শক্তির সাহায্যে জলের অণু ভেঙে সেটা যেমন আলাদা করে দিলো অক্সিজেন আর হাইড্রোজেনকে, তেমনই হাইড্রোজেনের সঙ্গে কার্বন ডাই-অক্সাইডের মিলন ঘটিয়ে সেটা তৈরি করলো নানান শর্করা, অর্থাৎ খাদ্য। ফলে ধীরে ধীরে বাতাসে অক্সিজেনের পরিমাণ বাড়লো এবং একই সঙ্গে কমলো কার্বন ডাই-অক্সাইডও - সাথে সাথে নেমে এলো পৃথিবীর তাপমাত্রা — কমলো জলের মধ্যে নুনের পরিমাণ, আর তার ফলে ঘনিয়ে এলো হ্যালোব্যাকটিরিয়ামের দুর্দিন। ধীরে ধীরে তারা প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলো, কেবল অতি নোনা কিছু জায়গায় ছাড়া। আর রাজত্ব শুরু হলো ক্লোরোফিল-ভিত্তিক প্রাণের। সে নতুন প্রাণ খালি জীবাণুর মতো ছোটো মাপেরই রইলো না, ক্রমশ তা বড়ো আকার নিলো, আর এক সময়ে জল ছেড়ে ডাঙায় উঠে এসে সারা পৃথিবী ছেয়ে ফেললো লতা-পাতায়। কোটি কোটি বছরব্যাপী এই বিপুল দিগ্বিজয়ের কাছে আমাদের ইতিহাসে জানা আলেকজান্ডার বা তৈমুরলঙের অভিযানের কাহিনী তো একেবারেই নগণ্য।

জলের তলায় যেখানে এই নতুন প্রাণের উদ্ভব হয়েছিলো সেখানে সম্ভবত সবুজ আলো প্রায় ছিলোই না, কেননা জলের উপরের দিকে থাকা হ্যালোব্যাকটিরিয়াম তো সব সবুজ আলোকেই শুষে নিতো। তাই যেটুকু লাল আর নীল আলো জলের নীচে পৌঁছোতো তার সবটাই কাজে লাগাতে ক্লোরোফিলের (বা তার পূর্বসূরীর) বিবর্তন এমনভাবে হলো যে তার মধ্যে লাল আর নীল আলো দুটোই শুষে যেতে পারে। সবুজ আলো তো সেখানে পৌঁছোতো না, তাই ওগুলোতে সবুজ রঙ শুষে নেওয়ার কোনো দরকারও হয়নি। তাই ক্লোরোফিল দিয়ে গড়া গাছের পাতা সবুজ আলো শুষতে পারে না — সাদা আলো এসে পড়লে খালি সবুজটাই প্রতিফলিত হয়। গাছপালায় ভরা পৃথিবীর স্থল অঞ্চল তাই এমন শ্যামল।

এতো কথা বলার পরেও একটা দুটো প্রশ্ন কিন্তু থেকেই যাচ্ছে। প্রথমত ক্লোরোফিল-ওয়ালা সবুজ পাতার উদ্ভব হওয়ার পরে যখন হ্যালোব্যাকটিরিয়ামও আর নেই, তখন কেন গাছের পাতায় এমন জিনিশের বিবর্তন হলো না যা সূর্যের সবুজ আলোকেও কাজে লাগাতে পারে? সেটা হলে গাছের পাতার রঙ হতো কালো, কেননা তখন লাল সবুজ

নীল সব রঙই শুষে খাদ্য তৈরির কাজটা করা যেতো। অ্যান্ড্রু গোল্ডসওয়ার্দির মতে সেটা যে হয়নি তার কারণ, গাছের পাতায় সালোক সংশ্লেষণের সাহায্যে শর্করা জাতীয় খাদ্য তৈরি করাটা বেশ জটিল একটা ব্যাপার। শুধু ক্লোরোফিলই নয়, সে কাজে প্রয়োজন হয় আরো নানান ধরণের সহযোগী অণুর। একবার যখন ক্লোরোফিল এবং অন্য অতোগুলো অণুর সহযোগিতায় একটা পদ্ধতি তৈরি হয়েছে তখন আবার সেটা পাল্টে ক্লোরোফিলের জায়গায় নতুন কোনো অণুকে বসাতে গেলে অন্য জিনিশগুলোকেও অনেক পাল্টাতে হবে — সেটা ঠিকভাবে করতে পারার সম্ভাবনা খুবই কম — তাই ক্লোরোফিলটাই এখনো টিকে রয়েছে। সাগরজলের উপরদিকে আর ডাঙার উপরে সূর্যের আলো এতোই প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় যে সবুজ অংশটার অপচয় হলেও বেশ চলে যাচ্ছে — অপেক্ষাকৃত কম হলেও লাল আর নীল আলো যা পাওয়া যাচ্ছে তাতেই গাছপালাদের বাড়বাড়ন্তের কোনো অসুবিধা হচ্ছে না। তাই ক্লোরোফিল ছাড়া নতুন কোনো রঞ্জক পদার্থের দরকারও হচ্ছে না।

সমুদ্রের গভীরে, আলো যেখানে কম, সেখানকার গাছপালার কিন্তু শুধু লাল আর নীল শুষে কাজ চলে না — তাই তাদের মধ্যে ক্লোরোফিল ছাড়াও সায়ানোব্যাকটিরিয়া, ফুকোজ্যান্থিন ইত্যাদি নানা রঙের রঞ্জক পদার্থের উদ্ভব হয়েছে যাতে আলোর প্রায় সব রঙই তারা শুষে নিতে পারে। সেসব গাছপালা তাই প্রায়ই কালো রঙের হয়।

তাছাড়া আর একটা ব্যাপারও আছে। সালোক সংশ্লেষণ একটা রাসায়নিক প্রক্রিয়া, সেটা ভালোভাবে ঘটার জন্য একটা নির্দিষ্ট তাপমাত্রা দরকার। ১০ থেকে ৩০ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রার বাইরে গেলে সালোক সংশ্লেষণটা ভালো করে হয় না। গাছের পাতা সবুজ না হয়ে যদি কালো হতো তাহলে সূর্যের ওই তেজী সবুজ আলোর শোষণে পাতার তাপমাত্রা ৩০ ডিগ্রি ছাড়িয়ে যেতো, বিশেষত গ্রীষ্মকালে। এই জন্যই শীতের দেশে, বা সূর্যের আলো যেখানে কম সে সব জায়গায় গাছের পাতার রঙ ঘন সবুজ, এমনকি কালচে রঙের পর্যন্ত হয় — কেননা সেখানে পাতার তাপমাত্রাটা অত্যধিক বেড়ে যাওয়ার ভয় কম।

এই অধ্যায়টা শেষ করা যাক গাছের পাতা নিয়ে আর একটা কথা আলোচনা করে। বেশির ভাগ গাছের পাতা ও ঘাস (সেটাও ঘাস-গাছের পাতাই তো বটে!) সবুজ হলেও সব সবুজই এক রকম নয়। কচি দুর্ব্বোঘাস এক রকম নরম সবুজ, আবার পালঙ শাকের পাতা অতি ঘন, প্রায় কালচে সবুজ, আর লাল শাকের পাতা তো একেবারেই লাল। কেন নানা পাতায় এ রকম নানা রঙ হয়?

তার কারণ হলো ক্লোরোফিলও এক রকমের নয় — ক্লোরোফিল এ, বি, সি ইত্যাদি অন্তত তিন রকমের ক্লোরোফিল রয়েছে যাদের রঙ বিভিন্ন রকমের সবুজ। তার উপরে পাতায় থাকে ক্যারোটেনয়েড, যার রঙ গাজরের মতো কমলাটে বা হলুদ। আর থাকে লাল রঙের জ্যানথোসায়ানিন। এই পদার্থগুলি নিজেরা সালোক সংশ্লেষণ করতে

না পারলেও ক্লোরোফিলকে তার কাজে সাহায্য করে। এগুলি বিভিন্ন অনুপাতে থাকার জন্যই পাতায় নানান রকমারি রঙের বাহার দেখা যায়, বিশেষ করে হেমন্তে পাতাঝরার আগে, যখন সবুজ পাতায় ক্লোরোফিলের পরিমাণ কমে আসে।

গাছের পাতা সবুজ হওয়ার কারণটা নয় সোজা
অনেকদিনই চেষ্টা করে হচ্ছিলো তা খোঁজা।
লবণগোলা সাগরজলে
গজিয়েছিলো প্রাচীনকালে
কোন জীবাণু, সেটা দিয়েই হয়তো তা যায় বোঝা।

১৭ : ফুল-ফলের রঙ

শেখর গুহ

বেশির ভাগ ফুলই তাদের সুসম গঠনে, মিষ্টি গন্ধে, কোমল স্পর্শে আর নানান রঙে মানুষকে মুগ্ধ করে। যুগে যুগে ফুলের প্রশস্তি করেছেন নানান দেশের কবিরা। জার্মান ভাষার কবি হাইনরিখ হাইনে তাঁর প্রিয়াকে বলেছেন -- তুমি যেন একটি ফুলের মতো পবিত্র ও সুন্দর। ঝিলের ধারে ফুটে থাকা সোনালি ড্যাফোডিলের ঝাঁক যেমন অভিভূত করেছে ইংরেজ কবি ওয়ার্ডসওয়ার্থকে, তেমনই মাচানের গায়ে জাফরানি ঝিঙে ফুলের সৌন্দর্য আনন্দ দিয়েছে বাঙলার কবি নজরুলকে। কৃত্তিবাস রামায়ণে তাঁর সময়কার ফুলের একটা তালিকা দিয়েছেন

অশোক কাঞ্চন জবা   মল্লিকা মালতী ধবা
পলাশ পাটলী ও বকুল।
গন্ধরাজ আদি যত   কুমুদ কহ্লার শত
স্থলপদ্ম কদম্ব পারুল॥

রক্তোৎপল শতদল   কুমুদ কহ্লার নল
আমলকী পত্র পারিজাত।
শেফালী করবী আর   কনক চম্পক সার
কোকনদ সহস্রেক পাত॥

অতসী অপরাজিতা   যাতে দুর্গা হরষিতা
চামেলী চম্পক নাগেশ্বর।
কাষ্ঠমল্লিকা দুপাটি   জাতি যূথী আর ঝাঁটি
দ্রোণপুষ্প মাধবী গৈর॥

তুলসী তিসি ধাতকী ভূমিচম্পক কেতকী
পদ্মবক কৃষ্ণকলি আর
স্বর্ণযূথিকা বান্ধুলি শীর্ষ শিউলি আঁধুলি
কুরুচী গোলাপ পুষ্পসার॥

কৃত্তিবাসের সময়ে গাঁদা, সূর্যমুখী ইত্যাদি কিছু ফুল বাঙলায় এসে পৌঁছোয়নি যদিও এখন সেগুলি অতি পরিচিত ফুলের মধ্যেই পড়ে। এগুলির সঙ্গে আরো কিছু ফুলের নাম যোগ করে যদি বাঙলার ফুলের ও তাদের রঙের একটা তালিকা বানানো যায়, তাহলে দেখা যাবে যে ধবধবে সাদা, আর টকটকে লাল থেকে গাঢ় নীল সব রকম রঙেরই ফুল হয়, কেবলমাত্র সবুজটা ছাড়া। একেবারে কুচকুচে কালো ফুল কি হয়? "ব্ল্যাক টিউলিপ" নামে একটা কালচে দেখতে ফুল ইউরোপে আমেরিকায় পাওয়া যায় বটে, কাছ থেকে দেখলে বোঝা যায় যে ওটা ঠিক কালো নয়, ওটার রঙ গাঢ় বেগুনি। হলুদ রঙের প্যানসি ফুলের গায়ে বেশ ঘন কালো দাগ থাকে, আর সূর্যমুখী ফুলের মাঝখানটাও বেশ কালো হয়। রবীন্দ্রনাথ গ্রামের এক কালো মেয়েকে কৃষ্ণকলি বলেছেন, কিন্তু অভিধান অনুযায়ী কৃষ্ণকলি হলো সন্ধ্যামালতী, অর্থাৎ তার রঙ সাদা বা লালচে। অবশ্য আক্ষরিক অর্থে বলা যায় কৃষ্ণ-কলি মানে হলো কালো-কুঁড়ি।

ফুলেদের এ রকম বিচিত্র রঙ হওয়ার কারণ কী?

৩ নং ছক॥ *নানা ফুলের রঙ।*

সাদা	টগর, মল্লিকা / বেলফুল, বকুল, পাটলী / পারুল, গন্ধরাজ, কহ্লার / শ্বেতপদ্ম, স্থলপদ্ম, শেফালী / শিউলি (কমলা বোঁটা), চামেলী, নাগেশ্বর, কামিনী, কাশ, দোলনচাঁপা, কুমুদ / পদ্ম, যূথী / জুঁই, আকন্দ, শাপলা, শিরীষ
লাল	অশোক, পলাশ, রক্তোৎপল / লালপদ্ম, গোলাপ, করবী, শিমুল, কৃষ্ণচূড়া, হাসনুহানা
গোলাপি	গোলাপ, নয়নতারা, কুমুদ / পদ্ম, জারুল
হলুদ	কদম্ব, নল, চম্পক / চাঁপা, অতসী, কাষ্ঠমল্লিকা, ধুতরো, স্বর্ণযূথিকা, গাঁদা, সূর্যমুখী
নীল	অপরাজিতা, নীলমণিলতা
বেগুনি	কাঞ্চন

শুধু গাছের ফুল নয়, গাছের ফল বা তরিতরকারিও রঙের বৈচিত্র্যে কিছু কম যায় না — একবার বাজারে ঢুকলেই তা বোঝা যায়। যদিও এদের নিয়ে কবিত্ব করা হয় অনেক কম — সম্ভবত তার কারণ হলো, ফল তরিতরকারি আমাদের খাদ্য, অর্থাৎ জৈবিক প্রয়োজনের সঙ্গে জড়িত। কিন্তু এরাই বা এতো রকম রঙে ভরা হয় কেন?

ফুলের রঙ নানা রকমের হওয়ার প্রধান কারণ হলো গাছপালার বংশবিস্তারের চেষ্টা। মানুষ, পশু, পাখি, কীট-পতঙ্গের মতো গাছেরও প্রাণ আছে। প্রাণের অন্যতম লক্ষণ হলো, সন্তানসন্ততির মাধ্যমে বংশবিস্তার করে তাদের নিজেদের প্রজাতির অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখা। ফুলের পরাগরেণুতে লুকিয়ে থাকে তাদের নতুন জীবনের সম্ভাবনা। কিন্তু মাটিতে শিকড় গেড়ে থাকা গাছেরা তো বাতাসে একটু-আধটু দোল খাওয়া বা অতি ধীরে বেড়ে ওঠা ছাড়া বিশেষ নড়াচড়া করতে পারে না তাই তারা পশুপাখি পোকাদের সাহায্য নেয় ফুল থেকে ফুলে পরাগরেণু ছড়িয়ে দিতে অথবা দূরের মাটিতে ফলের বীজ বপন করতে। ফুলের রঙ সবুজ হলে তো গাছের পাতার ভিড়ে তারা হারিয়ে যাবে — মৌমাছি, প্রজাপতি বা পাখিরা কী করে বুঝবে গাছের ঠিক কোন জায়গায় তারা এসে বসলে গাছের বংশবিস্তারের সুবিধা হবে? তাই রঙিন ফুলগুলি হলো নিশানার মতো। রবীন্দ্রনাথের লেখা একটি কবিতা আছে,

ফুলগুলি যেন কথা
পাতাগুলি যেন চারিদিকে তার
পুঞ্জিত নীরবতা।

এই বর্ণনাটা নেহাত ভুল নয়। নানান রঙের মাধ্যমে ফুলেরা যেন নিজের ভাষায় মৌমাছি-ভ্রমরদের ডেকে বলছে, "এই এখানে এসো, এখানেই আছে তোমাদের প্রিয় মধু!"

জৈব প্রকৃতির অনেকটাই চলে ব্যবসা জগতের কঠোর লেন-দেনের নিয়মে। প্রাণীরা যেমন খাদ্যের জন্য উদ্ভিদজগতের উপর নির্ভর করে, তেমনই বংশবিস্তারের জন্য গাছপালারা নির্ভর করে প্রাণীদের উপর। কিন্তু এমনি এমনি সে সব প্রাণীরা তো আর উদ্ভিদদের সাহায্য করতে যাবে না। তাই বংশবিস্তারের মূল্য হিসেবে গাছেদের তৈরি করতে হয়েছে মিষ্টি মধু বা স্বাদভরা ফল প্রাণীরা যা খেতে চায়।

ফুল, ফল, তরিতরকারির সবুজ রঙ আসে প্রধানত ক্লোরোফিল থেকে, নীল, ময়ূরপঙ্খী আর লাল রঙ আসে অ্যানথোসায়ানিন থেকে আর হলুদ ও কমলা রঙ আসে ক্যারোটেনয়েড থেকে। যেমন, গাজরের রঙ লালচে কমলা হওয়ার কারণ হলো ক্যারোটিন নামে একটি ক্যারোটেনয়েড। টমেটোর লাল টুকটুকে রঙ আসে লাইকোপিন নামে আর একটি ক্যারোটেনয়েড থেকে। লাল মুলো, আঙুর, লাল পেঁয়াজ ইত্যাদির লাল রঙ হয় অ্যানথোসায়ানিনের জন্য। গোলাপ গাছে এবং বেগুনেও অ্যানথোসায়ানিন

থাকে প্রচুর। যে সব গাছে অ্যানথোসায়ানিন থাকে না, তাদের ফুলে ফলেও অনেক সময়ে লাল রঙ এনে দেয় বিটালাইন নামে আর একটি রঞ্জক পদার্থ। স্যালাড বা ভেজিটেবিল চপে যে গাঢ় নীল বীট খাওয়া হয়, তার রঙটা আসে বিটানিন নামে একটি বিটালাইন থেকে।

গ্রিক ভাষায় অ্যানথস মানে ফুল, আর কিয়ানিয়োস মানে হলো লাল-নীল মেশানো ময়ূরপঙ্খী রঙ। এই দুটি শব্দ মিশিয়ে তৈরি হয়েছে অ্যানথোসায়ানিন শব্দটি অর্থাৎ যার মানে, 'ফুলকে যা লাল-নীল রঙে ভরে'। ক্লোরোফিল সাদা আলোর লাল নীল অংশগুলি শুষে নেয় ও শুধু সবুজ অংশটাকে প্রতিফলিত করে। অ্যানথোসায়ানিনে হয় ঠিক তার উল্টোটা সাদা আলো তাতে পড়লে শুধু সবুজ হলুদ অংশটাই শুষে যায়, প্রতিফলিত হয় লাল ও নীল অংশগুলি। সূর্যের আলোর অতিবেগুনি রশ্মিতে, অথবা খরা বা খুব ঠান্ডায় গাছপালা এবং প্রাণীদের শরীরে বেশ ক্ষতিকর ফ্রি-র‍্যাডিকাল নামে অত্যন্ত তীব্র প্রক্রিয়াশীল পদার্থের সৃষ্টি হয়। অ্যানথোসায়ানিন এবং ক্যারোটেনয়েড একটা রাসায়নিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে ফ্রি-র‍্যাডিকালগুলিকে কমিয়ে দিয়ে গাছেদের বাঁচিয়ে রাখতে সাহায্য করে। তার উপরে অ্যানথোসায়ানিন সরাসরি সূর্যের আলোর অতিবেগুনি রশ্মি শুষে নিয়ে গাছের কোষে ডি-এন-এর জখম হওয়া রুখতে পারে। পরীক্ষায় দেখা গেছে, আলোতে অতিবেগুনি রশ্মির পরিমাণ বাড়লে গাছের ভিতরে অ্যানথোসায়ানিন তৈরি হওয়ার হারও বেড়ে যায়। সে অ্যানথোসায়ানিন শুধু ফুলের নয়, গাছপালা মানুষ পশু পাখি সকলেরই স্বাস্থ্য বজায় রাখতে সাহায্য করে।

কেবলমাত্র এক ধরণের অ্যানথোসায়ানিন রয়েছে এ রকম উদ্ভিদ খুবই কম দেখা যায়। বেশির ভাগ গাছেই নানা ধরণের অ্যানথোসায়ানিন, এবং তার সঙ্গে অন্য দুই-একটি রঞ্জক পদার্থের মিশ্রণে নানান রঙ তৈরি হয়। ফুল বা ফলের রঙ কী হবে, অর্থাৎ তাদের গায়ে রঞ্জক পদার্থগুলি কী অনুপাতে থাকবে, সেটা নির্ভর করে কোন পরিস্থিতিকে সে গাছটির বিবর্তন ঘটেছে তার উপরে। সব সময়ে যে ফুলফলের রঙ কেবল প্রাকৃতিক বিবর্তনের জন্যই হয়, তা নয়। মনে করা হয়, টমেটোর লাল টুকটুকে রঙ মানুষই বেছে বেছে তৈরি করেছে, যেমন বিভিন্ন রঙের কলম থেকে নানা রঙের গোলাপের চাষ করা হয়।

কিছু কিছু তরকারি কাঁচা হোক কি পাকা হোক সব সময়েই সবুজ থাকে --- যেমন কড়াইশুঁটি, সীম, বরবটি, ঢ্যাঁড়স। এদের ভিতরের বীজ অন্য প্রাণীদের মাধ্যমে ছড়ায় না --- সবজিগুলি নিজেরাই ফেটে গিয়ে বীজগুলি দূরে ছড়িয়ে দিতে পারে। তাই এগুলির

সবুজ ছাড়া অন্য কোনো রঙের হওয়ার প্রয়োজন নেই। অন্য প্রাণীদের আকর্ষণ করার জন্য এগুলির নানান বিচিত্র রঙের না হলেও চলে।

বাজারেতে কেউ কারো নয় অপর কিম্বা আপন
দাঁওয়ের খোঁজেই হয় সেখানে সারাটা দিন যাপন।
তেমনি ভ্রমর শাখে শাখে
গুনগুনিয়ে মধু চাখে —
ফুলে এতো রঙের বাহার তার তরে বিজ্ঞাপন!

১৮ : বাঁচার জন্য রঙ

পলাশ বরন পাল

পরশুরামের "জয়হরির জেব্রা" বলে একটা গল্প আছে। জয়হরি হাজরা নামে একজন লোক একটি চিড়িয়াখানা করেছিলো, তাই নিয়ে। গল্পের মধ্যে সেই চিড়িয়াখানার বর্ণনা এই রকম :

> তিনটে নীল রঙের ভেড়া চরে বেড়াচ্ছে। একটা সবুজ মেনী বেরালের কাছে চারটে বেগনী বাচ্চা লাফালাফি করছে। একটা অদ্ভুত জানোয়ার ঘাস খাচ্ছে, গায়ের রঙ হলদে, তার উপর ঘোর ব্রাউন রঙের ফোঁটা। বেতসী প্রথমে ভেবেছিল চিতা বাঘ, কিন্তু দাড়ি আর শিং দেখে বুঝল জন্তুটা আসলে ছাগল। একটু দূরে একটা ডোবার কাছে গোটা কতক ময়ূরকণ্ঠী রঙের রাজহাঁস প্যাঁক প্যাঁক করছে। বাড়ির ছাত থেকে হঠাৎ এক ঝাঁক লাল নারঙ্গী হলদে সবুজ নীল বেগনী রঙের পায়রা উড়ে চক্কর দিতে লাগল, যেন কেউ রামধনু কুচি কুচি করে আকাশে ছড়িয়ে দিয়েছে।

আজব চিড়িয়াখানা, বলা বাহুল্য। আজব কেন, সে প্রশ্নের উত্তর দেওয়াও খুব সহজ — এই সব জন্তুর এ রকম রঙ হয় না, জয়হরি হাজরার শখই ছিলো জীবন্ত জন্তুর গায়ে রঙ ধরানো। এর পরের প্রশ্ন, জয়হরি হাজরাকে বাদ দেওয়া যাক, কেন এ রকম রঙ প্রকৃতির হাতেই হয়নি?

গাছের পাতার রঙ নির্ধারিত হয় সূর্যরশ্মি থেকে সালোক সংশ্লেষণের রীতিপ্রকৃতি দিয়ে। প্রাণীরা তো সালোক সংশ্লেষ করে না! তাহলে তাদের কার গায়ে কী রকম রঙ হবে, তা নির্ধারিত হয় কীভাবে? আনতাবড়ি যে কোনো রকম রঙ হতে পারে কি? পারে না নিশ্চয়ই, তাই যদি হতো তাহলে তো জয়হরি হাজরার সৃষ্টিকর্মে আমাদের অবাক লাগতো না!

জীবজগৎকে আমরা যে অবস্থায় দেখছি, বরাবরই প্রাণী ও উদ্ভিদেরা সেই অবস্থায় ছিলো না। পৃথিবীর ইতিহাসের সঙ্গে সঙ্গে তাদের বিবর্তন হয়েছে। কথাটা টুক

করে বলে ফেললাম বটে, কিন্তু কথাটা খুব সহজ নয়, এবং মানবসভ্যতার ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে দেখলে এ চেতনার বয়সও খুবই সামান্য। যেটা অনেক দিক আগে থেকেই জানা ছিলো, তা হলো, প্রাণীজগতে বিস্ময়কর সাদৃশ্য আছে বিভিন্ন সদস্যের মধ্যে। ঘোড়া গাধা আর জেব্রার মধ্যে যে দারুন মিল, তা বলবার জন্য বিশেষজ্ঞ হতে হয় না। কুকুর শেয়াল নেকড়ে হায়না – এরাও অনেকটা এক রকম। বাঁদর শিম্পাঞ্জি গরিলার মধ্যে সাদৃশ্য চোখে পড়ার মতো, এবং এদের সঙ্গে মানুষের যে বেশ অনেকটা মিল আছে, সে কথাও অনস্বীকার্য। তাহলে প্রশ্ন উঠতে পারে, এদের মধ্যে কি ঐতিহাসিক সম্পর্ক ছিলো কিছু?

এই প্রশ্ন নিয়ে বিস্তর আলোচনা হয়েছিলো খ্রিস্টীয় ক্যালেন্ডারের আঠেরো এবং উনিশ শতকে। সাদৃশ্যের কারণ কী, এবং সাদৃশ্যের মধ্যে খানিকটা খানিকটা করে যে পার্থক্য আছে, তারই বা কারণ কী এই হচ্ছে প্রশ্ন। নানা জনে নানা মত দিয়েছিলেন, তার বিস্তারিত ইতিহাসের মধ্যে যাওয়ার প্রয়োজন নেই আমাদের। শেষ পর্যন্ত যে মতটা সাক্ষ্যপ্রমাণ সহযোগে গৃহীত হলো, তার প্রবক্তা চার্ল্‌স্ ডারউইন, তাঁর বক্তব্যটাই এখানে আমাদের দরকার।

ডারউইন বলেছিলেন, জীবজগতে বিবর্তন হচ্ছে ঠিকই, এবং সেই বিবর্তনের মূল চালিকাশক্তি হলো বাঁচার জন্য সংগ্রাম। সেই সংগ্রামে যারা হেরে যাবে, তারা ক্রমশ বিরল হয়ে যাবে, হয়তো শেষ পর্যন্ত অবলুপ্ত হয়ে যাবে। নানা রকমের প্রাণী এ ভাবে অবলুপ্ত হয়ে গেছে পৃথিবীর ইতিহাসে, ভবিষ্যতেও আরো অনেক প্রাণী হবে। আর সংগ্রামে যারা জিতবে, তারাই টিকবে। এর সঙ্গে প্রাণীদের গায়ের রঙেব কী সম্পর্ক, সেটা বোঝবার জন্য তাহলে জানতে হবে, সংগ্রামটা কীসের, তাতে হারজিতই বা কী করে হয়।

আমরা জানি, একই রকমের প্রাণীর প্রত্যেকটি সদস্যের গডন ঠিক এক রকম হয় না। মানুষের কথা ভাবলেই এ কথা বোঝা সবচেয়ে সহজ। অবশ্যই কেউ পুরুষ কেউ নারী, কেউ বাচ্চা কেউ বুড়ো, এ ধরনের তফাত তো আছেই। কিন্তু সে কথা বলা হচ্ছে না। ঠিক একই বয়সের সব পুরুষ বা সব নারীকে যদি দেখি, তাদের মধ্যেও তফাত থাকে। কেউ লম্বা কেউ বেঁটে, কেউ রোগা কেউ মোটা, গায়ের চামড়ার রঙ কারুর হালকা কারুর গাঢ়, কারুর গায়ে লোম বেশি কারুর কম, এই রকম সব তফাত।

ডারউইন বললেন, এই তফাতের জন্য কারুর পক্ষে বেঁচে থাকা বেশি কষ্টকর হয় কিনা, সেইটাই হচ্ছে আসল প্রশ্ন। সেই নিয়েই সংগ্রাম। যেমন ধরা যাক, একটা জায়গায় তৃণভোজী প্রাণী আছে কয়েক রকমের। তাদের মধ্যে এক রকমের প্রাণীরা একটু ধীর প্রকৃতির, অন্যরা বেশ চটপটে। মাটির ঘাস, ছোটো ছোটো গাছপালায় চটপটেরাই সুবিধে পায়, কারণ মাটিতে কোথাও কোনো উদ্ভিদ দেখতে পেলে এরা তাড়াতাড়ি গিয়ে সেগুলোকে খেতে পারে। ধীর প্রাণীগুলোর উপায় কী হবে তাহলে? তারা দেখে, গাছের

একটু উঁচু ডালে যে সব পাতা, সেগুলোর দিকে চটপটেদের তেমন দৃষ্টি নেই, ফলে সেইগুলোই হয়ে দাঁড়ায় তাদের বাঁচবার অবলম্বন। তাহলে এই প্রাণীদের দলে যারা একটু বেশি লম্বা তাদেরই সুবিধে হলো, তারা সহজে উঁচু ডালের পাতা সংগ্রহ করে খেতে পারলো। লম্বারা তাই বাঁচার সংগ্রামে জিতে যেতে লাগলো। বেঁটেরা রাতারাতি নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলো না, কিন্তু গড়ে তাদের আয়ু কম হতে লাগলো লম্বাদের তুলনায়। ফলে গড়ে বেঁটেদের বাচ্চাকাচ্চাও কম হতে লাগলো, কারণ যে বাঁচছেই কম সে তো সন্তান উৎপাদনের সময়ও কম পাচ্ছে। এই করে বহু প্রজন্ম চলার পরে দেখা যাবে, যারা বেশি বেঁটে ছিলো তাদের আর চিহ্নই খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, শুধু লম্বারাই রয়ে গেছে। তখন আমরা দেখবো, অন্য চটপটে প্রাণীদের তুলনায় এই ধীর তৃণভোজী প্রাণীটি অনেকটা লম্বা। তখন বলতে হবে, ঐতিহাসিক বিবর্তনে এই লম্বা চেহারা অর্জন করেছে তারা।

রঙের কথায় আসা যাক। রঙের জন্য কি কোনো প্রাণীর বাঁচার সংগ্রামে সুবিধে বা অসুবিধে হতে পারে? উত্তর হচ্ছে, অবশ্যই হতে পারে। জয়হরির চিড়িয়াখানার মতো নীল ভেড়া যদি থাকে, তাদের কী হবে? পোষা ভেড়ার কথা হচ্ছে না, যদি এই রকম ভেড়া প্রচুর ঘুরে বেড়ায়, তাহলে কী হবে? বন জঙ্গল পাহাড় মাঠ ইত্যাদি যে সব জায়গায় ভেড়া চরে, সেখানে নীল রঙ খুব কম। তাই নীল ভেড়া থাকলে তা সহজে চোখে পড়ে যাবে মাংসভোজী প্রাণীদের। তারা অনেক কম পরিশ্রম করেই এই নীল ভেড়াদের ধরতে পারবে, এবং নিজেদের আহারের বন্দোবস্ত করতে পারবে। অন্য যে সব ভেড়া, যাদের লোমের রঙ ধুলোটে, তাদের পক্ষে লুকিয়ে থাকা সহজ হবে, তারা কম ধরা পড়বে। পাহাড়ি অঞ্চলে যেখানে সাদা পাথর আছে, সেখানে সাদা ভেড়াদের পক্ষেও সহজ হবে শিকারী প্রাণীর চোখকে ধোঁকা দেওয়ার। নীল ভেড়ারা পারবে না, তারা হেরে যাবে জীবনসংগ্রামে, তাদের গড় আয়ু ক্রমশ কম হতে হতে হয়তো শেষ পর্যন্ত তারা একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।

কথাটা উল্টোদিকেও খাটে। যারা শিকারী প্রাণী, তাদের রঙ যদি পরিবেশের সঙ্গে না মেলে, তাহলে তাদের মুশকিল। বাঘের গায়ের রঙ যদি লাল হয়, তাহলে বনের মধ্যে হরিণ বা ছাগলেরা সহজে সেই বাঘকে দেখতে পেয়ে যাবে, অনেক দূর থেকে দেখেই তারা পালাতে শুরু করবে। ফলে, সেই বাঘের পক্ষে খাবার জোগাড় করার কাজটা কঠিন হয়ে পড়বে। এর পরিণতি কী হবে? ধরা যাক এক কালে লাল রঙের বাঘও ছিলো। খাদ্য সংগ্রহের প্রতিযোগিতায় তাদের হার হয়েছিলো এই কারণে, এবং ক্রমশ তাদের সংখ্যা কমতে কমতে হয়তো তারা সম্পূর্ণ অবলুপ্ত হয়ে গেছে।

সত্যিই কি লাল বাঘ ছিলো তাহলে? এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সহজ নয়। শুধু বাঘ কেন, এখন আমাদের পরিচিত যে সব প্রাণী আছে, তাদের কোনো কিছুরই রঙ খুব প্রাচীন কালে কেমন ছিলো তা নিশ্চিতভাবে জানবার কোনো উপায় নেই। প্রাচীন প্রাণীর হাড় পাওয়া যায়। মাংস বা চামড়া পাওয়া যায় না, কারণ মৃত্যুর কয়েক বছরের মধ্যেই

শরীরের এই সব অংশ গলে পচে নষ্ট হয়ে যায়। মানুষের লেখা বা আঁকা থেকে যেটুকু তথ্য পাওয়া যায় তা বড়োজোর কয়েক হাজার বছরের পুরোনো, অতোটুকু সময়ের মধ্যে বিবর্তনের লক্ষণ স্পষ্ট হয় না। যেটুকু বলা যেতে পারে তা হলো, খাদ্য সংগ্রহের সংগ্রামে জিতে টিকে গেছে সেই সব বাঘ, বনে-জঙ্গলে লুকিয়ে ঘাপটি মেরে বসে থাকলে হরিণ বা ছাগলেরা যাদের সহজে দেখতে পায় না। সুন্দরবনের বাঘের রঙ তাই মেটে-হলুদ। মেরু অঞ্চলে, যেখানে চারিদিকে বরফ, সেখানে এই কারণেই বাঘের রঙ সাদা।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, বাঁচার সংগ্রামের সঙ্গে প্রাণীদের গায়ের রঙের একটা সম্পর্ক আছে। এ কথা ঠিক, কিন্তু এর সঙ্গে আরো কয়েকটা কথা মনে রাখতে হবে।

প্রথমত, এর মানে এই নয় যে সমস্ত প্রাণীর শরীরের প্রতিটি জায়গার রঙের পুঙ্খানুপুঙ্খ ব্যাখ্যা দেওয়া যায় বাঁচার সংগ্রামের প্রসঙ্গ টেনে। কোনো কোনো প্রাণীর গায়ের কিছু কিছু রঙ হয়তো নেহাতই কাকতালীয়, বা সংগ্রামের সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক বোঝা যায় না। তবে কিছু কিছু প্রাণীর গায়ের রঙের সঙ্গে বাঁচার সংগ্রামের যে একটা নিবিড় সম্পর্ক আছে, সেই কথাটাই এখানে বলা হচ্ছে।

দ্বিতীয়ত, বাঁচার সংগ্রামে শুধু রঙই বদলায় না। শরীরের গঠনও বদলাতে পারে, যার একটা উদাহরণ আগেই আলোচনা করা হয়েছে। শুধু বহিরঙ্গের বদল নয়, শরীরের ভেতরের কলকব্জাতেও বদল ঘটতে পারে। বিবর্তনের সামগ্রিক আলোচনায় রঙের বদলের তুলনায় এই সব গঠন সংক্রান্ত বদলের ভূমিকাই বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

তৃতীয়ত, বাঁচার সংগ্রাম মানে শুধুই খাদ্য সংগ্রহের সংগ্রাম নয়। টিকে থাকার জন্য প্রকৃতির অন্যান্য প্রতিকূলতার বিরুদ্ধেও লড়াই করতে হয়। তার জন্যও গায়ের রঙের তফাত ঘটতে পারে। মানুষের গায়ের রঙ যে কুচকুচে কালো থেকে ধবধবে ফর্সা পর্যন্ত নানা রকমের দেখা যায়, তার কারণটা এই রকমের। রঙের এই বৈচিত্র্যের সঙ্গে খাদ্য সংগ্রহের কোনো সম্পর্ক নেই, সম্পর্ক আছে সূর্যালোকের অতিবেগুনি রশ্মির সঙ্গে লড়াইয়ের। এই ব্যাপারটা আমাদের পরবর্তী আলোচ্য বিষয়।

> প্রাণীরা সব হরেক রঙে হয় কেন রঙিন?
> তাই না ভেবে ভেবেই যদি কাটে কারুর দিন
> বলবো তারে -- পরিবেশে
> রঙটা যাতে ভালো মেশে
> তার তরে হয় রঙের বাহার - কহেন ডারুইন।

১৯ : কালা-ধলা মানুষ

শেখর গুহ

"কালো মেয়ের কালো হরিণ চোখ" যেমন রবীন্দ্রনাথকে মুগ্ধ করেছে, তেমনই শেক্সপিয়ার, টেনিসন, বার্নস ইত্যাদি ইউরোপীয় কবিদের লেখায় ছড়িয়ে রয়েছে "ফেয়ার মেইডেন" বা গৌরাঙ্গী কন্যার রূপের প্রশস্তি। শুধু কাব্যে আর সাহিত্যেই নয়, ব্যবহারিক জীবনেও আমরা মানুষের গায়ের রঙের বেশ ভালোই গুরুত্ব দেখতে পাই এখনো। যাতায়াতের সুবিধা হয়েছে বলে এখন অনেক দেশেই পৃথিবীর নানা অঞ্চলের মানুষ বেশ কয়েক প্রজন্ম ধরে একত্র বাস করে। সেসব দেশে মানুষের গায়ের রঙ দিয়ে মোটামুটি আন্দাজ করা যায় সে বা তার পূর্বপুরুষ পৃথিবীর কোন অঞ্চলের আদি বাসিন্দা।

পৃথিবীর এক এক জায়গায় যারা অনেক প্রজন্ম ধরে বাস করেছে, সেই সব মানুষের গায়ের রঙ এক এক রকম হয়। নরওয়ে সুইডেন ডেনমার্কের লোকেদের গায়ের রঙ তো সাদাই চুল, চোখের তারা, এ সবও হাল্কা রঙের। আবার কেনিয়া, কঙ্গো, জাম্বিয়া, জিম্বাবোয়ের আদি বাসিন্দা মানুষের গায়ে সব কিছুরই রঙ ঘন কালো। চীন জাপান কোরিয়া ভিয়েতনামে ফ্যাকাশে হলদেটে চামড়ার মানুষের বাস। আর ভারত, পাকিস্তান, মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকা আর ক্যারিবীয় দ্বীপপুঞ্জে থাকে সাদা-কালো-বাদামি মেশানো কতো রঙের মানুষ। বিভিন্ন জায়গার মানুষের গায়ে এমন নানান রঙ এলো কোথা থেকে?

আমাদের পৃথিবীটার আকার গোল একটা বলের মতো হওয়ার জন্য পৃথিবীর এক এক জায়গায় রোদ্দুরের তেজ এক এক রকম। বিষুবরেখার কাছাকাছি অঞ্চলগুলিতে রোদ্দুর বেশ চড়া। সেখান থেকে যতোই উত্তরে বা দক্ষিণে যাওয়া যায়, রোদের তেজ ততোই কমতে থাকে — দুই মেরুতে রোদের তেজ সবচেয়ে কম। ১৯৫৯ খ্রিস্টাব্দে ইতালীয় ভূগোলবিদ রেনাতো বাসুত্তি প্রস্তাব করেছিলেন পৃথিবীর কোন জায়গায় রোদের তেজ কতো তার সঙ্গে সে জায়গায় বহু প্রজন্ম ধরে বাস করা মানুষের গায়ের রঙের একটা সম্বন্ধ আছে। যেখানে রোদের তেজ কম, সেখানকার মানুষের গায়ের রঙ সাদা। যেখানে রোদের তেজ বেশি, সেখানে গায়ের রঙ হয় কালো।

এটুকু পড়ে মনে হতে পাড়ে এ নিয়ে আর বিশেষ আলোচনা করার কী আছে? যেখানে রোদ্দুর বেশি সেখানকার লোকেদের গা রোদে পুড়ে কালো হয়ে গেছে। তাই তারা কালো। আর যেখানে রোদ কম, সেখানে তা হয়নি, তাই সেখানকার লোক সাদাই রয়েছে — এটাই কি বিভিন্ন রকম গায়ের রঙের সহজ কারণ নয়?

একটু ভাবলেই বোঝা যাবে যে এটা ঠিক কারণ হতে পারে না। নবজাত শিশুরা তো একেবারেই রোদে পোড়েনি – আফ্রিকার শিশুদের গায়ের রঙ তাহলে কুচকুচে কালো হয় কী করে? আসল কারণটা হলো উল্টো। বেশি রোদ্দুরে যারা থাকে তাদের গা যাতে পুড়ে না যায় তার জন্যই তাদের শরীরের রঙ কালো হয়েছে।

রোদে গা পুড়ে যাওয়াটা শরীরের পক্ষে খুবই ক্ষতিকর। সূর্য থেকে আসা বিকিরণে বেগুনি থেকে লাল রঙের আলো আমরা চোখে দেখতে পাই। তা ছাড়াও রয়েছে লালের চেয়ে বড়ো মাপের বা অবলোহিত রশ্মি, তবে বর্তমান প্রসঙ্গে তাদের ভূমিকা নেই বিশেষ। কিন্তু বেগুনির চেয়েও ছোটো মাপের ঢেউ, বা অতিবেগুনি রশ্মি মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীদের শরীরে নানা গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ঘটায়।

বায়ুমণ্ডলের উপরের দিকে ওজোন নামে একটি পদার্থের স্তর রয়েছে যা সূর্য থেকে আসা অতিবেগুনি রশ্মি অনেকটাই শুষে নেয়। কিন্তু বিষুবরেখার কাছাকাছি অঞ্চলে রোদের তেজ এতোই বেশি যে ওজোনস্তর ভেদ করে পৃথিবীর গায়ে নেমে আসা অতিবেগুনি রশ্মির পরিমাণ সেখানে নেহাত ফেলনা নয়। এই রশ্মি চামড়ার কোষে নানা পরিবর্তন ঘটিয়ে মানুষকে মারাত্মক রোগে ফেলতে পারে।

আমাদের শরীরের সব কলকব্জা ঠিকমতো চালাবার জন্য ভিটামিন নামে কিছু রাসায়নিক পদার্থ অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। ভিটামিন তেরো রকমের হয়, তার মধ্যে একটি হলো ভিটামিন বি-৯, যার রাসায়নিক নাম ফোলিক অ্যাসিড বা ফোলেট। ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দে বোম্বাই শহরের এক হাসপাতালে ইংরেজ বিজ্ঞানী লুসি উইলস দেখিয়েছিলেন যে শরীরে ফোলেটের অভাব থাকলে অন্তঃসত্ত্বা মেয়েরা রক্তাল্পতায় ভোগে। পেটের শিশুদের স্বাস্থ্য ভালো রাখার জন্য মায়ের শরীরে যথেষ্ট পরিমাণে ফোলেট থাকা খুবই দরকার। অতিবেগুনি রশ্মি ফোলেটকে ভেঙে দেয়, তাই বেশি রোদের জায়গায় মায়েদের শরীরে অতিবেগুনি রশ্মি ঢুকে গেলে তাদের শিশুরা নানান রোগে দুর্বল হয়ে পড়ে।

গায়ের চামড়ায় যে একটা রঙিন পদার্থ আছে ১৮১৯ খ্রিস্টাব্দেই তা লক্ষ করেন সানজোভান্নি নামে এক ইতালীয় বিজ্ঞানী। পরে সে কালচে জিনিশটার নাম দেওয়া হয় মেলানিন, গ্রিসদেশের ভাষার 'মেলানোস' শব্দ থেকে। 'মেলানোস' মানে কালো, সংস্কৃতে এর আত্মীয় শব্দটি হলো 'মলিন'।

মেলানিন দু ধরণের হয়, লালচে হলুদ রঙের *ফেওমেলানিন* আর খয়েরি কালো *ইউমেলানিন*। সব মানুষের শরীরেই মেলানিন রয়েছে। বিষুবরেখার কাছাকাছি, বেশি রোদ্দুরের জায়গায় যাদের বাস, তাদের চামড়ায় থাকে ইউমেলানিন, সে জন্য তাদের

গায়ের রঙ হয় কালো। ইউমেলানিন অতিবেগুনি রশ্মিকে ভালোভাবে শুষে নেয়, তাই সে রশ্মি গা পুড়িয়ে চর্মরোগ সৃষ্টি করতে অথবা ফোলেটকে ভেঙে দিতে পারে না। কালো মেয়েদের শিশুরা তাই সুস্থ থাকে। যাদের গায়ে ইউমেলানিন বিশেষ নেই তাদের রঙ হয় সাদা, এবং খুব রোদের জায়গায় তাদের থাকা মুস্কিল। সেখানে তারা কালো মানুষের তুলনায় গড়ে দশ গুণ বেশি মাত্রায় চর্মরোগে ভোগে। তাদের শিশুরাও দুর্বল হয় মায়ের শরীরে ফোলেটের অভাবে।

একেক জায়গার মানুষের গায়ের রঙ কেন একেক রকম, সেটা বিবর্তনবাদের সাহায্যে বুঝিয়েছেন বিজ্ঞানীরা। এখনকার মানুষ আর জঙ্গলের বনমানুষ দুইয়েরই উদ্ভব হয়েছে আমাদের পূর্বসূরী যে প্রাণীর থেকে, তারও গা ছিলো এখনকার বনমানুষের মতোই লম্বা লোমে ঢাকা। সূর্যের ক্ষতিকর রশ্মি সে লোমে আটকে যেতো বলে লোমের তলায় তাদের গায়ের চামড়ার রঙ ফর্সা ধরণের ---- সেখানে মেলানিন থাকার কোনো প্রয়োজন হয়নি। লোম কেটে দিলে দেখা যায়, এখনকার বনমানুষের গা-ও মোটামুটি ধূসর মতো, কুচকুচে কালো নয়। এখন থেকে মোটামুটি বারো লক্ষ বছর আগে আফ্রিকার প্রান্তরে এই প্রাণী ক্রমশ গায়ের লোম হারিয়ে ফেলে পরিণত হলো 'আধুনিক' মানুষে। কেন তার গায়ের লোম হারালো তা নিয়ে এখনো নানা মুনির নানা মত আছে। একটা মত হলো : লোমে বড্ড উকুন হতো।

যাই হোক, নতুন আসা এই লোমহীন মানুষের ফর্সা রঙের শিশুরা পড়লো একটু বিপদে। আফ্রিকা মহাদেশে বিষুবরেখার অতো কাছে রোদের প্রবল তেজে তাদের শরীরে বেশিমাত্রায় ঢুকতো অতিবেগুনি রশ্মি, তা ভেঙে দিতো শরীরের ভিটামিন বি ফোলেটকে, ফলে তারা অপেক্ষাকৃত দুর্বল হয়ে পড়তো। যেসব শিশুদের গায়ের রঙ একটু কালো, অর্থাৎ যাদের চামড়ায় খানিকটা বেশি মেলানিন থাকতো, তাদের সে অসুবিধাটা অতো হতো না। এই দ্বিতীয় গোষ্ঠীর মানুষের সন্তান-সন্ততিরা জন্মাতো শরীরে মেলানিনের অপেক্ষাকৃত আধিক্য নিয়ে। তাদের গড়পরতা জীবৎকালও হতো বেশি, তাই বড়ো হয়ে নিজেরা বাবা-মা হওয়ার সম্ভাবনাও তাদেরই অপেক্ষাকৃত বেশি হতো। এইভাবে প্রজন্মের পর প্রজন্ম কাটার পরে সেখানকার সব মানুষেরই রঙ হয়ে গেলো কালো। প্রায় দশ লক্ষ বছর ধরে কালো এই মানুষের আস্তানা আফ্রিকাতেই সীমাবদ্ধ ছিলো। এখন থেকে দেড় লক্ষ বছর আগেকার এমনই এক কালো মানবীর বংশধর আজকের পৃথিবীর প্রত্যেকটি মানুষ। আমাদের সকলের, এবং আমাদের জানা ইতিহাসের সব মানুষের এই আদিম মাতাকে বিজ্ঞানীরা নাম দিয়েছেন 'লুসি'।

লুসির বংশধরেরা ক্রমশ ছড়িয়ে পড়লো মধ্যপ্রাচ্যে, এখন যেখানে সিরিয়া, জর্ডান, ইজরায়েল, ইরাক ইত্যাদি দেশ। মোটামুটি চল্লিশ হাজার বছর আগে সেখান থেকে তারা পাড়ি দিলো উত্তরে ইউরোপের দিকে এবং পূর্বে এশিয়া মহাদেশে। কিন্তু উত্তরে কম রোদ্দুরের জায়গায় যারা গেলো তাদের রঙ কালো রাখা হলো মুস্কিল।

তার কারণ, অতিবেগুনি রশ্মির নানান দোষ আছে বটে, কিন্তু তার সাথে একটা গুণও আছে। খানিকটা অতিবেগুনি রশ্মি আমাদের শরীর ভালো রাখার জন্য খুব দরকার। বেশির ভাগ ভিটামিন আমরা পাই খাদ্য থেকে, কিন্তু ভিটামিন ডি প্রধানত আমাদের শরীরেই তৈরি হয় এবং সেটা হয় অতিবেগুনি রশ্মির সহায়তায়। সে রশ্মি চামড়ার কোলেস্টেরলকে পরিণত করে ভিটামিন ডি-তে। খাদ্য থেকে ক্যালশিয়াম ও ফসফোরাস শুষে নিয়ে হাড় গড়া ও শক্ত করার জন্য ভিটামিন ডি খুবই জরুরি। নানা ব্যাকটিরিয়া ও ভাইরাসের সংক্রমণ প্রতিরোধ করার জন্যও শরীরে ভিটামিন ডি থাকা দরকার। অল্পবয়েসী মেয়েরা যথেষ্ট পরিমাণে তা না পেলে তাদের শরীর শিশুর জন্ম দেওয়ার পক্ষে অনুপযুক্ত হয়ে পড়ে। কম রোদের জায়গায় অতিবেগুনি রশ্মির পরিমাণ তো কম। কালো মানুষের গায়ে থাকা ইউমেলানিন সে রশ্মি এমনই ভালো ভাবে শুষে নিতে পারে যে তাদের চামড়ায় ভিটামিন ডি তৈরি হয় খুব কম। ভিটামিন ডি'র এই ঘাটতির ফলে কালো চামড়ার শিশুদের হাড় শক্ত হয় না, তারা বড়ো হয়ে নিজেরা বাবা-মা হওয়ার সুযোগও পায় না। জনসংখ্যায় কালো মানুষ তাই ক্রমশই কমে আসে। যাদের চামড়ায় ইউমেলানিন কম, কেবল তাদেরই শরীরে অতিবেগুনি রশ্মি ঢুকে যথেষ্ট ভিটামিন ডি তৈরি করতে পারতো -- তাই শুধু তারাই বড়ো হয়ে নিজেরা বাবা-মা হওয়ার সুযোগ পেতো। তাদের বংশধরেরা তাই ক্রমাগত ফর্সা হতে হতে আজকের উত্তর ইউরোপীয়দের রূপ নিলো। তাদের গায়ের চামড়া শুধু নয় -- মাথার চুল, চোখের তারা, কোনোটাতেই মেলানিন থাকার প্রয়োজন নেই বলে সেগুলি সবই সাদা বা সাদার কাছাকাছি রঙের হয়ে গেলো।

মেরুর কাছাকাছি, অর্থাৎ খুবই কম সূর্যালোকের অঞ্চলে বাস ইনুইট বা এস্কিমোদের। তাদের গায়ের রঙ ইউরোপীয়দের তুলনায় বেশ কালো। ভিটামিন ডি-র অভাব দূর করার জন্য তাদের রঙ আরো সাদা হয়ে যায়নি কেন? ভেবেচিন্তে দেখা গেলো যে তার কারণ হলো, ইনুইটদের খাদ্যে মাছ-মাংসেরই প্রাধান্য, এবং শাক-সবজি প্রায় নেই বললেই চলে। মাছ-মাংসে ভিটামিন ডি রয়েছে প্রচুর, তাই শরীরে ভিটামিন ডি তৈরির জন্য তাদের সূর্যের আলোর খুব একটা প্রয়োজন হয় না। এখনকার দিনে কালো চামড়ার মানুষ যদি বিষুবরেখার কাছাকাছি তার আদি বাসস্থান ছেড়ে কম সূর্যালোকের এলাকায় বাস করতে যায় তাহলে হাড় শক্ত রাখার জন্য খাদ্যে, বিশেষ করে দুধে, বাড়তি ভিটামিন ডি মিশিয়ে ঘাটতি পূরণ করতে হয়।

গায়ের রঙ যে শুধু মেলানিন থেকেই আসে তা নয়। ক্যারোটিন নামে আর একটা রঞ্জক পদার্থও কোনো কোনো মানুষের গায়ে থাকে এবং সেটা তাদের গায়ের রঙ হলদে করে দেয়। অত্যধিক গাজর খেলে এই দশা হতে পারে। তাছাড়া আমাদের রক্তে থাকে হিমোগ্লোবিন নামে একটি জটিল প্রোটিনের অণু। এর কাজ হলো আমাদের সারা দেহে অক্সিজেন বয়ে নিয়ে যাওয়া। অক্সিজেন ভরা হিমোগ্লোবিনের রঙ লালচে।

ফর্সা মানুষদের অনেকসময় লাল দেখায় এই অক্সিজেন ভরা হিমোগ্লোবিনের জন্য। অক্সিজেনহীন হিমোগ্লোবিনের রঙ নীল। দম বন্ধ হয়ে রক্তে অক্সিজেন কমে এলে তাই গা ও মুখের রঙ নীলচে হয়ে আসে।

প্রসঙ্গত বলা যেতে পারে, সন্ধিপদ এবং খোলকত্বকী প্রাণীদের রক্তে হিমোগ্লোবিন থাকে না, থাকে হিমোসায়ানিন নামে অন্য একটি পদার্থ। অক্সিজেন ছাড়া এটি স্বচ্ছ, কিন্তু অক্সিজেন যুক্ত হলে এর রঙ নীল। তাই জীবিত অবস্থায় এই সব প্রাণীর রক্ত নীল হয়।

অপেক্ষাকৃত হালকা রঙের মানুষ কিছুক্ষণ রোদে থাকলে তাদের রঙ প্রথমে তামাটে, তারপরে বাদামি ও কালো হয়ে আসে — ইংরিজিতে একে বলে 'ট্যানিং'। চামড়ায় মেলানিন রঞ্জকটা থাকে দানা দানা আকারে। রোদ্দুরের অতিবেগুনি রশ্মি সে দানাগুলির আয়তন আর সংখ্যা দুটোই বাড়িয়ে দেয় এবং তার ফলেই গায়ের রঙটা ফর্সা থেকে পাল্টে অমন কালচে হয়ে যায়।

বিষুবরেখা থেকে ঠিক কতোটা দূর অবধি কালো মানুষদের পক্ষে নিরাপদ স্থান? বিজ্ঞানীরা মেপে দেখেছেন বিষুবরেখার কুড়ি ডিগ্রি উত্তর ও কুড়ি ডিগ্রি দক্ষিণের মধ্যেই রোদের তেজ সবচেয়ে বেশি আর সেখানেই পৃথিবীর বেশিরভাগ কালো মানুষের আদিবাস। আফ্রিকা মহাদেশের মোটামুটি মাঝখান দিয়ে বিষুবরেখাটা গেছে এবং আফ্রিকার বেশির ভাগ দেশের অবস্থান বিষুবরেখার কুড়ি ডিগ্রি উত্তর ও দক্ষিণের মধ্যে। তাই সে মহাদেশের বেশির ভাগ মানুষের গায়ের রঙ কালো।

ভারতের পশ্চিমে নাসিক এবং পূর্বে ভুবনেশ্বর শহর পড়ে কুড়ি ডিগ্রি অক্ষাংশের খুব কাছে। মানচিত্রে এই দুটি শহরকে জুড়ে যদি একটা সরলরেখা টানা হয় তাহলে দেখা যাবে যে সাধারণত যে অঞ্চলগুলিকে আমরা উত্তর ও দক্ষিণ ভারত বলি, তা যথাক্রমে পড়েছে এই দাগটার উত্তর ও দক্ষিণে। আন্দাজ করা যায় যে হাজার হাজার বছর ধরে দক্ষিণভারতে যে মানবগোষ্ঠীর বাস, অতিবেগুনি রশ্মির ক্ষতিকর প্রভাব থেকে রক্ষা পেতে গিয়ে তাদের গায়ের রঙ হয়েছে কালো। আর অতিবেগুনি রশ্মির উপকারটা পাওয়ার তাগিদে উত্তরভারতের আদি মানুষের রঙ হয়ে গেছে অপেক্ষাকৃত ফর্সা। তাদের সংমিশ্রণে এখনকার ভারতে তাই দেখা যায় কালো, সাদা, বাদামি ইত্যাদি নানা রঙের মানুষের জটলা।

নানা জায়গার মানুষের চোখের তারা আর চুলের রঙও নানা রকমের হয়। গায়ের রঙ যাদের কালো, সাধারণত তাদের চুলও কালোই হয়, আর তাদের চোখের তারার রঙ হয় কালো বা বাদামি। এই কালো রঙও আসে শরীরের মেলানিন থেকে — বেশি সূর্যালোকের দেশে ক্ষতিকর অতিবেগুনি রশ্মি শুষে নেওয়ার প্রয়োজনে চুলে ও চোখের তারায় মেলানিন থাকাটা সুবিধের। ইউরোপ মহাদেশের বাইরে উদ্ভব হওয়া পৃথিবীর প্রায় সব দেশের মানুষেরই চুলের রঙ কালো আর চোখের তারার রঙ কালো বা বাদামি।

হাজার হাজার বছর ধরে ইউরোপে যেসব মানুষের উদ্ভব হয়েছে তাদের সবারই গায়ের রঙ ফর্সা ঠিকই, কিন্তু তাদের চুল ও চোখের তারার রঙ হয় নানা রকমের। দক্ষিণ ইউরোপের লোকেদের চুল ও চোখের তারার রঙ প্রধানত কালোই হয়, কিন্তু উত্তর ইউরোপে ও বাল্টিক সাগরঘেরা দেশগুলিতে সোনালি, হলুদ, লাল, কালো ইত্যাদি নানা রঙের চুলওয়ালা মানুষ দেখা যায়। সেসব এলাকার মানুষের চোখের তারার রঙও ঘন নীল, হাল্কা নীল, সবুজ, পিঙ্গল, কালো, বাদামি ইত্যাদি বিভিন্ন রকমের হয়ে থাকে। পৃথিবীতে এতো জায়গা থাকতে কেবল ইউরোপেই মানুষের চুল ও চোখের তারায় এতো রকমের রঙ দেখা দিলো কেন তার কারণটা এখনো নিশ্চিতভাবে জানা যায়নি। একটা মত পেশ করা হয়েছিলো যে ইউরোপের আদিবাসী নেয়ান্ডেরটালদের সঙ্গে 'আধুনিক' মানুষের সংমিশ্রণে এটা ঘটেছে। এ মতটা অনেক বিজ্ঞানীই একেবারে নস্যাৎ করে দিয়েছেন। মার্কিনদেশে স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানী লুইজি লুকা কাভাল্লি স্ফোর্জার মতে আসল কারণটা হলো সঙ্গী নির্বাচন। পশুপাখিদের গায়ে যে কারণে উজ্জ্বল নানারঙের বাহার দেখা যায়, ইউরোপেও সেই কারণেই জনগোষ্ঠীর মধ্যে অমন নানা রঙের চুল ও চোখের তারার রঙের বিবর্তন হয়েছে।

উত্তর ইউরোপে এখন যেখানটা ঊষর তুন্দ্রা অঞ্চল, দশ কি কুড়ি হাজার বছর আগেও সেসব জায়গাগুলি প্রাণীতে ভরপুর ছিলো। অতলান্তিক মহাসমুদ্রে উপসাগরীয় স্রোত অতো উত্তরেও বয়ে আনতো গরম আবহাওয়া। নানাজাতের বল্গাহরিণ, কস্তুরী-ষাঁড় ইত্যাদি দ্রুতগতি তৃণভোজীদের পাল সেখানে দল বেঁধে ঘুরে বেড়াতো, আর তাদের ধাওয়া করতো যাযাবর শিকারী-জোগাড়ে মানুষের দল। সেইসব জনগোষ্ঠীতে মেয়েদের কাজ ছিলো আস্তানায় থেকে শিশুপালন, আর পুরুষদের কাজ ছিলো বন্যপ্রাণী শিকার করে আনা। সেই বিপজ্জনক কাজটা করতে গিয়ে পুরুষেরা প্রাণ হারাতো বেশি, তাই যে কোনো গোষ্ঠীতেই পুরুষদের তুলনায় মেয়েদের সংখ্যা বেড়ে যেতো। সঙ্গী বা স্বামী খোঁজার জন্য তাই মেয়েদের মধ্যে চলতো তীব্র প্রতিযোগিতা। গায়ের রঙ তো সকলেরই সাদা হয়ে এসেছিলো, পুরুষদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার তাগিদে তাদের মধ্যে যাদের চুল বা চোখের তারার রঙ একটু চমকপ্রদ, তারাই প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে বাছাই হতে থাকলো, যেভাবে ময়ূরের গায়ে পেখম জুড়েছে আর সিংহের মাথায় গজিয়েছে কেশর। যে বিজ্ঞানীরা এই মতটা সমর্থন করেন, যেমন কানাডাতে পিটার ফ্রস্ট, তাঁরাও কিন্তু বলেন যে এ বিষয়ে নিশ্চিত হতে গেলে আরো গবেষণা করা দরকার।

নীলনয়না কোনো সুন্দরীকে তার প্রেমিক যদি বলে, তোমার চোখ আকাশের মতো নীল, সেটা বিজ্ঞানের দিক থেকে দেখলে খুব খাঁটি কথা বলেই গণ্য হবে। তার কারণ, আকাশের রঙ যে কারণে নীল, চোখের তারাও নীল হয় সেই কারণেই। চোখের তারা যেসব স্নায়ু দিয়ে গড়া, সেগুলি খুবই সরু, তাদের বেধ আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্যের চেয়ে অনেক কম। সেগুলিতে মেলানিন থাকলে আলো শুষে যায়, তারাটা দেখায় কালো। কিন্তু তাতে

মেলানিন একেবারে না থাকলে ওগুলোর গা থেকে আলো ঠিকরোয় র‍্যালে-বিক্ষেপণের নিয়ম অনুযায়ী। অর্থাৎ সাদা আলো পড়লে লাল রঙটা ঠিকরোয় কম, নীল ঠিকরোয় বেশি, তাই তারাটা দেখায় নীল, ঠিক যেমন ঘটে বায়ুমণ্ডলের অণু পরমাণুগুলি থেকে সাদা আলোর র‍্যালে-বিক্ষেপণে।

চোখের তারায় মেলানিন ভালোমতো থাকলে সেটা দেখায় কুচকুচে কালো। মেলানিন একটু কম হলে তা দেখায় বাদামি। মেলানিন আরো কম হলে দুটো ব্যাপার হয়, এক তো অল্প মেলানিনে সাদা আলো শুষে যাওয়া জায়গাটা হলদে হয়, আর বাকি না শুষে যাওয়া আলোটা র‍্যালে-বিক্ষেপণে নীল হয়ে পড়ে — আর সেই নীল ও হলদে রঙ মিশে সে চোখের তারার রঙ হয়ে যায় সবুজ বা হাল্কা বাদামি।

আমাদের হাতের নখ যা দিয়ে তৈরি, মাথার চুলও সেই কেরাটিন দিয়েই তৈরি। নখ যেমন স্বচ্ছ বা সাদাটে, চুলেরও তেমনই নিজস্ব রঙ হলো সাদা। চুলের নানা রঙ আসে চুলের গোড়ায় জমা ইউমেলানিন আর ফেওমেলানিন নামে রঞ্জকদুটো থেকে।

বেশির ভাগ মানুষেরই চুলের রঙ কালো, তার কারণ ভারতীয় উপমহাদেশে এবং চীন, জাপান, কোরিয়া ইত্যাদি বিশাল জনসংখ্যার দেশগুলিতে কালোচুল মানুষেরই প্রাধান্য। সেই কালো রঙটা আসে ইউমেলানিন থেকে। মধ্যপ্রাচ্য ও আফ্রিকার দেশগুলিতে, ইউরোপের নানা জায়গায় আর উত্তর এবং দক্ষিণ আমেরিকার আদিবাসীদের মাথায় বাদামি চুল দেখা যায়। ইংরিজিতে তাদের বলে ব্রুনেট। বাদামি চুলে কালো চুলের চেয়ে কম পরিমাণে ইউমেলানিন থাকে।

পৃথিবীর জনসংখ্যার কেবল দুই শতাংশ মতো মানুষের চুল হয় হাল্কা রঙের, অর্থাৎ রূপালি, সোনালি বা হলদেটে। ইংরিজিতে এদের বলে ব্লন্ড। ব্লন্ডদের চুলে ইউমেলানিন আর ফেওমেলানিন দুটোই থাকে অল্প পরিমাণে। ফেওমেলানিনের অনুপাত বেশি হলে চুলের রঙটা হয় সোনালি, আর ইউমেলানিন বেশি হলে রঙটা হয় ধূসর।

একেবারে লালচুলের মানুষ সংখ্যায় সবচেয়ে কম। আয়ারল্যান্ড, স্কটল্যান্ড, ওয়েলস ইত্যাদি দেশে এদের বেশি দেখা যায়। এদের চুলে ইউমেলানিন খুবই কম থাকে, লাল রঙটা প্রায় পুরোই আসে ফেওমেলানিন থেকে।

বয়স হলে চুলের গোড়ায় মেলানিনের উৎপাদন কমে আসে আর গোড়াটা শিথিলও হয়ে আসে। মেলানিনহীন সেই চুল দেখায় সাদা, আমরা সেটাকে বলি পাকাচুল। গল্প আছে সম্রাট শাজাহানের চুল রাতারাতি পেকে সাদা হয়ে গিয়েছিলো। প্রায় সব বাবা-মায়েরাই বলে থাকেন যে তাদের চুল প্যাকার প্রধান কারণ হলো তাদের ছেলেমেয়েরা।

কিন্তু মানসিক চাপে চুল পাকে এই রটনাটার সত্যতা এখনো নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হয়নি।

সারাদিন রোদে টোটো কোরোনা গো দস্যি
সূর্য পাঠায় নানা ক্ষতিকর রশ্মি
ওই কড়া রোদ্দুরে
গা যেন যায় না পুড়ে
তার চেয়ে ঘরে বসে খাও হিম-লস্যি।

২০ : রঙ দেখা

পলাশ বরন পাল

আমাদের চোখের সামনের দিকটা পেটমোটা একটা লেন্সের মতো। সে দিক দিয়ে আলো ঢোকে চোখের মধ্যে। লেন্স আলোকে বেঁকিয়ে ঘুরিয়ে নিয়ে ফেলে চোখের পেছনদিকে অবস্থিত একটি পর্দার ওপরে। এইখানে এলে তবে চোখ বুঝতে পারে যে আলো এসেছে, অর্থাৎ আলো শনাক্ত করতে পারে, সেই তথ্য চলে যায় আমাদের মগজে।

আলো শনাক্ত করার জন্য চোখের পর্দায় দু রকমের কোষ থাকে। এক ধরণের কোষ দেখতে লম্বাটে রড বা লাঠির মতো। অন্যগুলোও লম্বাটে, তবে তার এক দিকটা ছুঁচোলো আর অন্য প্রান্তটা চওড়া, অর্থাৎ শঙ্কু বা গোঁজের মতো চেহারা। দু রকম কোষের গঠনের একটা ধারণা পাওয়া যাবে ২৮ নম্বর ছবি থেকে।

এর মধ্যে লাঠি কোষগুলো রঙ চেনবার কাজে খুব একটা সহায়তা করে না। এগুলোর কাজ অল্প আলোয় দেখার জন্য, এবং সেই জন্যই অল্প আলো থাকলে তাতে রঙ চেনা খুব মুশকিল। আলোর পরিমাণ বেশি হলে লাঠিগুলো কাজ করে না, তখন বাইরের আলো শুষে নেওয়ার দায়িত্ব নেয় গোঁজগুলো। এই গোঁজগুলোর মধ্যে তিন
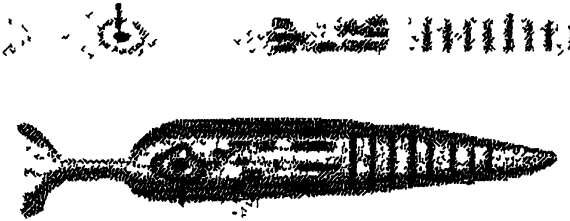
২৮ নং ছবি॥ *ওপরে লাঠির মতো কোষ, নিচে গোঁজের মতো।*
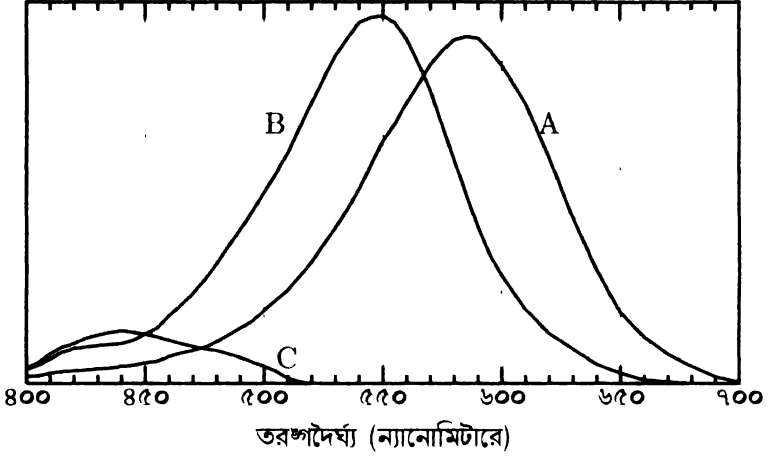
২৯ নং ছবি॥ *তিন রকমের অণু বিভিন্ন তবঙ্গদৈর্ঘ্যে কী রকম আলো শোষণ করে।*

রকমের বিভিন্ন অণু থাকে, যারা এই কাজটা করে। এদের কার্যকারিতায় তফাত আছে। এই তফাত বোঝানো হয়েছে ২৯ নম্বর ছবিতে।

ছবিতে তিনটি দাগের উচ্চতা দিয়ে দেখানো হয়েছে, তিন রকমের অণু কী রকম আলো শুষে নিতে পারে কোন তরঙ্গদৈর্ঘ্যে। যে অণুটির নাম বলা হচ্ছে A, দেখা যাচ্ছে সেই অণু সবচেয়ে বেশি দক্ষ ৬০০ ন্যানোমিটারের চেয়ে সামান্য কম তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলো টেনে নেওয়ার কাজে। B অণু সবচেয়ে তুখোড় ৫৪০ কি ৫৫০ ন্যানোমিটার নাগাদ। আর C বলা হয়েছে যে অণুকে, তার কার্যকারিতা কোনো দৈর্ঘ্যের তরঙ্গের ক্ষেত্রেই তেমন আহামরি কিছু নয়, তবে ওরই মধ্যে সবচেয়ে ভালো কাজ করে ৪৫০ ন্যানোমিটারের কাছাকাছি। কোন তরঙ্গদৈর্ঘ্যে কী রঙের আলো দেখা যায় তা আমরা জানি। সেই তথ্য কাজে লাগিয়ে এবারে তাহলে বলা যাক, আলো শুষে নেওয়ার ব্যাপারে C অণুর কার্যকারিতা নীল রঙে সবচেয়ে বেশি, B অণুর সবুজে, আর A অণুর লাল রঙে।

যে জিনিশটা সহজেই চোখে পড়ে ২৯ নম্বর ছবির দিকে তাকালে, তা হলো - তিন রকমের অণু মিলিয়েও নীল রঙের আলো যে পরিমাণে শুষে নিতে পারে আমাদের চোখ, সেই পরিমাণটা খুব একটা বেশি নয় — অন্তত মাঝামাঝি তরঙ্গদৈর্ঘ্যের হলুদ সবুজ ইত্যাদি রঙের আলোর সঙ্গে তুলনায়। সেই কারণেই রাত্তিরে ঘরে একটা আলো জ্বালিয়ে রাখতে হলে আমরা নীল আলো জ্বালি -- চোখে নীলটা খুব সাড়া ফেলবে না, ঘরে বেশি আলো মনে হবে না। বিজ্ঞাপনে যদি পাশাপাশি নীল আর হলুদ আলোয়
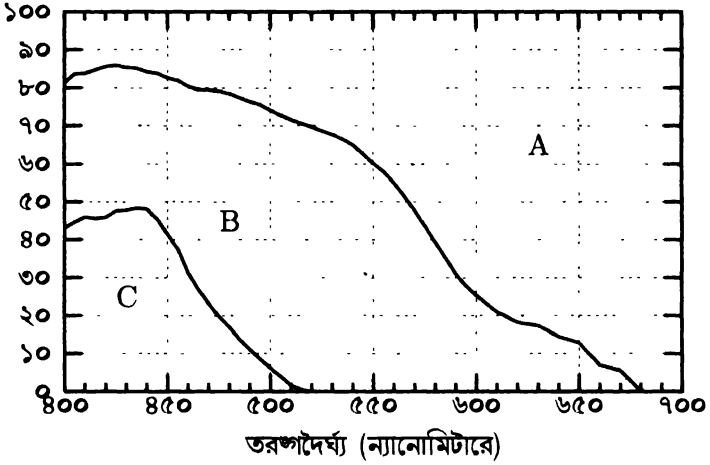
৩০ নং ছবি॥ *শতাংশের হিসেবে কোন তরঙ্গদৈর্ঘ্যে কোন অণু কতোটা আলো শোষে। বুঝবার সুবিধের জন্য শতাংশকে ভাগ করে দেওয়া হয়েছে দশটি দশাংশের খোপে।*

লেখা থাকে কিছু, তাহলে হলুদটা বেশি উজ্জ্বল দেখায়, তুলনায় নীলটা শান্ত মনে হয়। কাঠে বা পাতায় আগুন জ্বালালে তার শিখার হলুদ রঙে যে রকম চোখ ঝলসে যায় বলে মনে হয়, রান্নার গ্যাসের নীল আলোয় সে রকম মনে হয় না। লাল রঙের অবস্থাও নীলের মতো, অর্থাৎ তরঙ্গদৈর্ঘ্য বাড়তে বাড়তে লালের শেষ দিকে গেলেও চোখের কার্যক্ষমতা কমে আসে।

এ তো ঔজ্জ্বল্যের কথা। যে প্রশ্নটা আমাদের কাছে তার চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ তা হলো, চোখ কী করে এক রঙের থেকে অন্য রঙের তফাত করে? তার জন্য আগে যে তিন রকমের অণুর কথা বলা হয়েছে, তাদের কাজের কথাটা একটু অন্যভাবে ভাবা যাক। কোন তরঙ্গদৈর্ঘ্যে চোখ কতো তৎপর সে কথা বাদ দিয়ে ভাবা যাক, যে কোনো তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলো চোখে এসে পড়লে চোখের পর্দায় কোন অণু কতোটা শুষছে সেই আলো। এর উত্তর ২৯ নম্বর ছবির মধ্যেই লুকিয়ে আছে, কিন্তু সুবিধের জন্য উত্তরটা পরিষ্কার করে দেখানো হলো ৩০ নম্বর ছবিতে।

এই ছবিটিতে দুটো মোটা দাগ দিয়ে দেখানো হয়েছে শতাংশের হিসেবে কোন তরঙ্গদৈর্ঘ্যে কোন অণু কতো সক্রিয়। ধরা যাক ৫০০ ন্যানোমিটারে কী হয় তার কথা। ৫০০-র যে দাগ আছে, সেখান থেকে খাড়া ওপর দিকে উঠতে শুরু করা যাক। ছবির পুরো বাক্সের উচ্চতাকে যদি ১০০ বলে ভাবি, তাহলে বাক্সের তলা থেকে যতোটা উঠলে প্রথম মোটা লাইনটা পাওয়া যাবে ততো শতাংশ আলো শুষছে C অণু। ওই দাগ থেকে

ওপরের মোটা দাগে যেতে গেলে যতোটা উঠতে হবে, ততো শতাংশ আলো B অণু শুষে নিচ্ছে। আর বাদবাকিটা, অর্থাৎ দুটো দাগের ওপরে যতোটা জায়গা থাকছে, সেটা হলো A অণুর ভাগ।

এই তিন রকমের অণু কী অনুপাতে কাজ করছে আলো শুষে নেওয়ার ব্যাপারে, সেই হিসেব দিয়েই আমাদের চোখ আলোর রঙ বোঝে। যেমন ৫০০ ন্যানোমিটারের কথাই ধরা যাক। ২৯ নম্বর ছবির দিকে তাকিয়ে দেখা যাচ্ছে, এখানে C অণুর সক্রিয়তা অল্প, B-এর সবচেয়ে বেশি, A অণুর খানিকটা। সেই একই কথা পাওয়া যাচ্ছে ৩০ নম্বর ছবি থেকে — ৫০০ বরাবর যে খাড়া দাগ দেওয়া হয়েছে সেইটা ধরে তলা থেকে শতকরা মোটে ৬ ভাগ উঠলেই প্রথম রেখার দেখা পাওয়া যাবে, তারপরে আরো ৬৮ ভাগ উঠলে দ্বিতীয় রেখা, এবং তারও ওপরে মোটামুটি যে ২৬ শতাংশ জায়গা পড়ে আছে, সেটা A অণুর অবদান। এই হিসেব কিন্তু ৫৫০ ন্যানোমিটারে অন্য রকম হতো। সেখানে C অণু কিছুই করতে পারে না। B অণুই করে শতকরা প্রায় ৬০ ভাগ কাজ, A অণু বাকি ৪০ ভাগ। আবার ৬০০ ন্যানোমিটারের আলো চোখে এসে পড়লে তাকে শুষে নিতে A, B এবং C অণু যে অনুপাতে কাজ করে, তা হলো ৭৫ : ২৫ : ০।

এই যে বিভিন্ন অনুপাত হচ্ছে, এই থেকেই রঙের অনুভূতি জাগে আমাদের মনে। একটা রঙের আলো যখন চোখে এসে পড়ছে, তখন তিন রকমের অণুর কোনটা কী রকম টানছে তাকে, সে তথ্য মগজে পৌঁছে যায়। সেই তথ্য পেয়ে মগজ যে ভাবে সাড়া দেয়, সেইটাকেই আমরা বলি আমাদের রঙ দেখার অনুভূতি। সাধারণত মানুষ এই ভাবে রঙ দেখে।

এ কথাটা বলার সঙ্গে সঙ্গে কয়েকটা প্রশ্ন মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। প্রথম প্রশ্ন "সাধারণত" কথাটা ব্যবহার করা হলো কেন? তাহলে কি অন্য রকম ভাবেও রঙ দেখে কোনো কোনো মানুষ? এবং দ্বিতীয় প্রশ্ন "মানুষ"-এর উল্লেখ করতে হলো কেন? অন্যান্য প্রাণী কি অন্যভাবে রঙ দেখে? একে একে এই দুটি প্রশ্নের আলোচনা করা যাক।

সব মানুষ যে ঠিক একই রকম রঙ দেখে না, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। সমান পরিমাণ আলো এসে পড়লে সবার ক্ষেত্রেই ঠিক একই পরিমাণ সাড়া দেয় না চোখের প্রতিটি কোষ। আমরা এতোক্ষণ যা আলোচনা করেছি, তা মোটামুটি একটা গড় হিসেব। এর থেকে সামান্য এধার ওধার হলে তাতে উল্লেখযোগ্য কোনো পরিবর্তন হয় না রঙের অনুভবে।

কিন্তু তফাতটা যদি বড়ো হয়? যেমন ধরা যাক, কারুর শরীরে কোনো বিশেষ কারণে, বা কোনো বিশেষ অবস্থার ফলে C অণুগুলো নেই, অথবা কাজ করে না একেবারেই। কাজ করে না মানে, চোখের ওপর আলো এসে পড়লে তাকে শুষে নেয় কেবল A এবং B অণু। আরো ধরা যাক, A এবং B অণুর কার্যকারিতায় কোনো
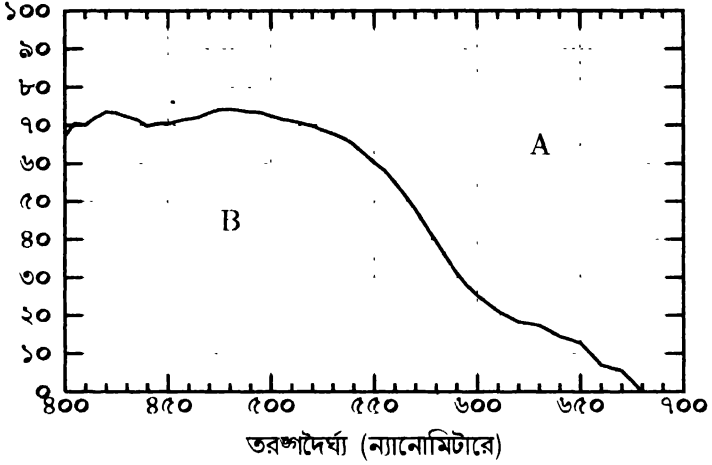
৩১ নং ছবি॥ *কারুর চোখের পর্দায় যদি C অণু কাজ না করে, তাহলে A আর B অণু শতাংশেব হিসেবে কোন তরঙ্গদৈর্ঘ্যে কতোটা আলো শুষবে, তার পরিমাণ।*

ব্যতিক্রম নেই এই ব্যক্তির ক্ষেত্রে, অর্থাৎ ২৯ নম্বর ছবিতে এই দু রকমের অণুর যে রকম সাড়া দেখানো হয়েছে ঠিক সেই রকমই হচ্ছে এঁর চোখে। তাহলে এই ব্যক্তি কি অন্য রকম রঙ দেখবেন?

তা দেখবেন বৈকি। কারণ, এঁর ক্ষেত্রে ৩০ নম্বর ছবিটি খাটবে না। (১৪৭ পৃষ্ঠায়) ২৯ নম্বর ছবি থেকে তথ্য নিয়ে আমরা যখন শতাংশের হিসেব করবো, তখন C অণুর বখরাটা সম্পূর্ণ বাদ দিতে হবে। ৫৩০ বা ৫৪০ ন্যানোমিটারের ওপরে অবশ্য তাতে কোনোই তফাত হবে না, কারণ এই সব তরঙ্গদৈর্ঘ্যে C অণু এমনিতেই কাজ করে না। তাই বড়োর দিকের তরঙ্গদৈর্ঘ্যে, হলুদ বা লাল রঙের বেলায়, এই ব্যক্তি যা দেখবেন গড়পড়তা মানুষও তেমনিই দেখেন। কিন্তু তফাত হবে ছোটো তরঙ্গদৈর্ঘ্যের দিকে। C অণু বাদ দিলে এখানে শতাংশের হিসেবে বিরাট ফারাক হবে, ৩১ নম্বর ছবিতে এই হিসেব দেখানো হয়েছে। আমরা দেখতে পাচ্ছি, ৫২০ ন্যানোমিটার বা তার নিচে A আর B অণুর অবদানের অনুপাত সর্বত্রই প্রায় সমান, শতাংশের হিসেবে ৩০ : ৭০ বা তার আশেপাশে। তার মানে, মগজ যদি খবর পায় যে এমন কোনো আলো এসে পড়েছে যার ৩০ শতাংশ শুষে নিয়েছে চোখের A অণু আর ৭০ শতাংশ B অণু, তাহলে এই তথ্য থেকে মগজ বুঝতে পারবে না যে আলোটা ৪৪০ ন্যানোমিটারের নীল আলো, নাকি ৫২০ ন্যানোমিটারের সবুজ। নীল আর সবুজ আলাদা করার উপায় থাকবে না। অর্থাৎ এই ব্যক্তি আংশিকভাবে রঙকানা বা বর্ণান্ধ হবেন, এঁর কাছে নীল আর সবুজ

একই রকম মনে হবে। A, B আর C এই তিন রকম অণুর কার্যকারিতায় যদি অন্য কোনো রকম ব্যতিক্রম থাকে, তাহলে রঙ নিয়ে অন্য রকম সংশয় দেখা দেবে।

অন্যান্য প্রাণীরা কী রকম রঙ দেখে, সে কথা আলোচনা করতে গেলেও এই শিক্ষাটি মনে রাখা জরুরি। সব প্রাণীর চোখেই ঠিক একই রকম অণু থাকবে, তারা ঠিক একই রকম ভাবে সাড়া জাগাবে তাদের মগজে, এ কথা মনে করার কোনোই কারণ নেই। তবে প্রাণীদের ব্যাপারে এই তথ্য সংগ্রহ করার কাজটা অনেক জটিল। কোনো মানুষের সামনে রঙিন কিছু জিনিশ ধরে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে জানা যায় রঙের কী অনুভূতি হচ্ছে। অন্য প্রাণীরা তো আর প্রশ্নের উত্তর দেবে না! তাই তাদের বেলায় কায়দা করে বার করতে হয় সমস্ত তথ্য। যেমন ধরা যাক, কোনো একটি প্রাণীর খাওয়ার সময়ে তার সামনে দুটি পাত্র রাখা হয়, একটি লাল আর একটি কমলা। লাল পাত্রে থাকে খাবার, কমলা পাত্রে আবর্জনা। রোজই লালটা থাকে বাঁদিকে, কমলাটা ডানদিকে। এক দিন দুটো পাত্রের জায়গা বদলে দেওয়া হলো। প্রাণীটি কি পাত্রের রঙ দেখে এই বদল বুঝতে পারবে, নাকি বাঁদিকের পাত্রে গিয়ে মুখ দেবে? যদি লাল পাত্রেই মুখ দেয়, তাহলে বুঝতে হবে লাল আর কমলা রঙের তফাত বুঝতে পারে এই প্রাণী। অবশ্যই এক বার মাত্র পাত্রের জায়গা বদল করে এই সিদ্ধান্তে আসা যাবে না, বার বার করে পরীক্ষা করে দেখতে হবে।

এই ধরণের পরীক্ষা-নিরীক্ষা সবচেয়ে বেশি হয়েছে স্তন্যপায়ী প্রাণী এবং কীট-পতঙ্গদের ওপরে। জানা গেছে, কিছু কিছু প্রজাতির বানরের বর্ণচেতনা মোটামুটি মানুষের মতোই। রঙের তফাত বোঝার ক্ষমতা বেড়ালের অনেক কম। পাখি এবং মাছেরা রঙ খুব ভালো বোঝে, কারণ এরা রঙ দিয়ে খাদ্য চেনে। সবুজ পাতার মধ্যে কোথায় নীল ফুলটা ফুটে আছে, তা দেখতে না পেলে পাখির খাবার জোটানো অসুবিধে হবে।

কীট-পতঙ্গদের চোখ সাধারণত মানুষ বা স্তন্যপায়ী প্রাণীদের চোখের তুলনায় অনেক জটিল হয়। আমাদের চোখের মণি একটাই, কিন্তু পোকামাকড়দের থাকে পুঞ্জাক্ষি। এই পুঞ্জিত চোখের সব দিকই সমান দেখে তা নয়, রঙের অনুভূতিও সব দিকে সমান নয়।

রঙের অনুভূতি সমান নয় — এই কথাটার দু রকমের অর্থ হতে পারে। একটি অর্থ হলো, আমরা মানুষেরা যে তরঙ্গদৈর্ঘ্যের সীমার মধ্যে দেখতে পাই, অন্য কোনো প্রজাতির প্রাণীর ক্ষেত্রে সীমাটা ঠিক সেই রকম নাও হতে পারে। ৪০০ ন্যানোমিটারের চেয়ে ছোটো বা ৭০০ ন্যানোমিটারের চেয়ে বড়ো তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলোও দেখতে পাচ্ছে কোনো প্রাণী, তা হওয়া মোটেই অসম্ভব নয়। কোনো কোনো সাপ, পিরানহা জাতীয় মাছ এবং কয়েক ধরণের চিঙড়ির চোখ অবলোহিত রশ্মিতে সাড়া দেয়, সে কথা জানা

আছে। তেমনি আবার এও জানা আছে যে ঈগল জাতীয় নানান পাখি, অনেক ভ্রমর এবং চিঙড়িমাছ অতিবেগুনি রশ্মিতে দেখতে পায়।

অন্য যে তফাতটা হয় প্রাণীভেদে তা হলো, এই যে তিন রকমের অণুর কথা আমরা বলছি, সমস্ত প্রাণীর চোখেই যে সেই তিন রকমের অণুই আলো শোষে তা মনে করার কোনো কারণ নেই। কোনো প্রাণীর চোখে যদি অণুর রকমফের কম হয়, তাহলে সাধারণত মানুষ যে সব রঙ দেখতে পায় তার মধ্যে কিছু কিছু রঙের তফাত তারা করতে পারবে না — বর্ণান্ধ মানুষের যে রকম পরিস্থিতিতে পড়তে হয় তাদেরও সে রকম হবে।

আবার উল্টোটাও হয়। অর্থাৎ অনেক প্রাণীর চোখে আলো শুষে নেওয়ার জন্য তিন রকমের বেশি অণু থাকে। চার, পাঁচ, এমনকি আট রকমের অণুর সন্ধানও পাওয়া গেছে। এই সব প্রাণী যে রকমভাবে রঙ দেখে, তা আমরা কল্পনাও করতে পারবো না। যেমন ধরা যাক, লাল আর নীলের মিশ্রণে ময়ূরপঙ্খী রঙ দেখার যে অনুভূতি, তা কোনো একটি তরঙ্গদৈর্ঘ্যের রঙে হয় না। যে প্রাণীর চোখ আট রকম অণুর সাহায্যে রঙ চেনে, তাদের কাছে হয়তো লাল আর সবুজ একসাথে দেখার অনুভূতি হলুদ রঙ দেখার অনুভূতির তুলনায় আলাদা। এরা তাই রঙের যতো রকম বৈচিত্র্য দেখতে পাবে, তা মানুষের অভিজ্ঞতার বাইরে। এদের কাছে মনে হবে, সমস্ত মানুষই বর্ণান্ধ।

ওরে ও ভাই মজার কথা বলবো কী আর তোকে
'মানুষ সবার সেরা' বলে গর্ব করে লোকে।
কিন্তু কতো ক্ষুদ্র প্রাণী
দেখে তাদের অবাক মানি
কতো জটিল রঙের বাহার দেখতে পারে চোখে।

২১ : রঙের যোগ-বিয়োগ

পলাশ বরন পাল

বছর চল্লিশেক আগে, যখন আমি ছোট্টো ছেলে ছিলাম, তখন নানা রঙের ছবিভরা বইয়ের খুব একটা চল ছিলো না। পুজোর সময়ে অল্পবয়েসীদের জন্য শারদ সংকলন বার হতো, তার মধ্যে রঙিন ছবি থাকতো গোনাগুনতি কয়েকখানা। সেগুলোকে এতোই মূল্যবান মনে করা হতো তখন যে বইয়ের সূচিপত্রে আলাদা করে সেগুলোর উল্লেখ করা হতো। তাতে একটা কথা দেখে খুব অবাক হতাম। 'দ্বিবর্ণ' ছবির সূচি থাকতো, 'ত্রিবর্ণ' ছবিরও থাকতো, কিন্তু তার বেশি সংখ্যক রঙের উল্লেখ থাকতো না। অথচ যে ছবিকে ত্রিবর্ণ বলা হতো, তার দিকে তাকালে আমরা তো তিনটের অনেক বেশি রঙ দেখতে পেতাম! তাহলে ত্রিবর্ণ বলা হতো কেন?

আর একটু বড়ো হওয়ার পরে ইশকুল-কলেজে নাটক করতে গিয়ে দেখেছি, মঞ্চে আলো ফেলার জন্য ব্যবহার করা হয় তিন রঙের তিনটি কাচ বা স্বচ্ছ প্লাস্টিক। একটি লাল, একটি নীল, একটি সবুজ। সাদা বা প্রায় সাদা বাতির আলোয় আলোকিত করা হয় মঞ্চ। যখন লাল আলো দরকার হয়, তখন সেই সাদা বাতির সামনে ধরা হয় লাল প্লাস্টিক। নীল রঙের প্লাস্টিক ধরলে মঞ্চ নীল দেখায়, সবুজ ধরলে সবুজ।

আর যখন অন্য কোনো রঙের আলো দরকার হয়? সব রকম রঙের জন্য আলাদা আলাদা প্লাস্টিক থাকে না। লাল-নীল-সবুজ মিশিয়ে মিশিয়ে কাজ চলে। সাদা বাতির আধেকটা যদি নীল প্লাস্টিকে ঢাকা হয় আর বাকি আধেকটা সবুজে, তাহলে মঞ্চে আমরা যে রঙ দেখি তা নীল আর সবুজের মাঝামাঝি — অনেকটা তুঁতের মতো। বাতিটিকে লাল আর সবুজ দিয়ে আধাআধি করে ঢাকলে মঞ্চের আলো হয় হলুদ রঙের।

অনেক মঞ্চে সাদা আলো থাকেই না, থাকে শুধু লাল নীল সবুজ এই তিন রঙের তিনটি বাতি। যে কোনো একটাকে জ্বালালে সেই রঙের আলোয় ভেসে যায় মঞ্চ। এই মঞ্চে সাদা আলো পেতে হলে অনেক মেহনত — তিন রঙের তিনটি বাতিই জ্বালিয়ে রাখতে হয়। নীল আর সবুজ এই দুটি বাতি জ্বালালে তুঁতে রঙের আলো পাওয়া

যায়, লাল সবুজ একসঙ্গে জ্বালালে হলুদ। লাল-নীল একসাথে ধরলে আলোর রঙ হয় ময়ূরপঙ্খী, অর্থাৎ লাল-নীলের মাঝামাঝি। এই রঙটির কথায় পরে আবার আসবো।

ব্যাপারটা কিন্তু এমন নয় যে সত্যি সত্যি দুটো রঙের আলো মিশে তাদের দুটোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য মিলেমিশে তৃতীয় কোনো তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলো হয়ে যাচ্ছে, তাই নতুন রঙ হয়ে যাচ্ছে। আসলে দুটি রঙের আলো এসে পড়ার ফলে আমাদের চোখে যে অনুভূতি হয়, তৃতীয় একটি রঙের আলো এসে পড়লেও সেই রকমই অনুভূতি হতো। চোখ তাই দুটি আলোর মিশ্রণের সঙ্গে অন্য একটি রঙের আলোর কোনো তফাত কার্যত করতে পারে না। অর্থাৎ রঙ মিশিয়ে রঙ দেখার রহস্যটা *শুধু* রঙের মধ্যে নেই, আছে আমাদের চোখের মধ্যেও।

আগেই বলা হয়েছে, চোখের পেছনের পর্দায় আলো এসে পড়লে তবেই আমাদের দেখার অনুভূতি হয়। এই পর্দায় গোঁজের মতো ছুঁচোলো দেখতে কোষগুলোতে বাইরে থেকে আসা আলো শুষে নেওয়ার জন্য তিন রকমের অণু থাকে। আমরা তাদের ডাকছিলাম A, B আর C নামে। এই অণুগুলির বৈশিষ্ট্য হলো, তারা বিভিন্ন রঙের আলো শুষে নেয় বিভিন্ন পরিমাণে। বিভিন্ন তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলোর বেলায় এই তিন রকমের অণুর আনুপাতিক সক্রিয়তা কী কী রকম তা (১৪৮-পৃষ্ঠায়) ৩০ নম্বর ছবি থেকে পড়ে নেওয়া যায়। তিনটি বিশেষ তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলোর জন্য অনুপাতগুলো কেমন হয়, তা খোলসা করে লিখে দেওয়া হলো ৪ নম্বর ছকে। এটাও লক্ষ করা যাক, যে যে তরঙ্গদৈর্ঘ্য দেওয়া হয়েছে, তার একটিতে আলোর রঙ নীল, একটিতে সবুজ, একটিতে লাল।

মনে করা যাক ৪৬০ ন্যানোমিটার তরঙ্গদৈর্ঘ্যওয়ালা (অর্থাৎ নীল রঙের) একটা আলো এসে পড়ছে চোখে। প্রতি সেকেন্ডে যতো পরিমাণ আলো চোখের পর্দায় এসে পড়ছে, তাকে যদি ১০০ ভাগে ভাগ করে নিই, তাহলে তার ১৭ ভাগ শুষে নিচ্ছে A অণু, ৪৪ ভাগ নিচ্ছে B অণু, আর ৩৯ ভাগ C অণু। A, B আর C অণুগুলির সাড়া এইরকম ১৭:৪৪:৩৯ অনুপাতে হলে আমাদের মস্তিষ্কে সেটা নীল রঙের অনুভূতি সৃষ্টি করে। ঠিক তেমনি, ৬৬০ ন্যানোমিটার তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলো চোখে পড়লে C অণুরা নিষ্ক্রিয় থাকবে, আলোর শতকরা ৯৪ ভাগ শুষে নেবে A অণু আর ৬ ভাগ শুষবে B অণু। অর্থাৎ চোখের পর্দায় থাকা A, B আর C অণুগুলিতে যদি কোনো আলো ৯৪:৬:০ এই অনুপাতে সাড়া জাগায়, তাহলে সেই আলো আমাদের চোখে দেখাবে লাল।

এইবার ধরা যাক, ৫৪০ ন্যানোমিটারের একটা সবুজ আলো আর ৬৬০ ন্যানোমিটারের একটা লাল আলো একই সঙ্গে এসে পড়লো চোখে। দুটো তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলোই সমান পরিমাণে আসছে ধরা যাক। প্রথমটার, অর্থাৎ সবুজ আলোটার থেকে যতো আলো আসছে তাকে যদি ১০০ ভাগ করি, তার মধ্যে ৪১ ভাগ শুষে নিচ্ছে

৪ নং ছক ॥ *মৌলিক রঙ।*

রঙ	তরঙ্গদৈর্ঘ্য (ন্যানোমিটারে)	অনুপাত		
		A	B	C
নীল	৪৬০	১৭	৪৪	৩৯
সবুজ	৫৪০	৪১	৫৯	০
লাল	৬৬০	৯৪	৬	০

A অণু আর ৫৯ ভাগ B অণু। আর দ্বিতীয়টার থেকে যে আলো চোখে আসছে, তার ১০০ ভাগের মধ্যে ৯৪ ভাগ শুষছে A অণু, ৬ ভাগ B অণু। অতএব দুটো তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলোতে মোট যে ২০০ ভাগ হলো, তার মধ্যে ৪১ + ৯৪ বা ১৩৫ ভাগ শুষে নিচ্ছে A অণু, বাকি ৬৫ ভাগ B অণু। C অণু কিছুই করছে না। শতাংশের হিসেব করলে দাঁড়াচ্ছে, তিন রকমের অণুর কার্যকারিতার অনুপাত ৬৭$\frac{১}{২}$: ৩২$\frac{১}{২}$: ০। এইবার (১৪৮পৃষ্ঠায়) ৩০ নম্বর ছবির দিকে তাকালেই দেখা যাবে, মোটামুটি ৫৯০ ন্যানোমিটারের একটি আলোর উৎস যদি থাকতো, তা থেকে আলো এলেও বিভিন্ন অণু ওই একইভাবে কাজ করতো। সেইজন্য ৫৪০ আর ৬৬০ ন্যানোমিটারের দুটো আলোর মিশ্রণের সঙ্গে ৫৯০ ন্যানোমিটারের আলোর, অর্থাৎ হলুদ আলোর তফাত করতে পারে না আমাদের চোখ। লাল আর সবুজ মিশে হলুদ দেখায়। তেমনি, ৪৬০-এর নীল আর ৫৪০-এর সবুজ যদি একসঙ্গে এসে পড়ে, তাহলে তিন রকমের অণু সেই আলোকে যে ভাবে শুষে নেবে, ৪৮০ ন্যানোমিটারের আলো এলেও মোটামুটি সেই রকমই করতো। ৪৮০ ন্যানোমিটারের আলোর রঙ নীলচে সবুজ বা তুঁতের মতো, তাই নীল আর সবুজ মিশে তুঁতে রঙ হয়।

এগুলো অবশ্য সবই সমান সমান মিশ্রণের কথা। যে দুটো আলো মেশাচ্ছি তাদের ঔজ্জ্বল্য সমান নাও হতে পারে। লাল আর সবুজ যখন মেশানো হচ্ছে তখন তার মধ্যে সবুজটা যদি বেশি জোরালো হয়, তাহলে মিশ্রণের রঙটা হলুদের তুলনায় আরো সবুজ-ঘেঁষা হবে, অর্থাৎ কচি কলাপাতার মতো হবে খানিকটা। যদি দুইয়ের মধ্যে লালটা বেশি জোরালো হয়, তাহলে মিশ্রণের রঙটা লাল-হলুদের মাঝামাঝি, কমলা জাতীয় হবে। নীল আর সবুজ মেশালেও একই রকম ব্যাপার হবে — নীলের জোর বেশি থাকলে তুঁতে রঙের চেয়ে মিশ্রণটা নীল-ঘেঁষা হবে, সবুজের জোর বেশি থাকলে সবুজ-ঘেঁষা হবে। যে কোনো তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলোই চোখে এসে পড়লে চোখের পর্দার যে অণু যে রকমভাবে সেই আলো শুষে নিতো, ৪ নম্বর ছকে দেখানো তিনটি রঙের আলো পরিমাণমতো মেশাতে পারলে মোটামুটি সেই একই অনুভূতি হয়। অর্থাৎ সমস্ত রঙই

৫ নং ছক॥ *বিভিন্ন মৌলিক রঙের আলো সম-পরিমাণে যোগ করলে কী হয়।*

নীল	+ সবুজ		=	তুঁতে
	সবুজ	+ লাল	=	হলুদ
নীল		+ লাল	=	ময়ূরপঙ্খী
নীল	+ সবুজ	+ লাল	=	সাদা

ছকে দেখানো তিনটি রঙ মিশিয়ে তৈরি করা যায়। এই জন্যই ওই ছকে এই তিনটি রঙকে বলা হয়েছে *মৌলিক* রঙ।

সমান সমান লাল আর নীল মেশালে কী হবে? ৪ নম্বর ছক থেকে দেখতে পাচ্ছি, এই মিশ্রণ থেকে তিন রকমের অণু যে আলো শুষবে তার অনুপাত হবে মোটামুটি ৫৫ : ২৫ : ২০। এ অনুপাত কোনো একটি দৈর্ঘ্যের আলোকতরঙ্গের পক্ষে তৈরি করা সম্ভব নয়, (১৪৮পৃষ্ঠায়) ৩০ নম্বর ছবির দিকে ভালো করে তাকালেই তা বোঝা যায়। A অণুর অবদান ৫৫ শতাংশ হয় ৫৮০ ন্যানোমিটারের কাছাকাছি, কিন্তু সেখানে বাকিটা পুরোটাই B, সেখানে C-এর কোনো অবদান থাকে না। তার মানে, সমান পরিমাণ লাল আর নীল মিশিয়ে যে রঙ পাওয়া যাবে, সেটা নিতান্তই মিশ্র রঙ — একটি কোনো তরঙ্গদৈর্ঘ্য দিয়ে তাকে বোঝানো যায় না। বাংলায় অনেক সময়ে এই রঙটিকে 'বেগুনি' বলা হয়, কিন্তু এই নাম বিভ্রান্তিকর, কারণ সবচেয়ে ছোটো যে তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলো দেখতে পাওয়া যায় তার রঙকে বলা হয় বেগুনি। এর সঙ্গে যাতে গুলিয়ে না যায়, তাই সমান সমান লাল আর নীলের মিশ্রণকে আমরা বলছি ময়ূরপঙ্খী রঙ। তেমনি, তিনটে মৌলিক রঙকে সমান সমান মেশালে যে রঙের আলো পাওয়া যায়, একটি তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলো দিয়ে সেই ফলাফল পাওয়া সম্ভব নয়। এই মিশ্রণটাই হলো সাদা রঙ। তাহলে বিভিন্ন মৌলিক রঙ সমান সমান পরিমাণে মেশালে যে যে রঙ তৈরি হয় তাদেরকে এক ঝলকে দেখে নেওয়া যাক একবার, ৫ নম্বর ছক থেকে। এই ছক আমাদের বলছে, হলুদ আলো বানাতে গেলে সমান ঔজ্জ্বল্যের লাল আর সবুজ আলো মেশাতে হবে, নীল থাকবে না। তুঁতে রঙ চাইলে মেশাতে হবে নীল আর সবুজ। ইত্যাদি ইত্যাদি। মঞ্চে যাঁরা আলোকসম্পাত করেন, তাঁদেরকে এই কথাগুলোই মনে রাখতে হয়।

মৌলিক রঙগুলোর ঔজ্জ্বল্য যদি অসমান হয়, তাহলে কী কী রঙের বৈচিত্র্য হতে পারে, তার আভাস আমরা আগেই দিয়েছি। লালের এক ভাগের সঙ্গে যদি সবুজের আধ' ভাগ নেওয়া যায়, তাহলে যে রঙ তৈরি হবে তা হলুদ আর লালের মাঝামাঝি, অর্থাৎ কমলা। তিন রঙের তিনটি বাতি দিয়ে মঞ্চে যাঁরা আলোকসম্পাত করেন, তাঁরা

কমলা রঙের জন্য লাল রঙের বাতিটা পুরো জ্বালাবেন, সবুজ বাতির সঙ্গে লাগানো রেগুলেটর দিয়ে তার ঔজ্জ্বল্য আধেক করে দেবেন। লালের ঔজ্জ্বল্য সমান রেখে যদি সবুজের ঔজ্জ্বল্য ক্রমশ কমানো যায়, তাহলে যোগফলে যে রঙ হবে তা ক্রমশ লালের দিকে সরবে। উল্টোদিকে, সবুজের ঔজ্জ্বল্য পুরোপুরি রেখে লালকে যদি রেগুলেটর দিয়ে কমানো যায়, তাহলে হলুদ আর সবুজের মাঝামাঝি রঙ আসতে শুরু করবে, যার মধ্যে কচি কলাপাতা ইত্যাদি রঙ আছে।

আমাদের ছোটোবেলার কথা দিয়ে শুরু করেছিলাম। এখনকার কথা ভাবলে হয়তো মঞ্চে আলো মেশানোর কথা না বলে বলতাম রঙিন টেলিভিশনে কী করে বিভিন্ন রঙ আসে সেই কথা — কারণ এই যন্ত্রটি আমরা অনেকেই রোজ দেখি, দিব্যি বাড়িতে বসেই। এতেও তিন রঙের আলো মেশানো হয়। তবে মেশানোর কায়দা অন্য। টেলিভিশনের পর্দায় থাকে অজস্র সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বাতি। পেছন থেকে একটি ইলেকট্রনের স্রোত এসে প্রতি মুহূর্তে তার মধ্যে একটি বাতিকে আলোকিত করে। কিন্তু এই যে 'মুহূর্ত' কথাটা ব্যবহার করলাম, এর স্থায়িত্ব খুবই কম — মোটামুটি সেকেন্ডে ৩০ বার বদলাতে পারে এই রঙ। আমাদের চোখ আবার অতো তাড়াতাড়ি বদল হলে তা বুঝতে পারে না, একবার যা দেখছে তার রেশ চোখে থেকে যায় $\frac{১}{১০}$ সেকেন্ড ধরে। তাই $\frac{১}{৩০}$ সেকেন্ড অন্তর-অন্তর যখন ইলেকট্রনের স্রোত পর্দার নানা জায়গা আলোকিত করতে থাকে তখন আমরা আলাদা করে প্রতি মুহূর্তের আলো দেখতে পাই না, ও রকম অনেক 'মুহূর্তের' সম্মিলিত ফলাফলটাই আমাদের মাথায় গিয়ে ঢোকে। অর্থাৎ মঞ্চের মতো একই সঙ্গে নয়, বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রঙের আলো আসে টেলিভিশনে, কিন্তু এতো ঝটপট সে বদল হয়ে যায় যে আমাদের চোখ সময়ের তফাতটা ধরতে পারে না, ভাবে একই সঙ্গে একাধিক মৌলিক রঙের আলো জ্বলছে। এই একাধিক মৌলিক রঙের মিশ্রণে চোখে যে রঙের অনুভূতি হতো, সেই রকমই হয়।

ব্যাপারটা হাতেনাতে বোঝার জন্য একটি খুব সহজ উপায় আছে। একটা লাট্টুর গায়ে সমান সমান ভাগ করে তাতে লাল-সবুজ-নীল রঙ করে দেওয়া হলো। এবার লাট্টুটাকে বেশ জোরে ঘোরালে লাট্টুর রঙ সাদা দেখায়। যদি শুধু লাল আর সবুজ থাকে, তাহলে ঘুরন্ত লাট্টুতে হলুদ রঙ দেখা যায়। টেলিভিশনের পর্দার মতো এখানেও রঙের বদল এতো তাড়াতাড়ি হয় যে চোখ সেই বদল ধরতে পারে না, সব রঙ মিলিয়ে যে অনুভূতি হয় সেইটাই দেখছি বলে মনে হয়।

অবশ্য একটু ভেবে দেখলে বোঝা যায়, লাট্টুর উদাহরণটার জাত আলাদা। টেলিভিশনের পর্দা থেকে আলো বেরোচ্ছে, সেই আলো আমরা দেখছি। লাট্টু কিন্তু নিজে আলো বিকিরণ করছে না। লাট্টুর ওপর রোদ্দুর এসে পড়ছে, বা অন্য কোনো উৎস থেকে আলো আসছে, সেই আলো প্রতিফলিত হয়ে লাট্টুর থেকে আমাদের চোখে আসছে। লাট্টুর গায়ে যে রঙ করা হয়েছে, তার ফলে কোনো কোনো রঙের আলো

৬ নং ছক ॥ পূরক রঙ।

সাদা	–	লাল	=	তুঁতে
সাদা	–	নীল	=	হলুদ
সাদা	–	সবুজ	=	ময়ূরপঙ্খী

শোষিত হচ্ছে সেখানে, বাদবাকিটা প্রতিফলিত হচ্ছে। এই যে 'বাদবাকি' কথাটা বললাম, তা থেকেই বোঝা যাচ্ছে যে এখানে রঙের যোগ হচ্ছে না, হচ্ছে বিয়োগ।

হয়তো লাট্টুর বেলায় এ কথা না ভাবলেও চলে, সাদা আলোতে ধরা হলে লাট্টুর যে অংশ থেকে যে রঙ প্রতিফলিত হচ্ছে সেই অংশটিকে সেই রঙের উৎস হিসেবে ভাবলেই চলে। কিন্তু রঙিন ছবি যখন ছাপা হচ্ছে সাদা পাতার ওপর, তখন রঙের বিয়োগের কথা না ভেবে উপায় নেই। কারণ, রঙিন ছবি লাট্টুর মতো ঘুরছে না। সেখানে রঙের যোগ করতে হলে একই জায়গায় বিভিন্ন রঙের ছাপ ফেলতে হবে। তিনটি মৌলিক রঙ যোগ করে করে এ কাজ হবে না। ধরা যাক আমরা এক জায়গায় হলুদ রঙ ছাপতে চাই। আগের আলোচনা থেকে আমরা জানি যে, লাল আর সবুজ আলো মিশে হলুদের অনুভূতি হয়। সেই কথা মনে রেখে আমরা একটা লাল ছাপ দিলাম, তার ওপরে সবুজ ছাপ মারলাম। তাহলে সব মিলিয়ে ব্যাপারটা দাঁড়ালো এই রকম নিচে সাদা পাতা, তার ওপরে এক প্রস্থ লাল কালি, তার ওপরে সবুজ কালি। এতে কি লাল আর সবুজ রঙ মিশবে? মিশবে না, কারণ ছাপার কালি পুরোপুরি স্বচ্ছ নয়। সাদা আলোতে যদি এই ছাপাটিকে রাখা যায়, সাদা আলোর শুধুমাত্র সবুজ অংশটি সবুজ কালির মধ্যে দিয়ে চলে যেতে পারবে। তার নিচে থাকবে লাল কালির পোঁচ, যার মধ্যে দিয়ে শুধু লাল কালিই যেতে পারে। ওপরের স্তর ভেদ করে আসা সবুজ আলো তাই এই লালের মধ্যে আটকে যাবে, শেষ পর্যন্ত সাদা পাতা থেকে ঘুরে আর কোনো আলোই আমাদের চোখে ফেরত আসবে না। অর্থাৎ জায়গায়টা কালচে দেখাবে। জলরঙের বাক্স থেকে লাল রঙের ওপরে সবুজ রঙের পোঁচ দিলে সব মিলিয়ে এ রকম কালোই দেখায়, কারণ এখানে রঙের যোগ হয় না। মিশকালো দেখায় না হয়তো, তার কারণ জলরঙ বা যে কোনো আঁকার রঙ যে সব উপাদান দিয়ে তৈরি হয় তার রঙ খুব বিশুদ্ধ হয় না, অর্থাৎ যেটাকে সবুজ রঙ বলা হচ্ছে তার মধ্যে দিয়ে সবুজ ছাড়া বর্ণালির অন্যান্য রঙও খানিক খানিক যেতে পারে। তাই সবুজ রঙের স্তর ভেদ করে স্তরের মধ্যে দিয়ে যে আলো ঢুকে যেতে পারবে তার মধ্যে লালেরও ছিটেফোঁটা থাকবে, লাল রঙের স্তর পার হয়ে সাদা পাতায় প্রতিফলিত হয়ে তাই সামান্য আলো আমাদের চোখে ফেরত আসবে।

যাই হোক, কালো না দেখিয়ে একটু ফ্যাকাশে রঙ দেখালেও আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে না, অর্থাৎ লাল আর সবুজ যোগ করে হলুদ আমরা পাবো না। কারণ দুটো রঙ একের ওপর এক চাপালে সেই দুটো রঙের আলোর যোগফল আমরা দেখতে পাই না। ছবি ছাপানোর ক্ষেত্রে তাই অন্য উপায় অবলম্বন করতে হয়।

উপায়টি কী, তার আভাস আগেই দিয়েছি, বলেছি যে রঙের বিয়োগের কথা এখানে মাথায় রাখতে হয়। সেটা কী, তা বুঝবার জন্য আবার ৫ নম্বর ছকের দিকে একটু তাকানো যাক। যেহেতু তিনটে মৌলিক রঙের আলো মিশিয়ে সাদা হয়, এবং লাল আর সবুজ মিলিয়ে হলুদ, তাই আমরা বলতে পারি যে সাদা আলো থেকে হলুদ অংশটি সরিয়ে নিলে যা পড়ে থাকবে সেটা নীলের মতো দেখাবে। একটু অন্যভাবে বলা যায়, হলুদ হলো নীলের পূরক রঙ, অর্থাৎ নীল বাদে বাকি দুটি মৌলিক রঙ মিশালে হলুদের অনুভূতি হয়। সব কটি মৌলিক রঙের পূরক রঙের ফর্দ সাজিয়ে দেওয়া হলো ৬ নম্বর ছকে।

ছবি ছাপানো হয় এই পূরক রঙগুলির কালি দিয়ে। ধরা যাক ছবির কোনো একটা জায়গায় লাল রঙ দেখতে পাওয়ার কথা। তাহলে সেখানে হলুদ আর ময়ূরপঙ্খী এই দুটি রঙের কালির ছোপ দেওয়া হবে। নীল রঙ ছাপতে চাইলে তুঁতে আর ময়ূরপঙ্খীর ছোপ, সবুজ চাইলে তুঁতে আর হলুদের।

কী করে এতে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হচ্ছে? সেটা উদাহরণ দিয়ে বোঝানো হয়েছে ৩২ নম্বর ছবিতে। ধরা যাক সাদা পাতার ওপরে হলুদ কালি দেওয়া হয়েছে প্রথমে, তার পরে তুঁতে কালি। ওপর থেকে সাদা আলো ফেলা হলো। সুবিধের জন্য এই আলোকে আমরা তিনটি মৌলিক রঙের আলোর সংমিশ্রণ হিসেবে ভাবতে পারি। এই আলো বইয়ের পাতায় ধাক্কা খেয়ে আমাদের চোখে এসে পড়লে তবেই পাতাটাকে আমরা দেখতে পাবো। ৩২ নম্বর ছবিতে দেখছি, বইয়ের পাতায় ধাক্কা খাওয়ার জন্য লাল-নীল-সবুজ আলোর এই মিশ্রণকে প্রথমে তুঁতে রঙের কালির মধ্যে দিয়ে যেতে হবে। ৫ নম্বর ছক থেকে আমরা জানি যে তুঁতে মানে নীল আর সবুজ, অর্থাৎ এই কালির স্তর ভেদ করে নীল এবং সবুজ আলো ওপারে চলে যাবে। এই পর্যায়ে তাহলে সাদা আলো থেকে লাল অংশটি বাদ পড়ে গেলো, বা বিয়োগ হয়ে গেলো। মোদ্দা কথা, নিচের স্তরে হলুদ রঙের কালিতে যে আলো গিয়ে পৌঁছোচ্ছে, তার মধ্যে শুধু নীল আর সবুজ এই দুটো মৌলিক রঙ আছে।

এইবার সেই আলোর পথ হবে হলুদ কালির মধ্যে দিয়ে। হলুদ মানে লাল যোগ সবুজ, অর্থাৎ তিনটি মৌলিক রঙের মধ্যে লাল আর সবুজ এই কালিতে শোষিত হয় না, নীল আলো হয়। যে আলো এখানে এসে পৌঁছেছিলো, তার মধ্যে যে নীল ছিলো তাকে টেনে নিলো এই হলুদ রঙের কালি। লাল তো আসেইনি, অতএব তার প্রশ্ন নেই। সবুজ এসেছিলো, সেটি এই কালির মধ্যে দিয়ে চলে যাবে, ধাক্কা খাবে পেছনের সাদা

৩২ নং ছবি। *পূরক রঙে ছাপা কীভাবে আমরা দেখি। বাঁ দিক থেকে সাদা আলো এসে পড়ছে। সাদা আলোকে ভাবা হচ্ছে তিনটি মৌলিক রঙের মিশ্রণ। ছবিতে বোঝানোর সুবিধের জন্য তিনটি রঙের রশ্মি দেখানো হয়েছে তিন জায়গায়, কিন্তু আসলে একই জায়গায় সব এসে পড়ছে। রঙিন কালির ছাপের মধ্যে দিয়ে সেই আলো শেষ অবধি ছবির ডান দিকে আমাদের চোখে আসছে। কালির স্তরগুলো এবং সাদা পাতাটিকে বেধড়ক পুরু করে আঁকা হয়েছে দেখবার এবং বোঝবার সুবিধের জন্য। প্রতিসরণও সামান্য হয়, তবে কালির স্তরগুলো এতোই সরু যে তার পরিমাণ ধর্তব্যই নয়। (এ ছবিটি রঙে দেখা যাবে ৪৮ ও ৪৯ পৃষ্ঠার মাঝখানে রঙিন ছবির জন্য নির্ধারিত আলাদা পাতায়।)*

পাতায়। সাদা পাতায় সব রঙের আলোই প্রতিফলিত হয়, তাই যে সবুজ আলো এসে পড়লো সেটাও প্রতিফলিত হবে। এবারে সেই আলোর ফিরতি যাত্রা। তাকে যেতে হবে প্রথমে হলুদ কালির স্তরের মধ্যে দিয়ে, তারপরে তুঁতেরঙা কালির মধ্যে দিয়ে। দুটোর মধ্যে দিয়েই সবুজ অবাধে যেতে পারে, কাজেই এই সব কালির স্তর পার হয়ে সেই সবুজ আলো বেরিয়ে আসবে বাইরে। সেখানে চোখ রাখলে আমরা তাই সবুজ দেখতে পাবো।

যে কোনো পূরক রঙ ছাপানো খুব সহজ — একটিমাত্র রঙের কালির ছোপ দিলেই কাজ শেষ। যেমন হলুদ ছাপতে চাইলে শুধু হলুদ কালি ফেললেই হলো। মৌলিক রঙগুলো পেতে গেলে দুটি পূরক রঙের কালি লাগে। দুটি কালি সমান অনুপাতে ফেললে মৌলিক রঙ পাওয়া যায়। কম-বেশি করে কালি ফেললে মৌলিক রঙগুলো না হয়ে মাঝামাঝি কোনো রঙ হয়। এই জন্য তিনটি রঙ দিয়ে যাবতীয় রঙ ছাপা যায়, সেই জন্য ছাপা ছবি ত্রিবর্ণ হওয়া মানেই বহুবর্ণ হওয়া।

যদি তিনটি রঙের কালিই সমান পরিমাণে ফেলা হয় ছবির মধ্যে কোথাও? আগে যে যুক্তি দেওয়া হয়েছে, তা একটু যত্ন করে অনুসরণ করলেই বোঝা যাবে, এখানে কালো দেখতে পাওয়া উচিত। কিন্তু দুটি কারণে এইভাবে তিনটি পূরক রঙ ফেলে কালো রঙ ছাপানো হয় না। প্রথম কারণটা আগেই বলেছি — অবশোষণ যদি ভালোভাবে না হয় তাহলে সব মিলিয়ে মিশকালো দেখাবে না, ঝাপসা বা ফ্যাকাশে রঙ মনে হবে। দ্বিতীয় কারণ হলো, কালো কালি এতোই সহজে এবং এতোই শস্তায় তৈরি করা যায়

যে, বেশি ব্যয়সাপেক্ষ তিনটি রঙের কালি মিশিয়ে কালোর কাজ চালানো নির্বুদ্ধিতা। সেই কারণে ছাপার কাজে ব্যবহার করা হয় চার রকমের কালি — কালো এবং তিনটি পূরক রঙের। ইংরিজিতে তুঁতে এবং ময়ূরপঙ্খী রঙকে যথাক্রমে cyan এবং magenta বলা হয়, আর হলুদ তো yellow। এই তিনটি রঙের নামের আদ্যাক্ষর নিয়ে হলো CMY, আর তার সঙ্গে কালোর জন্য K, সবসুদ্ধ রঙিন ছাপার এই পদ্ধতিকে বলা হয় CMYK ছাপা।

প্রশ্ন উঠতে পারে, — কালোর জন্য K আসছে কোথেকে? কালোর ইংরিজি প্রতিশব্দ তো black, তা তো K দিয়ে শুরু হয় না! অন্যান্য প্রভাবশালী ইউরোপীয় ভাষা যেগুলো, তার কোনোটিতেও এ রহস্যের উত্তর পাওয়া যাবে না। B বললে blue বা brown-এর সঙ্গে গুলিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা ছিলো বলেই নিশ্চয়ই black-এর আগা না নিয়ে শেষ থেকে K-টাকে নেওয়া হয়েছে। আমরা অবশ্য আমাদের মতো করে ভাবতে পারি, বাংলা '*কালো*' থেকেই K বর্ণটি এসেছে। এটা আসল কারণ নয় ঠিকই, তবু অন্তত মনে রাখার সুবিধের জন্য আমরা যদি এ রকম ভাবি, ক্ষতি তো নেই!

লাল নীল আর সবুজ আলোর রঙগুলি যে মুখ্য
তাদের যোগে বানানো যায় কতো না রঙ সূক্ষ্ম।
হলুদ, ময়ূরপঙ্খী, তুঁতে
এদের নানা অনুপাতে
ছাপানো হয় আর যতো রঙ, থাকেনা তাই দুঃখ।

২২ : অন্ধকারের রঙ

শেখর গুহ

শরৎচন্দ্র তাঁর 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসে অন্ধকারে দেখার একটা অতি সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন এই ভাবে :

> রাত্রির যে একটা রূপ আছে, তাহাকে পৃথিবীর গাছ-পালা, পাহাড়-পর্বত, জল-মাটি, বন-জঙ্গল প্রভৃতি দৃশ্যমান বস্তু হইতে পৃথক করিয়া দেখা যায়, ইহা যেন আজ প্রথম চোখে পড়িল। চাহিয়া দেখি, অন্তহীন কালো আকাশতলে পৃথিবী-জোড়া আসন করিয়া গভীর রাত্রি নিমীলিত চক্ষে ধ্যানে বসিয়াছে, আর সমগ্র বিশ্বচরাচর মুখ বুজিয়া নিঃশ্বাস রুদ্ধ করিয়া অত্যন্ত সাবধানে স্তব্ধ হইয়া সেই অটল শান্তি রক্ষা করিতেছে। হঠাৎ চোখের উপর যেন সৌন্দর্যের তরঙ্গ খেলিয়া গেলো। মনে হইল কোন মিথ্যাবাদী প্রচার করিয়াছে, আলোরই রূপ, আঁধারের রূপ নাই? এই যে আকাশ বাতাস, স্বর্গ-মর্ত্য পরিব্যাপ্ত করিয়া দৃষ্টির অন্তরে বাহিরে আঁধারের প্লাবন বহিয়া যাইতেছে, মরি মরি, এমন রূপের প্রস্রবণ আর কবে দেখিয়াছি?

জেগে থাকার সময়ে মানুষ সাধারণত একেবারে ঘুটঘুটি অন্ধকারে খুব বেশিক্ষণ থাকে না। কিন্তু আলোয় ভরা জায়গা থেকে হঠাৎ খুব অন্ধকার জায়গায় এলে খোলা চোখেও খানিকক্ষণ যে কিছুই দেখা যায় না, আর তারপর ধীরে ধীরে চোখ সেই অন্ধকারে অভ্যস্ত হয়ে গেলে অতি অল্প ছিটেফোঁটা আলোতেও জিনিশপত্র মোটামুটি বোঝা যায়, সে অভিজ্ঞতা সকলেরই আছে। ওই আঁধারে অভ্যস্ত হওয়া চোখে লাল, নীল, সবুজ রঙগুলিকে আলাদা করা যায় না — সবই হয় সাদা নয় কালো লাগে। আঁধার-দৃষ্টি এরকম রঙ-কানা হয় কেন?

য়ান ইভাঙ্গেলিস্তা পুর্কিনিয়ে নামে এক বহুমুখী প্রতিভাবান বিজ্ঞানী এই বিষয় নিয়ে অনেক চিন্তা করেছিলেন। ১৭৮৭ খ্রিস্টাব্দে মধ্য ইউরোপের বোহেমিয়া অঞ্চলে তাঁর জন্ম

হয়েছিলো — এখন সেখানে চেক রিপাব্লিক নামে দেশ। একদিন ভোরবেলা হাঁটতে বেরিয়ে তিনি নাকি লক্ষ করেছিলেন যে দিনের বেলা যেসব ফুল টকটকে লাল দেখায়, সূর্য ওঠার আগে ঊষার অল্প আলোতে সেগুলিই কেমন নীলচে লাগে। নানা পরীক্ষা করে তিনি দেখলেন যে একটা লাল জিনিশ আর একটা নীল জিনিশ পাশাপাশি রেখে সেগুলির উপরে পড়া আলোর পরিমাণ ক্রমশ কমিয়ে আনলে খুব অল্প আলোতে লাল জিনিশটা দেখাবে কালো মতোন, আর নীলটা দেখাবে ধূসর, সাদাটে। এই সব পর্যবেক্ষণ থেকে পুর্কিনিয়ে সিদ্ধান্ত নিলেন যে বেশি আর কম আলোতে আমাদের চোখ দুরকম ভাবে দেখে।

অনেক কাটা-ছেঁড়া করে চোখের বিভিন্ন অংশ সম্বন্ধে বিশদ ভাবে জানার পর দেখা গেল যে পুর্কিনিয়ে ঠিকই বুঝেছিলেন। বেশি আর কম, এই দুরকম আলোতে দেখার জন্য মানুষের চোখে দুরকম কোষ থাকে। (১৪৬পৃষ্ঠায়) ২৮ নম্বর ছবিতে আমরা দেখেছি এক ধরণের কোষের আকার একদিক ছুঁচোলো ঝালমুড়ির ঠোঙার মতো। এগুলিকে আমরা এখানে বলবো ছুঁচোলো কোষ। সাধারণ আলোতে, যেমন দিনের বেলা, এই ছুঁচোলো কোষগুলি দিয়েই দেখার কাজটা সম্পন্ন হয়। কিন্তু আলো কমে এলে, যেমন ঊষা বা গোধূলির সময় অন্য কোনো আলো জ্বালানো না হলে, ছুঁচোলো কোষগুলি তেমন ভালো কাজ করে না। তখন দেখার কাজে নামে চোখের পর্দায় থাকা আর এক ধরণের কোষ। এগুলির আকার ছোট ছোট লাঠির মতোন - তাই এগুলিকে আমরা বলবো লাঠি কোষ। আলো আরো কমে এলে ছুঁচোলো কোষগুলি একেবারেই নিস্কর্মা হয়ে যায়, শুধু লাঠি কোষগুলি দিয়েই তখন আমরা দেখতে পাই। ছুঁচোলো কোষগুলি যে তিন রকমের হয় আর ওগুলো দিয়েই যে আমরা বিভিন্ন রকম রঙ দেখি তার বিশদ আলোচনা আগের একটা পরিচ্ছেদে করা হয়েছে। লাঠি কোষগুলি মাত্র এক রকমেরই হয়। ওগুলিতে আলো পড়লে মস্তিস্কে যে সাড়া জাগে তা বিভিন্ন রঙের অনুভূতি সৃষ্টি করে না। তাই অন্ধকারে যখন শুধু লাঠি কোষগুলি কাজ করে তখন আমরা নানা রঙ আলাদা করে বুঝতে পারি না।

ওই কোষগুলির রাসায়নিক গঠন কীরকম তা মার্কিন বিজ্ঞানী জর্জ ওয়াল্ড ১৯৫০এর দশকে প্রচুর গবেষণা করে বের করেন। তিনি দেখান যে লাঠি ও ছুঁচোলো দুরকম কোষই রেটিনাল নামে একটা রঞ্জক পদার্থের সঙ্গে অপসিন নামে এক ধরণের প্রোটিন অণু যোগ করে তৈরি হয়। পর্ফিরপসিন, আয়োডপসিন আর সায়ানপসিন নামে তিন রকমের অপসিন রেটিনালের সঙ্গে জুড়ে তিন রকমের ছুঁচোলো কোষ তৈরি করে, যেগুলি যথাক্রমে লাল, সবুজ ও নীল আলো শুষে নেওয়ার কাজে বিশেষ রকম পারদর্শী। আর রেটিনালের সঙ্গে স্কোটপসিন নামে একটা অপসিন জুড়ে তৈরি হয় রোডপসিন অণু, যা দিয়ে লাঠি কোষগুলি গড়া। আমাদের শরীর সরাসরি রেটিনাল বানাতে পারে না, তার জন্য চাই ভিটামিন এ, যা আমরা পাই খাদ্য থেকে। দৃষ্টিশক্তি

ভালো রাখার জন্য যে গাজর, পালঙ শাক ইত্যাদি ভিটামিন এ-বহুল খাবার খাওয়া দরকার, জর্জ ওয়াল্ডের কাজে তার প্রমাণ পাওয়া গেলো।

আলোতে রোডপসিন অতি সংবেদনশীল --- অর্থাৎ খুব কম আলোও রোডপসিন অণুতে রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটাতে পারে। সেই পরিবর্তনটা আমাদের মস্তিষ্ক যখন অনুভব করে তখন আমরা 'দেখি'। পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে আলোর পরিমাণ কমতে কমতে যদি কেবল একটি মাত্র আলোকণায় এসে দাঁড়ায়, রোডপসিনের সহায়তায় মানুষের চোখ সেটাও দেখতে পারে। কিন্তু ওভাবে একটা দুটো আলোকণা দিয়ে তো আর জিনিশপত্র দেখা বা বোঝা যায় না। সাধারণত 'দেখা' বলতে যা বোঝায় সেই অর্থে কতোটা গাঢ় অন্ধকার অবধি আমরা দেখতে পারি? অন্ধকারেরও কি কোনো মাপ আছে?

সত্যি বলতে কী, আছে। মোমবাতির মিটমিটে আলো দিয়েই সে আলোচনাটা শুরু করা যাক। অন্ধকার ঘরে একটা সাধারণ মোমবাতি জ্বালিয়ে তার থেকে এক মিটার দূরে কোনো জিনিশ রাখলে, জিনিশটার ওপর যে পরিমাণ আলো এসে পড়ে, তার তীব্রতার মাপটা হলো এক লাক্স মতো। তীব্রতা বলতে বোঝায় একটা নির্দিষ্ট এলাকার ওপর কতোটা আলোর শক্তি এসে পড়ছে তার মাপটা। (লাক্স শব্দটা অবশ্যই বাজারে প্রচলিত সাবানের নাম থেকে আসেনি লাতিনে আলোকে বলে লুক্স, ওটা এসেছে তা থেকে।) দিনের বেলা সূর্যের আলোর তীব্রতা হলো এক লক্ষ লাক্স মতো। সরাসরি সূর্যের দিকটা বাদ দিয়ে দিনের বেলা বাকি আকাশ থেকে আসা আলোর তীব্রতা হয় ষোল হাজার লাক্স মতো। ঘন কালো মেঘে ঢাকা দিনে আলোর তীব্রতা এক হাজার লাক্সের চেয়েও কম হয়ে যেতে পারে। মেঘহীন দিনে সূর্যোদয় আর সূর্যাস্তর সময়ে, সূর্য যখন ঠিক দিগন্ত ছুঁয়েছে, আলোর তীব্রতা তখন হয় প্রায় চারশো লাক্স। সন্ধে হলে ঘরের ভিতর বিজলি বাতি জ্বালানো হয় --- সাধারণত তার তীব্রতা হয় পঞ্চাশ থেকে একশো লাক্স। জ্যোৎস্না ভরা পূর্ণিমা রাতে আলোর তীব্রতা খুব বেশি হলে একের পাঁচ অর্থাৎ ০·২ লাক্স। আর অমাবস্যার রাতে? বিজ্ঞানীরা মেপে দেখেছেন যে শুধু তারায় ভরা রাতের আকাশ থেকে আসা আলোর তীব্রতা হলো এক লাক্সের এক হাজার ভাগের এক ভাগ, অর্থাৎ এক মিলিলাক্স। খালিচোখে আকাশে যতোগুলি ফুটফুটে তারা দেখা যায় তাদের থেকে আসা আলোর পরিমাণ সব মিলিয়ে ওই এক মিলিলাক্সের সাত শতাংশ মাত্র। যেসব তারার আলো আরো ক্ষীণ, খালি চোখে যাদের দেখাই যায় না, সেগুলির সংখ্যা অনেক বেশি বলে তাদের সবগুলি থেকে আসা আলো হলো এক মিলিলাক্স আলোর ২৮ শতাংশ। সাত আর আঠাশ যোগ করে তো হয় পঁয়তিরিশ, তাহলে রাতের আকাশের বাকি ৬৫ শতাংশ আলো আসে কোথা থেকে?

রাতের আকাশে যে সূর্যের আলো একেবারেই পৌঁছোয় না তা নয়। পৃথিবীর উল্টোদিক থেকে আসা সূর্যের রশ্মি রাতের আকাশে বায়ুমণ্ডলের উপর দিকটা ছুঁয়ে
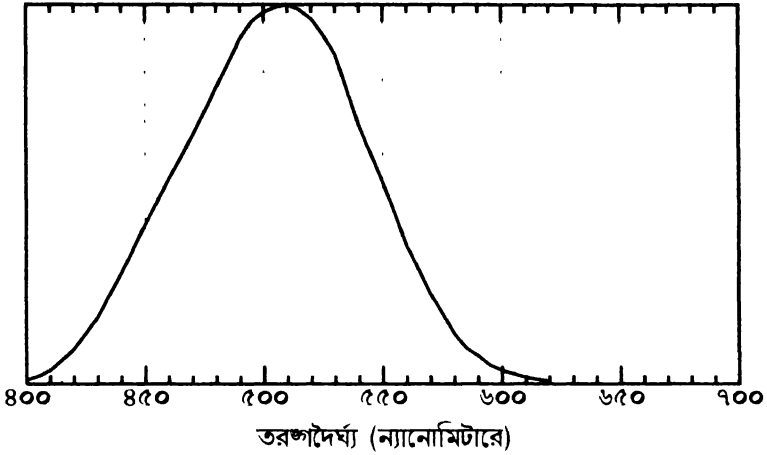
৩৩ নং ছবি॥ *বিভিন্ন তবঙ্গদৈর্ঘ্যে রোডপসিনের অণু কী রকম আলো শোষে।*

যায়। সে আলোতে যে অতিবেগুনি রশ্মি থাকে তার ধাক্কায় বায়ুমণ্ডলের অণু-পরমাণুগুলি উত্তেজিত হয়। সে উত্তেজনার শক্তিটা অণু-পরমাণুগুলি থেকে বেরিয়ে আসে সবুজ আলোর রূপে। রাতের আকাশের এই আলোকে বলা হয় *বায়ুদীপ্তি*। মেপে দেখা গেছে যে এই দীপ্তির পরিমাণ এক মিলিলাক্সের পনেরো শতাংশ মতো। পঁয়তিরিশের সঙ্গে এই পনেরো যোগ করে রাতের আকাশ থেকে আসা আলোর পঞ্চাশ শতাংশের হদিশ পাওয়া গেল। আর বাকি পঞ্চাশ? খুঁজে পেতে দেখা গেছে যে তার উৎস হল মহাকাশ। বুধ, শুক্র, পৃথিবী, মঙ্গল ইত্যাদি গ্রহগুলি মহাকাশে নিজের নিজের কক্ষপথে চলে। সে পথগুলি এবং তাদের মধ্যের জায়গাটা একেবারে পুরোপুরি ফাঁকা নয়। সেখানে ছুটে বেড়ায় সূর্য থেকে আসা অজস্র কণা। সেই কণাগুলি পরস্পরের সঙ্গে ধাক্কাধাক্কিতে উত্তেজিত হয় এবং সে উত্তেজনার শক্তির খানিকটা ফিরিয়ে দেয় আলোরূপে। এই মহাজাগতিক আলোই হলো রাতের আকাশ থেকে পাওয়া এক মিলিলাক্স আলোর বাকি আদ্ধেক।

আলোর তীব্রতা এক লাক্সের চেয়ে কম হলে ছুঁচোলো কোষগুলি সাড়া দিতে পারে না, তাই দেখার কাজটা শুধু লাঠি কোষগুলি দিয়েই সারতে হয়। লাঠি কোষের রোডপসিন এক মিলিলাক্সের চেয়ে অনেক কম আলোতেও সাড়া দেয়, তাই ভবঘুরে শ্রীকান্তর মাধ্যমে শরৎচন্দ্র অন্ধকার রাতে দেখার যে বর্ণনাটা দিয়েছেন তা মেনে নিতে আলোকবিজ্ঞানীদের কোনোই আপত্তি হবে না — বিশেষ করে সত্যিই সেটা যখন 'আকাশ, বাতাস, স্বর্গ-মর্ত পরিব্যাপ্ত' করাই বটে।

অন্ধকারে দেখার লাঠি কোষগুলি কেবলমাত্র এক রকমেরই হয় বলে ওগুলি আমাদের মস্তিষ্কে বিভিন্ন রঙের অনুভূতি জাগায় না। নানা রঙের জিনিশও অন্ধকারে শুধু সাদা বা কালো দেখায়, অর্থাৎ তা থেকে আলো আসছে কি আসছে না, অন্ধকারে শুধু সেটাই বোঝা যায়। কিন্তু অন্ধকারেও, বিশেষ করে আলো-আঁধারিতে, বিভিন্ন রঙের জিনিশ দেখায় একটু তারতম্য হয় তার কারণ রোডপসিন সব রঙের আলো একই দক্ষতায় শুষে নিতে পারে না। কোন কোন রঙের, অর্থাৎ কোন কোন তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলো শুষে নিতে রোডপসিন কতোটা দক্ষ, সেটার মাপ ৩৩ নম্বর ছবিতে দেখানো হয়েছে। ছবিটা থেকে বোঝা যাচ্ছে যে লাল আলোতে বা ঘন নীল আলোতে রোডপসিন খুব কমই সাড়া দেয়, যতোটা না দেয় নীলচে সবুজ রঙের আলোতে।

দিনের আলো জোরালো হওয়ার আগে, অর্থাৎ এক লাক্সের চেয়ে কম আলোকতীব্রতায়, পুর্কিনিয়ে লাল ফুলগুলিকে নীলচে কালো হতে দেখেছিলেন কারণ ওই কম আলোয় ছুঁচোলো কোষগুলির পটুত্ব কম আর সে তুলনায় লাঠি কোষগুলির সাড়া বেশি। লাঠি কোষগুলির রোডপসিন লাল রঙের আলোতে সাড়া দেয় না বলে কম আলোতে লাল ফুলগুলি বেশি কালচে লাগে। নীল আর সবুজ রঙের আলো শুষে রোডপসিন সাড়া দেয় বলে অন্ধকারে ওই রঙের জিনিশ অপেক্ষাকৃত উজ্জ্বল দেখায়। এই ব্যাপারটাকে এখন পুর্কিনিয়ে প্রক্রিয়া বলা হয়। মন দিয়ে লক্ষ করলে দেখা যায় যে দিনের বেলা আলো থেকে অন্ধকার সিনেমা হলে ঢুকলে ভিতরটা প্রথমে একটু নীলচে লাগে। সন্ধ্যায় একেবারে পুরো অন্ধকার হওয়ার আগে সবুজ মাঠের দিকে চেয়ে থাকলে আলো আঁধারিতে সেটাও একটু নীল মতো দেখায়। এগুলির কারণও ওই পুর্কিনিয়ে প্রক্রিয়া।

গোধূলি পার হওয়ার খানিকক্ষণ পরে, সূর্যের শেষ রশ্মিও যখন মুছে গেছে, তখন আকাশের দিকে তাকালে আমরা দেখি যে চাঁদ তারা আর মেঘটেঘ বাদ দিয়ে বাকি আকাশের রঙ মোটামুটি কালো। চাঁদের আলো তো কেবল সূর্যের আলোর প্রতিফলন, তাই দিনের বেলা সূর্যের সাদা আলোতে যেমন বেগুনি থেকে লাল অবধি নানা রঙের সমাহার, তেমনি চাঁদের আলোতেও সে সব রঙই মোটামুটি সেই অনুপাতেই থাকে। জন উইলিয়াম স্ট্রাট বা লর্ড র‍্যালে প্রথম বুঝিয়েছিলেন যে দিনের বেলা আকাশের রঙ নীল দেখি কারণ বাতাসের অণুগুলি বিভিন্ন রঙের আলোকে বিভিন্ন পরিমাণে বিক্ষেপিত করে। সাদা আলোতে মিশে থাকা রঙগুলির মধ্যে নীল-বেগুনি রঙগুলি ঠিকরোয় সব চেয়ে বেশি আর কমলা-লাল রঙগুলি ঠিকরোয় সব চেয়ে কম। পরিষ্কার দিনে উপরে তাকালে বাতাস থেকে নীল-বেগুনি আলোটাই আমাদের দিকে সবচেয়ে বেশি ঠিকরোয় বলে আকাশের রঙ দিনের বেলা নীল দেখায়। একই কারণে চাঁদের আলোতেও রাতের আকাশ নীলই দেখানো উচিত নয় কি?

তা যে দেখায় না তার কারণ হলো, সূর্যের আলোর তুলনায় পূর্ণিমা রাতের চাঁদের আলোও অন্তত পাঁচ লক্ষ গুণ কমজোরি। খুব ফুটফুটে জ্যোৎস্নাভরা রাতেও আলোর তীব্রতা ০·২ লাক্সের চেয়ে বেশি হয় না। অতো অল্প আলোতে ছুঁচোলো কোষগুলি কাজ করে না বলে বিভিন্ন রঙকে আলাদা করা যায় না, তাই আকাশও নীল দেখায় না। রঙিন ক্যামেরা কিন্তু মানুষের চোখের চেয়ে বেশি সংবেদনশীল হতে পারে। আর ক্যামেরার লেন্সের অনাবৃত থাকার (বা এক্সপোজারের) সময়টা ইচ্ছেমতো বাড়ানো যায়। সে রকম রঙিন ক্যামেরাতে অনেক লম্বা এক্সপোজার দিয়ে ছবি তুলে দেখা গেছে যে চাঁদের আলোয় ভরা রাতের আকাশের রঙ দিনের আকাশের মতোই পুরোপুরি নীল। সে ছবিতে নীল আকাশে ফুটে থাকা তারাগুলিও দেখা যায়। খালি চোখে আমরা দিনের নীল আকাশে এতো তারা ফুটে থাকতে দেখি না, তাই রাতের সে ছবিটা বেশ অদ্ভুত দেখতে লাগে।

চেক জীববিজ্ঞানী পুর্কিনিয়ে
ঘামাননি মাথা মুড়ি-মুড়কি নিয়ে।
কেন আলো হলে ক্ষীণ
হয় সবই রঙহীন
বোঝালেন তিনি, খুব দূর কি গিয়ে?

২৩ : রঙের মাপ

শেখর গুহ

কথায় বলে ‘কতো ধানে কতো চাল’, মানে সবকিছুরই একটা মাপ আছে। পদার্থবিদদের কাছে গোটা দুনিয়াটাকে বোঝার উপায়ই হলো এই মাপজোক। সময়, দূরত্ব, গতিবেগ, ভর, শক্তি ইত্যাদি নানা ধারণা নিয়ে তাদের কারবার। এই ধারণাগুলি ঠিক কী বোঝায় তার স্পষ্ট রূপ তাঁরা দেন কীভাবে ওগুলি মাপা হচ্ছে তার মাধ্যমে। যা মাপার কোনো নির্দিষ্ট পদ্ধতি স্থির হয়নি, তা তাঁরা বিজ্ঞানের আওতার মধ্যেই ফেলতে চান না। বিজ্ঞানীদের কাজ হলো প্রকৃতিকে বোঝা, আর জীবজগৎ সমেত গোটা বিশ্বপ্রকৃতিতে তো রঙের ছড়াছড়ি! রঙ জিনিশটা ঠিক কী, তা পুরোপুরি বুঝতে তাই তাদের চাই রঙ মাপার নির্দিষ্ট উপায়।

শুধু বিজ্ঞানীদের কৌতূহল মেটানোর জন্যই নয়, শিল্প ও বাণিজ্যের ব্যবহারিক জগতেও রঙ মাপাটা খুবই প্রয়োজনীয়। কাপড়ে, কাগজপত্রে, প্রসাধনে, রঙিন ছবিতে, কম্পিউটার বা টেলিভিশনের পর্দায়, প্লাস্টিক, কাচ বা ধাতু দিয়ে বানানো নানা জিনিশে, ঘরবাড়ি তৈরির মালমশলায় এমনকি বিভিন্ন খাবারে যেমন কেক, বিস্কুট, লজেন্স, চকলেট ইত্যাদিতে কতো রকম রঙ লাগে। এক একটা নির্দিষ্ট রঙের জিনিশ হুবহু একই রঙে লক্ষ লক্ষ বা কোটি কোটি সংখ্যায় তৈরি করতে হয়। রঙের মাপ আর যন্ত্র দিয়ে তা স্থির করার উপায় না থাকলে এতো কিছু সামলানো তো অসম্ভব হতো।

মাপতে গেলে দেখা যায় যে কোনো একটা বস্তুর রঙ তিনটি আলাদা আলাদা জিনিশের উপর নির্ভর করে। প্রথমত, কোন রঙের আলোতে রঙটা মাপা হচ্ছে তা জানা দরকার। আলোর রঙ তো নির্ভর করে আলোর ঢেউয়ের তরঙ্গদৈর্ঘ্যের উপর — এক একটা রঙের আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য এক এক মাপের। সাধারণত যে সব আলোতে আমরা দেখি, যেমন সূর্যের আলো বা ঘরের ভিতর বিজলি বাতির আলো, তাতে বিভিন্ন রঙের আলো মিশে থাকে। কিন্তু সূর্যের সাদা আলো আর বিজলি বাতির আলোতে বর্ণালির নানা রঙের অনুপাতগুলি এক নয়। আবার বিভিন্ন রকম বিজলি বাতির মধ্যেও এই অনুপাতগুলি আলাদা হয়। নিচের ৩৪ নম্বর ছবিতে চার রকমের আলোর বর্ণালি-
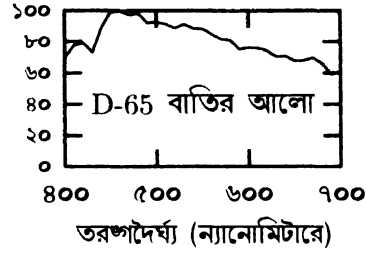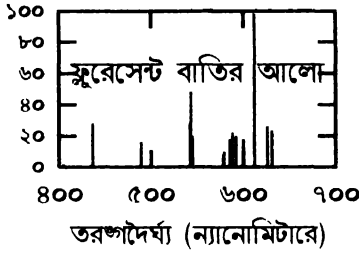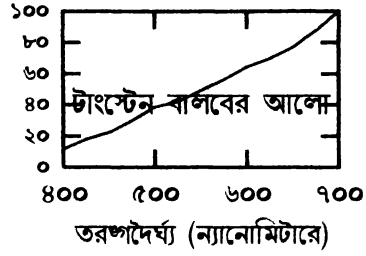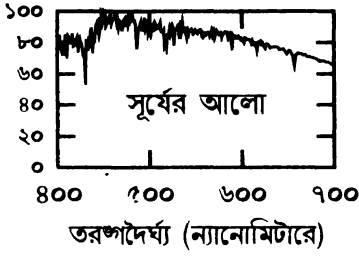
৩৪ নং ছবি॥ *নানা রকমের উৎস থেকে আসা আলোর বর্ণালি। কোন তরঙ্গদৈর্ঘ্যে আলো কতো জোরালো, তা বোঝানো হয়েছে সংশ্লিষ্ট রেখাটির উচ্চতা দিয়ে। সব ক্ষেত্রেই সবচেয়ে জোরালো আলো আসে যে তরঙ্গদৈর্ঘ্যে, সেই উচ্চতাটাকে ১০০ ধরা হয়েছে।*

বিশ্লেষণ বিশদ করে দেখানো হয়েছে সূর্যের আলো, টাংস্টেনের তার গরম করা সাধারণ বালবের আলো, অল্পচাপের পারদ গ্যাসে ভরা ফ্লুরেসেন্ট বাতির আলো আর D-65 নামে একটা কৃত্রিম আলো।

সূর্য থেকে আসে সাদা আলো, যার মধ্যে সব রঙই থাকে। বিভিন্ন তরঙ্গদৈর্ঘ্যে কেমন আলো আসে, তা আগেই দেখানো হয়েছিলো (১২৩পৃষ্ঠায়) ২৭ নম্বর ছবিতে। ৩৪ নম্বর ছবির প্রথমটা মোটামুটি তারই পুনরাবৃত্তি, তবে একটু তফাতও আছে — এই ছবিতে অনেক সূক্ষ্ম-সূক্ষ্ম খাঁজ রয়েছে। সূর্যের বাইরে হাল্কা গ্যাসের একটি আবহমন্ডল আছে, সূর্য থেকে আলো বেরোবার সময়ে কিছু-কিছু তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলো তাতে শুষে যায়। আমরা যখন সে আলো দেখি, তার মধ্যে কয়েকটি তরঙ্গদৈর্ঘ্যের অবদান তাই খুব কম, সেই-সেই তরঙ্গদৈর্ঘ্যের জায়গায় সূর্যের বর্ণালি নিচের দিকে গোঁত্তা খায়, ৩৪ নম্বর ছবিতে যেমন দেখা যাচ্ছে। বর্ণালি মাপার যে যন্ত্র, যাকে বলে বর্ণালিবীক্ষণ যন্ত্র, তাকে যদি শুধু মোটা-দাগের হিসেব করতে বলা হয় তাহলে এই খাঁজগুলো বোঝা যায় না, কিন্তু সূক্ষ্মভাবে চালালে এই বাড়া-কমাগুলো ধরা পড়ে। বাড়া-কমা সুদ্ধু এই যে খাঁজওয়ালা ছবিটা, মোটামুটি সেই রকম বর্ণালিই যাতে পাওয়া যায়, তার জন্য গবেষণাগারে কৃত্রিমভাবে তৈরি করা হয়েছে D-65 নামে এক রকম বাতি — তার
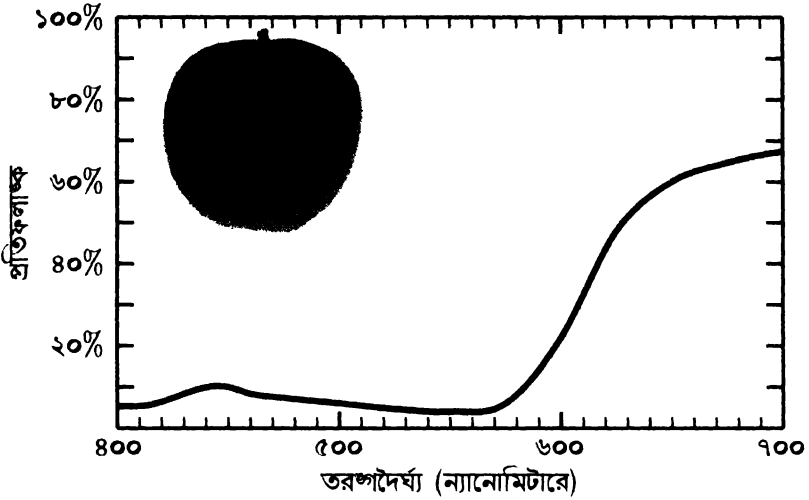
৩৫ নং ছবি॥ *লাল আপেলের প্রতিফলাঙ্ক বিভিন্ন তরঙ্গদৈর্ঘ্যে কেমন। (এ ছবিটি রঙে দেখা যাবে ৪৮ ও ৪৯ পৃষ্ঠার মাঝখানে রঙিন ছবির জন্য নির্ধারিত আলাদা পাতায়।)*

বর্ণালি দেখা যাচ্ছে ৩৪ নম্বর ছবির একেবারে শেষে। অন্যান্য যে সব কৃত্রিম আলোর বর্ণালি দেখানো হয়েছে, সেগুলো যে মোটেই সূর্যের আলোর মতো নয়, তা তো দেখেই বোঝা যাচ্ছে।

কোন আলোতে দেখা হচ্ছে তা ছাড়াও জিনিশের রঙ অবশ্যই নির্ভর করে জিনিশটার গা থেকে কোন রঙের আলো কতোটা প্রতিফলিত হয় তার উপর। লাল টুকটুকে আপেল বা ক্রিকেট বলের গায়ে সাদা আলো পড়লে লাল ছাড়া অন্য সব রঙগুলি ভালোমতো শুষে যায় — প্রতিফলিত হয় খালি লাল রঙটা। মনে করা যাক কোনো একটা তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলো এসে পড়লো একটা আপেলের উপর। সে আলোর শতকরা যতোভাগ আপেলটার গা থেকে প্রতিফলিত হয়ে নানাদিকে ছড়িয়ে পড়বে তাকে বলা যায় আপেলটার প্রতিফলাঙ্ক। এক এক তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলোতে সে প্রতিফলাঙ্ক এক এক মাপের। দৃশ্যমান আলোর নানা তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলোতে যদি প্রতিফলাঙ্কটা মাপা হয় তাহলে যা ফল পাওয়া যাবে তা ৩৫ নম্বর ছবিটা দিয়ে বোঝানো যেতে পারে। ওই ছবিতে দেখা যাচ্ছে যে ৬০০ ন্যানোমিটার থেকে ৭০০ ন্যানোমিটার অবধি তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলোতে, অর্থাৎ লাল রঙের জন্য প্রতিফলাঙ্কটা বেশি, আর অন্যান্য রঙের আলোতে সেটা একেবারেই কম, শূন্যের প্রায় কাছাকাছি। তাই আপেলের গাটা দেখায় লাল।

মানুষের চোখ এবং মন কীভাবে রঙ দেখে এবং বোঝে তার উপরেও রঙের মাপ নির্ভর করে। উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকেই জানা হয়ে গেছিলো যে রঙ দেখার জন্য মানুষের চোখে তিন রকমের কোষ আছে। এক ধরণের কোষ কেবল. লাল ও লালচে রঙের আলোতে সাড়া দেয়, আর এক ধরণের কোষ সাড়া দেয় কেবল সবুজ ও তার কাছাকাছি তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলোতে আর তৃতীয় ধরণের কোষ সাড়া দেয় নীল বা নীলচে আলোয়। ১৮৬০-এর দশকে জেম্স ক্লার্ক ম্যাক্সওয়েল দেখিয়েছিলেন, লাল সবুজ আর নীল এই তিনটি মুখ্য রঙ দিয়ে অন্য সব রঙের অনুভূতি তৈরি করা যায়।

আর একটা জিনিশও বিজ্ঞানীরা লক্ষ করেছিলেন। কোনো এক ধরণের আলোতে, মনে করা যাক সাদা আলোতে, দুটি আলাদা জিনিশ আলাদা রঙের দেখালেও অন্য কোনো রঙের আলোতে তাদের একই রঙের মনে হতে পারে। একে বলা যেতে পারে 'বর্ণবিভ্রম'।

এই সব ধারণাগুলি কাজে লাগিয়ে ১৯২০-র দশকের শেষদিকে ডেভিড রাইট ও জন গিল্ড নামে দুই ইংরেজ বিজ্ঞানী আলাদা-আলাদাভাবে পরীক্ষা চালিয়ে মানুষের চোখের পর্দায় থাকা রঙ-দেখার কোষগুলি কী অনুপাতে এক এক তরঙ্গদৈর্ঘ্যের রঙ দেখে তা বের করেন। তাঁদের পরীক্ষায় একজন দর্শক একটা ফুটোর মধ্যে দিয়ে তাকাতেন একটা বড়ো পর্দার দিকে। পর্দাটা দু অংশে ভাগ করা থাকতো। এক অংশে ফেলা হতো কোনো একটা বিশেষ তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলো। আর একই সাথে পর্দার অন্য অংশটিতে ফেলা হতো তিনটি এক রঙা আলোর মিশ্রণ। যে তিনটি রঙের আলো বাছা হয়েছিলো তাদের তরঙ্গদৈর্ঘ্যের মাপ হলো ৭০০, ৫৪৬·১ ও ৪৩৫·৮ ন্যানোমিটার, অর্থাৎ তাদের রঙ লাল, সবুজ ও নীল। সে তিনটি রঙের আলো কোনটা কী অনুপাতে পর্দায় পড়বে তা নিয়ন্ত্রণ করার চাবিটাও ছিলো ওই দর্শকেরই হাতে। দর্শকের কাজটা ছিলো পর্দার একদিকে ফেলা একরঙা আলোর সঙ্গে অন্যদিকের তিনরঙ মেশানো আলোর রঙ যতোদূর সম্ভব কাছাকাছি মেলানো। দৃশ্যমান আলোর প্রত্যেকটি তরঙ্গদৈর্ঘ্যের জন্য ওই তিনটি রঙের অনুপাতগুলি যা বেরোলো তা (১৪৭ পৃষ্ঠায়) ২৯ নম্বর ছবিতে দেখানো হয়েছে। অবশ্যই এটা মাত্র এক দুজন দর্শক দিয়ে নয়, অনেক মানুষকে দিয়ে পরীক্ষা করিয়ে তার একটা গড় থেকে পাওয়া। তিনটি মুখ্য রঙের জন্য যে তিনটি দাগ ওই ছবিতে দেখানো হয়েছে তাদের বলা হয় A, B ও C।

বিভিন্ন রঙের আলোতে মানুষের চোখের কোষগুলি কী অনুপাতে সাড়া দেয় তা রাইট ও গিল্ডের বের করা এই ফল থেকে নিশ্চিতভাবে বোঝা গেলো। ১৯৩১ সালে ফরাসীদেশে এক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে সেটাই প্রামাণ্য বলে মেনে নেওয়া হলো।

একটা জিনিশের রঙ মাপতে কী কী তথ্য দরকার তা সবই তাহলে বোঝা গেলো। প্রথমত, যে রঙের আলোতে রঙটা মাপা হচ্ছে তার তেজ কতো তা জানা চাই। সেটা পাওয়া যাচ্ছে ৩৪ নম্বর ছবি থেকে। মনে করা যাক কোনো একটা তরঙ্গদৈর্ঘ্যের জন্য

সে আলোর তেজ হলো E। আরও মনে করা যাক, সেই একই তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলোতে জিনিশটার প্রতিফলাঙ্কের মাপ (৩৫ নম্বর ছবি থেকে) হলো R। আর সেই তরঙ্গদৈর্ঘ্যে চোখের তিনটি কোষের সাড়া দেওয়ার অনুপাত কী রকম, তা আগেই দেখানো হয়েছে (১৪৭ পৃষ্ঠায়) ২৯ নম্বর ছবিতে। ধরা যাক তাদের পরিমাণ হলো a, b এবং c। প্রতিটি তরঙ্গদৈর্ঘ্যে তাহলে আলোর তেজ E, বস্তুর প্রতিফলাঙ্ক R এবং চোখের সাড়া a গুণ করে পাওয়া যায় ERa সংখ্যাটা। দৃশ্যমান আলোয় থাকা সবকটা তরঙ্গদৈর্ঘ্যে ERa গুণফলগুলি যা যা মাপের হবে তা সব যদি যোগ দেওয়া হয় তাহলে যে সংখ্যাটা পাওয়া যাবে সেটাকে নাম দেওয়া হয় X। একই রকমভাবে, সব তরঙ্গদৈর্ঘ্যে পাওয়া ERb ও ERc গুণফলগুলি যোগ করে Y ও Z সংখ্যাগুলি পাওয়া যায়। কোনো একটা আলোতে কোনো একটা জিনিশের রঙ (X, Y, Z) এই সংখ্যাত্রয়ীটা দিয়ে নির্ধারণ করা যায়, এবং বলা যায় ওই তিনটি সংখ্যাই হলো ওই জিনিশটার রঙের মাপ। বর্ণালিবীক্ষণ যন্ত্র আর তার সঙ্গে কম্পিউটার জুড়ে দিয়ে স্বয়ংক্রিয়ভাবে মোটামুটি যেকোনো জিনিশের জন্যই (X, Y, Z) সংখ্যাগুলি সহজে মাপা যায়। হাজার হাজার জিনিশের রঙ এইভাবে স্পষ্টাস্পষ্টি নির্দিষ্ট করা যায়।

উপরের আলোচনাটা কেবল অস্বচ্ছ জিনিশের জন্যই খাটে। স্বচ্ছ জিনিশও রঙিন হতে পারে, যেমন রঙিন কাচ বা প্লাস্টিক, বা নানান রঙিন তরল, যেমন দুধ না মেশানো হাল্কা চা কিম্বা ছেঁকে নেওয়া আপেলের রস ইত্যাদি। সেসব ক্ষেত্রে প্রতিফলাঙ্ক দিয়ে রঙ মাপা হয় না, হয় কোন রঙের আলো স্বচ্ছ জিনিশটার মধ্যে দিয়ে কী পরিমাণে চলে যেতে পারে, তার মাপ থেকে।

কোনো একটা জিনিশের রঙ মেপে পাওয়া (X, Y, Z) এই তিনটি সংখ্যাকে বাঙলায় আমরা বলতে পারি জিনিশটির *ত্রি-উদ্দীপক মান।* একটা জিনিশ কী রঙের তা বোঝানোর জন্য ওই তিনটি সংখ্যাই যথেষ্ট। পৃথিবীর যে কোনো জায়গায় যে কেউই ওই তিনটি সংখ্যা জানলেই তা থেকে জিনিশটার রঙ নির্ভুলভাবে জানতে পারবে। তিনটি সংখ্যা থেকে কীভাবে রঙ বুঝে নেওয়ার উপায়টা ঠিক করা হয়েছে তার খুঁটিনাটিতে যাওয়ার আগে চট করে বলে নেওয়া যাক, বিশুদ্ধ রঙ বলতে কী বোঝায়। সাদা আলোতে মিশে থাকা বেগুনি থেকে লাল অবধি বর্ণালির সব রঙগুলিই হলো বিশুদ্ধ রঙ। সেগুলির প্রত্যেকটিই আলোর এক-একটা নির্দিষ্ট তরঙ্গদৈর্ঘ্যের সঙ্গে জড়িত। ৫৫০ ন্যানোমিটার তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলো ঠিক যে সবুজ রঙের দেখায়, কোনো জিনিশের রঙ যদি হুবহু সেই রকম হয়, তাহলে বলা যায় যে সে জিনিশটার রঙ বিশুদ্ধ। বর্ণালিতে দেখা নীল, সবুজ, হলুদ, কমলা, লাল এগুলি সবই বিশুদ্ধ রঙ, কিন্তু সাদা বিশুদ্ধ রঙ নয়। লাল আর সাদা মিশিয়ে তৈরি গোলাপি রঙও বিশুদ্ধ রঙ নয়। সাদা, গোলাপি, খয়েরি এগুলি সবই মিশ্র রঙ।

৭ নং ছক ॥ *বিশুদ্ধ রঙের বর্ণকতা পরিমাপ।*

তরঙ্গদৈর্ঘ্য (ন্যানোমিটার)	৩৬ নম্বর ছবিতে অবস্থান	x	y
৪০০	A	০·১৭৩৩	০·০০৪৮
৪৫০	B	০·১৫৬৬	০·০১৭৭
৫০০	C	০·০০৮২	০·৫৩৮৪
৫৫০	D	০·৩০১৬	০·৬৯২৩
৬০০	E	০·৬২৭০	০·৩৭২৫
৬৫০	F	০·৭২৬০	০·২৭৪০
৭০০	G	০·৭৩৪৭	০·২৬৫৩

ফিরে আসা যাক রঙের মাপ নিয়ে আলোচনায়। একটা জিনিশের রঙ মেপে মনে করা যাক (X, Y, Z) সংখ্যাগুলি পাওয়া গেলো। ওই তিনটি সংখ্যা দিয়ে তৈরি করা যাক নতুন দুটি সংখ্যা, x আর y। X, Y ও Z সংখ্যাগুলোর যোগফল যদি হয় A, তাহলে x হলো X ÷ A, আর y হলো Y ÷ A। (X, Y, Z) দিয়ে নির্দিষ্ট করা প্রতিটি রঙের সঙ্গে তাহলে জড়িত রয়েছে একটি করে (x, y) জুটি। ৪০০ থেকে ৭০০ ন্যানোমিটার তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলোতে, অর্থাৎ দৃশ্যমান আলোর পরিধির মধ্যে থাকা কয়েকটি বিশুদ্ধ রঙের x ও y কি কি মাপের হয় তা ৭ নম্বর ছকে দেখানো হয়েছে।

ওই x ও y-এর মানগুলি একটা রেখাচিত্রে এঁকে দেখানো হয়েছে ৩৬ নম্বর ছবিতে। ওই ছবিতে A, B, C, D, E, F ও G বিন্দুগুলি যথাক্রমে ৪০০, ৪৫০, ৫০০, ৫৫০, ৬০০, ৬৫০ ও ৭০০ ন্যানোমিটার তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলোর রঙ বোঝায়। অর্থাৎ, A থেকে G পর্যন্ত ওই ঘোড়ার ক্ষুরের মতো দাগটার উপরে রয়েছে সবকটি বিশুদ্ধ রঙের মান। আর অন্যসব মিশ্র রঙগুলো? সেগুলি সবই পড়ছে ওই বাঁকা রেখাটার ভিতরে। এই ছবিটাকে বলে *বর্ণকতা চিত্র।*

প্রথমেই ধরা যাক সাদা রঙটা। ওটা পড়ে ঘোড়ার ক্ষুরটার মাঝামাঝি জায়গায়, যেখানে O বিন্দুটা দেখানো হয়েছে। A ও G যেহেতু বেগুনি আর লাল বোঝায়, ওই দুটি রঙ মেশানো সব ময়ূরপঙ্খী রঙই পড়ে AG দাগটার উপরে। অন্য সব মিশ্র রঙগুলি তাদের x ও y-এর মান অনুযায়ী ওই ৩৬ নম্বর ছবিতে কোথায় পড়বে তা আর একটু খোলসা করে দেখানো হয়েছে ৩৭ নম্বর ছবিতে। ওই ছবিটা থেকে বোঝা যায়, সাদা ও লালের মাঝটাতে পড়ে গোলাপি, লালের গায়ে লেগে আছে লালচে কমলা, তার গায়ে গায়ে কমলা, তার পরে হলদেটে কমলা, সেটা মিশে যায় হলুদে, তার গায়ে
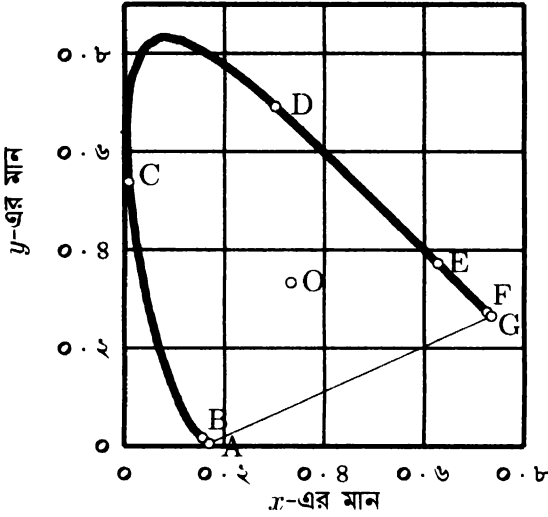
৩৬ নং ছবি॥ *বর্ণকতা চিত্র ১*

পরপর সবজেটে হলুদ, হলদে-সবুজ, হলদেটে সবুজ, সবুজ ইত্যাদি। নীলের একপাশে সবজেটে রঙ, অন্য পাশে লাল-নীল মেশানো ময়ূরপঙ্খী রঙ, কিন্তু হলুদ রঙটা নীলের ঠিক উল্টোদিকে।

তাই হলদেটে নীল অথবা নীলচে হলুদ বলে কোনো রঙ নেই। ঠিক তেমনই, ওই ছকে সবুজের উল্টোদিকে লাল, গোলাপি, বেগুনি রঙগুলি পড়ে বলে লালচে সবুজ, সবজেটে-বেগুনি বা সবজেটে-গোলাপি বলেও কোনো রঙ হয়না।

'রঙিন' বলতে আমরা সাধারণত যা বুঝি, অর্থাৎ লাল, হলুদ, সবুজ, নীল ইত্যাদি ও তাদের মিশ্রণে পাওয়া বিভিন্ন রঙ, x ও y-এর মান দিয়ে ভালোই নির্দিষ্ট করা যায়। কিন্তু তাই বলে 'সব' রঙই যে x ও y-এর ওই ছকটা থেকে পাওয়া যায়, তা নয়। ছাইএর রঙ, বা খাকি কিম্বা মেটে রঙ, এগুলো তো ওই ছকে দেখা যাচ্ছে না। তার কারণ, যে কোনো রঙ নির্ধারিত হয় X, Y ও Z এই তিনটি সংখ্যা দিয়ে। ওই তিনটি থেকে আমরা যখন x ও y, এই দুটি মাত্র সংখ্যা তৈরি করলাম তখন খানিকটা তথ্য তো বাদ দেওয়া হলো। সে তথ্যটা হলো রঙের ঔজ্জ্বল্য। পুরো সাদা থেকে কুচকুচে কালোর মধ্যে নানান ঔজ্জ্বল্যের ধূসর রঙগুলি পড়ে। x ও y-এর দ্বিমাত্রিক ছবির সঙ্গে সেই তৃতীয় মাত্রাটা যোগ করলে তবেই সে ত্রিমাত্রিক ছবিতে আমাদের চোখে দেখা সব রঙগুলোরই হদিস পাওয়া যায়।
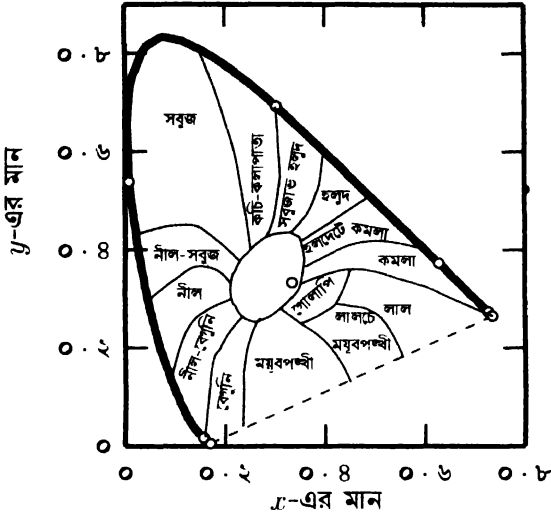
৩৭ নং ছবি ॥ *বর্ণকতা চিত্র ২*

যেসব জিনিশ কেবলই সাদা, সেগুলি ঠিক কতোটা সাদা তারও একটা মাপ আছে। বিছানার চাদর, বা সিনেমার পর্দা কিম্বা লেখা বা ছাপার কাগজ ইত্যাদি যারা তৈরি করে তাদের কাছে এই মাপটা জানা খুবই জরুরি। রঙিন জিনিশের মতোই সাদা জিনিশও মাপা হয় বর্ণকতার পরিমাপ (x, y) জুটিটা দিয়ে। সাদা জিনিশ বর্ণালির সব রঙগুলিকে সমান ভাবে প্রতিফলিত করে। যে আলোতে জিনিশটা দেখা হচ্ছে সেটা আর মানুষের চোখের সাড়া যদি সব রঙের জন্য সমান হতো, তাহলে পুরোপুরি সাদা জিনিশের বর্ণকতার পরিমাপ (x ও y) হতো সমান এবং দুটোরই মান হতো $\frac{১}{৩}$।

কিন্তু পরীক্ষা করার আলোতে সত্যি করে তো আর বর্ণালির প্রত্যেকটি রঙ একেবারে এক মাপে থাকে না। আর মানুষের চোখে সবুজ আলো সাড়া জাগায় সবচেয়ে বেশি, সে তুলনায় নীল আর লাল সাড়া জাগায় খানিকটা কম। সেই সব তফাতগুলি ধরে নিয়ে দেখা গেছে যে একটা বিশেষ আলোতে একেবারে সাদা জিনিশের বর্ণকতা পরিমাপগুলি হলো x = ০·৩১৬৭ ও y = ০·৩১৬৭। যে সব জিনিশ ধূসর রঙের, অর্থাৎ যাদের গায়ে সাদার সঙ্গে মিশে আছে খানিকটা কালো, তাদের বর্ণকতা পরিমাপগুলি হয় ০·৩১৬৭-এর চেয়ে কম।

কালো জিনিশও ঠিক কতোটা কালো তার মাপটা কী? কালো মানে আলোর অভাব, তাই একটা জিনিশ কতোটা কালো তা মাপা যায় জিনিশটার গা থেকে কতোটুকু আলো প্রতিফলিত হয়ে আসে তার উপর। অর্থাৎ প্রতিফলাঙ্ক R কতো

কম, সেটাই কালোত্বের মাপ হিসাবে গণ্য করা যেতে পারে। ২০০৮ সালের জানুয়ারি মাসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাইস বিশ্ববিদ্যালয় ও রেনসেলার পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে গবেষকরা দেখিয়েছেন যে গবেষণাগারে তৈরি কার্বন-ন্যানোটিউব নামে একধরণের পদার্থে আলো এমনই ভালোভাবে শুষে যায় যে সে জিনিশটার প্রতিফলাঙ্ক সাধারণত যেসব কালো রঙ পাওয়া যায় তাদের প্রতিফলাঙ্কের ১০০ ভাগের ১ ভাগ বা তার চেয়েও কম হয়। মানুষের তৈরি সব জিনিশের মধ্যে এটাই এখন পর্যন্ত সবচেয়ে বেশি কালো বলে গণ্য করা হয়।

রামধনুতে যে রঙ দেখি, বিশুদ্ধ কই সেগুলি
লাল, কমলা, হলুদ, সবুজ, আকাশি, নীল, বেগুনি।
এদের নানা মিশেলেতেই তৈরি যে বাদবাকি
ধূসর, সাদা, পাটকিলে, মভ, কামরাঙা, ছাই, খাকি।
বিশুদ্ধ আর মিশ্র দিয়ে রঙের জগৎ গড়া
সুনীল সাগর, শফেদ মেরু, শ্যামল শোভন ধরা।

২৪ : বিজলি বাতির রঙ

শেখর গুহ

কাজের জন্যই হোক বা অবসর বিনোদনের জন্যই হোক, মানুষ যতোক্ষণ জেগে থাকে, ততোক্ষণই তার আলো চাই। আগেকার দিনে মানুষ রাতের অন্ধকার দূর করতো মশাল, প্রদীপ, মোমবাতি, লণ্ঠন ইত্যাদি নানা উপায়ে আগুন জ্বেলে। শ'খানেক বছর আগে বিজলি বাতির আবিষ্কারের ফলে কাজটা অনেক সহজ হয়ে গেছে --- সন্ধ্যা নামলেই এখন ঘরে বাইরে আলো জ্বালিয়ে দেওয়া হয় বোতাম টিপে বিদ্যুৎশক্তির সাহায্যে নিমেষে ঘুচে যায় অন্ধকারে থাকার যতো অসুবিধা।

বিজলি বাতি নানা রকমের হয় --- কিন্তু সবচেয়ে শস্তা বলে ছোটো গোল মতো আলোগুলো সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করা হয়। সাধারণত ওগুলোকে বলা হয় আলোর বাল্‌ব। তার পরেই দেখা যায় লম্বা (বা পাকানো) লাঠির মতোন দেখতে 'টিউব বাতি' বা ফ্লুরেসেন্ট বাতি। এগুলি ছাড়াও নিয়ন বাতি নামে আলো নানা জায়গায় দেখা যায়। যে সব জায়গায় খুব জোরালো আলোর প্রয়োজন, যেমন সিনেমা দেখানোর জন্য বা রাতের বেলা খেলার মাঠে অথবা গাড়ির হেডলাইটে, সেখানেও নানা বিশেষ ধরণের আলো ব্যবহার করা হয়। তার উপরে টেলিভিশন বা কম্পিউটারের পর্দা, বা হাতে ধরা টেলিফোন --- এ সবেও বৈদ্যুতিক আলো লাগে।

ইংরিজিতে একটা কথা আছে গোলাপি রঙের কাচের মধ্যে দিয়ে দেখলে সব কিছুই সুন্দর মনে হয়। কিন্তু ঘরের ভিতরে জ্বালানো আলো সাধারণত লাল-নীল-গোলাপি ইত্যাদি ঝলমলে রঙের হয় না। দিনের বেলা সূর্যের আলোতে সব জিনিশের রঙ যেমন, বিজলিবাতির আলোতেও যাতে সেরকমই দেখায়, সাধারণত তারই চেষ্টা করা হয়ে থাকে। স্বচ্ছ কাচের বাল্‌বের আলো একটু হলদেটে রঙের হয় --- ঘষা কাচের বাল্‌ব থেকে তার তুলনায় অনেক বেশি সাদা আলো পাওয়া যায়। টিউব বাতির আলো হয় একটু নীলচে মতো। নানা রঙের কাচ দিয়ে আলোর বাল্‌ব তৈরি করলে নানা রঙের আলো পাওয়া যায় --- আবার পুরোপুরি রঙহীন স্বচ্ছ কাচে তৈরি নিয়ন বাতির আলো

একেবারে লাল রঙের হয়। এক এক ধরণে তৈরি আলোর এক এক রকম রঙ হয় কেন, সেটাই হলো এখন আমাদের আলোচনার বিষয়।

স্বচ্ছ কাচের তৈরি আলোর বাল্‌বের ভিতরে তাকালেই দেখা যায় যে কাচের মধ্যে পোঁতা রয়েছে সূক্ষ্ম একটা ঝুলঝুলে তার। বোতাম টিপে যখন ওই তারটার মধ্যে বিদ্যুতের প্রবাহ চালানো হয় তখন বিদ্যুতের শক্তি তারটাকে খুব তাড়াতাড়ি গরম করে ফেলে। যে কোনো জিনিশই খুব বেশি গরম হয়ে গেলে তা থেকে আলো বেরোয়। যেমন গনগনে আঁচের কয়লা অথবা খুব গরম করা লোহার শিক থেকে লালচে আভা বেরোতে দেখা যায়। বাল্‌বের ভিতরে যে তারটা থাকে সেটা বানানো হয় টাংস্টেন নামে একটা ধাতু দিয়ে। যে তাপমাত্রায় কোনো জিনিশ কঠিন অবস্থা থেকে গলে তরল অবস্থায় পরিণত হয় তাকে বলে 'গলনাঙ্ক'। বরফ গলে জল হয় শূন্য ডিগ্রি সেলসিয়াসে, তাই বরফের গলনাঙ্ক হলো শূন্য ডিগ্রি। তেমনি লোহা কঠিন অবস্থা থেকে গলে তরল হয়ে যায় ১৫৩৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায়। টাংস্টেনের গলনাঙ্ক হলো সব ধাতুদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি, ৩৪০৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস। তাই টাংস্টেনের তারকে প্রায় ৩০০০ ডিগ্রি অবধি গরম করা যায়। ওই তাপমাত্রায় ওঠা তার থেকে যে বিকিরণ বেরোয় তার মধ্যে বেশিটাই পড়ে অবলোহিত অংশে — কেবল ১০ শতাংশ মতো পড়ে দৃশ্যমান আলোর গণ্ডিতে। সূর্যের আলোতে নীল, সবুজ, হলুদ, কমলা, লাল ইত্যাদি নানা রঙ যে অনুপাতে মিশে সাদা রঙ তৈরি করে, গরম করা টাংস্টেনের তার থেকে আসা আলোয় রঙগুলির অনুপাত ঠিক সে রকম নয়। অনুপাত কী রকম, তা আমরা দেখিয়েছিলাম (১৬৯ পৃষ্ঠায়) ৩৪ নম্বর ছবিতে। লালের অংশটা অপেক্ষাকৃত বেশি বলে রঙগুলো একসঙ্গে মিশে আলোটাকে দেখায় হলদেটে। লাল বেশি থাকা সত্ত্বেও বাল্‌বটা যে লালচে দেখায় না তার কারণ, একে তো ওই আলোতে সবুজ আর নীলের পরিমাণটা নেহাৎ কম থাকে না, তার উপর মানুষের চোখও লালের চেয়ে সবুজ রঙটা দেখে বেশি দক্ষতায়।

ফ্লুরেসেন্ট বাতি থেকে আলো আসে একটু অন্য রকম উপায়ে। সে কথায় যাওয়ার আগে ওই বাতিগুলো লাঠির মতো লম্বা হয় কেন, সেটার আলোচনা করা যাক। ওই বাতিগুলোর মধ্যে থাকে খুব অল্প পরিমাণে পারদ বা পারা আর আর্গন নামে একটা গ্যাস। সাধারণ তাপমাত্রায় পারা যে একটা তরল পদার্থ, থার্মোমিটার ব্যবহার করার অভিজ্ঞতা থেকেই তা আমরা সকলে জানি। তাপমাত্রা বাড়িয়ে যে কোনো তরলকেই গ্যাসে পরিণত করা যায়। আবার তাপমাত্রা না বাড়িয়েও সে তরলটার উপরে চাপ খুব কমিয়ে দিয়ে সেটাকে গ্যাসীয় অবস্থায় আনা যায়। ফ্লুরেসেন্ট বাতির ভিতর পারদের গ্যাস হয়ে থাকা দরকার — তাই সে বাতির ভিতরে চাপ খুব কম রাখতে হয়।

পৃথিবীর উপরিতল থেকে প্রায় একশো কিলোমিটার উঁচু অবধি বাতাসে ঘেরা, আমরা থাকি পৃথিবীর সেই বায়ুমণ্ডলে। আমাদের শরীরের ভিতরে বাতাসের যা চাপ

বাইরেও তাই চাপ বলে আমরা এই বিশাল বায়ুমণ্ডলের অস্তিত্ব অনুভব করতে পারি না। কিন্তু তাই বলে বাতাসের চাপের পরিমাণটা নেহাত কম নয়। একটা কাগজের ঠোঙা মুখে দিয়ে তার ভিতরের হাওয়াটা শুষে নিলেই দেখতে পাই যে বাতাসের চাপে সেটা দুমড়ে মুচড়ে গেছে। ফ্লুরেসেন্ট বাতির ভিতর থেকে সবটা বাতাসই বের করে নেওয়া হয় — তার জায়গায় ঢোকানো হয় অল্প একটু পারা — যার চাপ বাতাসের চাপের হাজার ভাগের এক ভাগ। বাতিগুলোর ভিতরে ও বাইরে চাপের এই পার্থক্য সহ্য করার জন্য সবচেয়ে ভালো আকারটা হলো লাঠির মতোন। সেই জন্য সাধারণত ওই বাতিগুলো লাঠির মতো দেখতে হয়।

ফ্লুরেসেন্ট বাতির দু ধারে দুটি তার থাকে। বাতিটা জ্বালানোর বোতাম টিপলেই বিদ্যুতপ্রবাহ চলে সেই তার দুটিকে খুব গরম করে দেয় - যার ফলে তারগুলোর ভিতর থেকে কিছু ইলেকট্রন বেরিয়ে আসে। বিদ্যুতের টানে সে ইলেকট্রনগুলি বাতির একদিক থেকে অন্য দিকে জোর কদমে চলতে থাকে। সে চলার পথে যদি পারার পরমাণু এসে পড়ে তখন সে পরমাণুর সঙ্গে ইলেকট্রনের লাগে ধাক্কা। ধাক্কাটা যথেষ্ট জোরালো হলে ইলেকট্রনের চলার শক্তিটা শুষে নিয়ে সে পরমাণুটা উত্তেজিত হয়। কিছু সময় পরে যখন পরমাণুটা তার স্বাভাবিক নিরুত্তেজ অবস্থায় ফিরে আসে তখন সেই উত্তেজনার শক্তিটা বেরিয়ে আসে অতিবেগুনি আলো হয়ে। অর্থাৎ এই আলো মানুষের চোখে অদৃশ্য। তাহলে দেখা যাবে কী করে? ফ্লুরেসেন্ট বাতির ভিতরে কাচের গায়ে লাগানো থাকে কয়েক ধরণের অনুপ্রভ পদার্থ। এগুলির কাজ হলো অতিবেগুনি আলো শুষে নিয়ে সেটাকে মানুষের চোখে দেখতে পাওয়ার মতো আলোতে পাল্টে দেওয়া। অতিবেগুনি রশ্মি শুষে নিয়ে এক একটা অনুপ্রভ পদার্থ থেকে এক এক রঙের আলো বেরোয়। নীল, সবুজ, লাল এই রকম তিন চার ধরণের অনুপ্রভ পদার্থ থেকে বেরোনো আলো মিশে আমাদের চোখে দেখা সাদা আলো সৃষ্টি হয়। নীল আলো বের করে এমন অনুপ্রভ পদার্থগুলির দক্ষতা অপেক্ষাকৃত বেশি হয় বলে ফ্লুরেসেন্ট বাতিগুলো একটু নীলচে দেখায়।

ফ্লুরেসেন্ট টিউব বাতিতে যদি পারদের জায়গায় নিয়ন, অথবা কখনো আর্গন বা ক্রিপ্টন গ্যাস ভরা থাকে, চলতি কথায় তাদের সবগুলিকেই নিয়ন বাতি বলা হয়। পারদের পরমাণু থেকে যেমন অতিবেগুনি রশ্মিটাই বেশি আসে, তেমনই নিয়নের পরমাণু থেকে বেশি আসে লাল রঙের আলো। আর্গনের পরমাণু থেকে আসে সবুজ, আর ক্রিপ্টন থেকে আসে নীল। সিনেমা হলের অন্ধকারে বাইরে যাওয়ার নির্দেশ সাধারণত লাল নিয়ন বাতি দিয়েই লেখা থাকে। ফ্লুরেসেন্ট আর নিয়ন বাতি আঁকিয়ে-বাঁকিয়ে নানা মাপের, নানা আকারের লেখা বা ছবি বানানো যায়। উৎসবে বা বিজ্ঞাপনে তাই ওগুলোর ব্যবহার হয় প্রচুর।

ঘরে-বাইরে চির-প্রচলিত টাংস্টেনের তারওয়ালা আলোর বাল্‌ব খুবই কাজের হলেও তার দু-একটি অসুবিধা আছে। টাংস্টেন যে তাপমাত্রায় গলে যায়, তার চেয়ে বেশ খানিকটা কম তাপমাত্রাতেই বাল্‌বগুলোকে ব্যবহার করতে হয়। যে তাপমাত্রায় জল ফোটে তার কাছাকাছি গরম করলেই যেমন জলের অণুগুলোর বাষ্প হয়ে উড়ে যাওয়ার হার খুব বেড়ে যায়, ঠিক তেমনই ওই গলনাঙ্কের কাছাকাছি তাপমাত্রায় টাংস্টেন পরমাণুগুলোও তার ছেড়ে বেরিয়ে আসে প্রচুর পরিমাণে। তার ফলে তারটা তাড়াতাড়ি ক্ষয়ে যায়। কম তাপমাত্রাতে ব্যবহার করলে আলোর বাল্‌বগুলি ১০০০ ঘণ্টা মতোন জ্বলতে পারে। কিন্তু কম তাপমাত্রাতে আলোর রঙটা একটু বেশি হলদেটে দেখায়।

হ্যালোজেন বাতি যেগুলোকে বলা হয় সেগুলি আসলে ওই টাংস্টেনের তারেরই বাতি। কিন্তু বাতিগুলোর মধ্যে ভরা থাকে আয়োডিন বা ব্রোমিন। ক্লোরিন, ফ্লোরিন, ব্রোমিন আর আয়োডিন নামে চারটে মৌল পদার্থকে হ্যালোজেন বলা হয়, তাই থেকে বাতির নাম। খুব উঁচু তাপমাত্রায় টাংস্টেন যখন তার ছেড়ে বাষ্পীভূত হয়, তখন ওই ব্রোমিন বা আয়োডিনের সঙ্গে রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলে ওগুলি আবার ফিরে আসে তারের গায়ে। তার ফলে খুব গরম হওয়ার পরেও তারটা বহু দিন অটুট থাকতে পারে। হ্যালোজেন বাতিগুলি বেশি তাপমাত্রাতে ব্যবহার করলেও ২০০০ ঘণ্টা অবধি জ্বলতে পারে — অর্থাৎ সাধারণ আলোর বাল্‌বের দু-গুণ বেশি তাদের আয়ু — অন্তত এই সব বাতির নির্মাতারা এরকমই দাবি করেন। বেশি তাপমাত্রা অবধি গরম করা যায় বলে হ্যালোজেন বাতির আলোর তেজও হয় বেশ জোরালো। তার উপর, ওই বেশি তাপমাত্রায় জ্বলার জন্যই হ্যালোজেন বাতির আলো বেশ ধবধবে সাদাও হয়। গাড়ির হেডলাইটে বা খেলার মাঠে তাই এ ধরণের আলো কাজে লাগানো হয়। কিন্তু হ্যালোজেন বাতি থেকে শুধু সাদা আলোই নয়, অতিবেগুনি আলোও বের হয়। মানুষের পক্ষে ক্ষতিকর এই রশ্মি আটকানোর জন্য হ্যালোজেন বাতির কাচে বিশেষ ব্যবস্থা করতে হয়। সাধারণ আলোর বাল্‌বের তুলনায় হ্যালোজেন বাতির কাচ অনেক পুরু হওয়ারও দরকার হয় — কেননা অতো উঁচু তাপমাত্রা সাধারণ কাচ সইতে পারে না।

ফ্লুরেসেন্ট আর নিয়ন বাতিতে বিভিন্ন গ্যাসের মধ্যে বিদ্যুৎপ্রবাহ চালিয়ে বিদ্যুতের শক্তি দিয়ে পরমাণুগুলোকে উত্তেজিত করা হয়। সেই উত্তেজনাটা বেরিয়ে আসে আলো রূপে। গ্যাস নিয়ে কাজ করার একটা অসুবিধা হলো যে সেটা ভরে রাখতে হয় কোনো একটা আধারে, এবং আলোটা যাতে বের হতে পারে তার জন্য আধারটার অন্তত খানিকটা স্বচ্ছ বা অর্ধস্বচ্ছ হওয়া চাই। আধারটার কোনো না কোনো ছিদ্র দিয়ে চুঁইয়ে চুঁইয়ে একটু না একটু গ্যাস বেরিয়েই যায় — সেটা পুরো বন্ধ করা দুষ্কর। গ্যাসের বদলে কঠিন পদার্থের মধ্যে বিদ্যুৎ চালিয়ে যদি আলো পাওয়া যেতো তাহলে এসব ঝামেলা অনেক কমতো।

দৈনন্দিন জীবনে যে সব কঠিন পদার্থ সচরাচর দেখা যায় তাদের বেশির ভাগকেই পরিবাহী ও অপরিবাহী, এই দুটি গোষ্ঠীতে ফেলা যায়। কাচ, প্লাস্টিক, কাঠ ইত্যাদি যেসব জিনিশের ভিতরে বিদ্যুৎপ্রবাহ বইতে পারে না, তারা হলো অপরিবাহী। আর সোনা, রুপো, লোহা, তামা ইত্যাদি ধাতু যাদের মধ্যে দিয়ে বিদ্যুৎ অনায়াসে বইতে পারে, তারা পরিবাহী। কোন জিনিশ কতোটা বিদ্যুৎ বইতে পারে বিজ্ঞানীরা তার হিসাব করেন বৈদ্যুতিক রোধ নামে একটা পরিমাপ দিয়ে। কাচ, প্লাস্টিক এসবের বৈদ্যুতিক রোধ খুব বেশি। আবার লোহা তামা ইত্যাদি ধাতুর বৈদ্যুতিক রোধ খুবই কম।

বিদ্যুৎপ্রবাহ চালিয়ে আলো বের করা মুশকিল পরিবাহী এবং অপরিবাহী এই দুটো থেকেই। অপরিবাহীর মধ্যে দিয়ে তো বিদ্যুৎপ্রবাহ চলেই না। আর পরিবাহী পদার্থে বিদ্যুৎশক্তি আলোতে রূপান্তরিত হওয়ার সুযোগই পায় না। সে শক্তির প্রায় সবটাই চলে যায় ধাক্কাধাক্কি করে সে পদার্থের পরমাণুগুলি থেকে আরও ইলেকট্রন খসানো এবং পদার্থটির তাপ বাড়ানোর কাজে।

কিন্তু এমন কিছু কঠিন পদার্থ রয়েছে যাদের বৈদ্যুতিক রোধ হলো পরিবাহী ও অপরিবাহীর মাঝামাঝি খুব বেশিও নয় আবার খুব কমও নয়। বাংলায় এদেরকে বলে *'অর্ধপরিবাহী'।* এই পদার্থগুলির রোধের ক্ষমতা নানা উপায়ে নিয়ন্ত্রণ করা যায় যেমন এদের মধ্যে অন্য কিছু ভেজাল মিশিয়ে। এমন একটি অর্ধপরিবাহী পদার্থ হলো সিলিকন, পৃথিবীর গায়ে যার কোনোই অভাব নেই। নানান মণিমাণিক্যও পড়ে এই অর্ধপরিবাহীর দলে।

অর্ধপরিবাহীর মধ্যে দিয়ে ঠিক কতোটা বিদ্যুৎ বইবে সেটা যখন মানুষ সূক্ষ্মভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে শিখলো তখন কঠিন পদার্থ থেকে বৈদ্যুতিক আলো সৃষ্টির একটা নতুন উপায় পাওয়া গেলো। দেখা গেলো, অর্ধপরিবাহীর মধ্যে যদি ঠিক এমন পরিমাণ ইলেকট্রনকে মুক্ত রাখা যায় যা অল্প একটু বিদ্যুৎপ্রবাহ বয়ে পরমাণুদের উত্তেজিত করার জন্য যথেষ্ট কিন্তু পরমাণু থেকে বেরিয়ে আসা সবটা আলো শুষে নেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট নয় — তাহলে তাদের ভিতর থেকেও আলো বেরোতে পারে। গ্যালিয়াম ধাতু আর আর্সেনিক দিয়ে তৈরি একটা যৌগ পদার্থ, গ্যালিয়াম আর্সেনাইড, এই রকম একটি অর্ধপরিবাহী। গ্যালিয়াম আর্সেনাইড থেকে যে বৈদ্যুতিক আলো আসে তার তরঙ্গদৈর্ঘ্য ৮০০ থেকে ৯০০ ন্যানোমিটার মতো — অর্থাৎ সেটা পড়ে অবলোহিতের গণ্ডিতে, মানুষের চোখে দেখার পরিধির ঠিক বাইরে। টেলিভিশন দূর থেকে নিয়ন্ত্রণ করা হয় যে 'রিমোট-কন্ট্রোল' নামে হাতে-ধরা যন্ত্রটা দিয়ে, সেটা কাজ করে এই ৮০০ থেকে ৯০০ ন্যানোমিটার তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলো দিয়ে। অর্ধপরিবাহী দিয়ে তৈরি এই আলোর উৎসগুলিকে ইংরিজিতে বলে 'লাইট-এমিটিং ডায়োড', সংক্ষেপে LED।

গ্যালিয়াম আর্সেনাইডের সঙ্গে অ্যালুমিনিয়াম মিশিয়ে তৈরি করা হয় গ্যালিয়াম-অ্যালুমিনিয়াম-আর্সেনাইড নামে একটা মিশ্র যৌগ, তা থেকে লাল আলো পাওয়ার

উপায় আবিষ্কার করেছেন মার্কিন বিজ্ঞানী নিক্ হলোনিয়াক, ১৯৬২ সালে। তারপরে ১৯৭২ সালে তাঁরই এক প্রাক্তন ছাত্র জর্জ ক্র্যাফোর্ড দেখান কী করে অ্যালুমিনিয়াম-গ্যালিয়াম-ইনডিয়াম-ফসফাইড থেকে হলুদ আলো এবং বেশ জোরালো লাল ও লাল-কমলা রঙের আলো পাওয়া যায়। এই মিশ্র-বস্তুটাতে বিভিন্ন পদার্থগুলির অনুপাত বাড়িয়ে কমিয়ে নানা রঙের আলো পাওয়া যায়, এমনকি সবুজ আলো পর্যন্ত। সাদা আলো পেতে গেলে লাল ও সবুজের সঙ্গে নীল রঙের আলোও মেশানো দরকার - কিন্তু নীল LED তৈরি করাটা খুব সহজ হচ্ছিলো না।

নীল আলো সৃষ্টির জন্য খুব উপযুক্ত জিনিশ হলো গ্যালিয়াম নাইট্রাইড। কিন্তু জোরালো নীল আলো পেতে গেলে যতোটা খুঁতহীন গ্যালিয়াম নাইট্রাইড প্রয়োজন সেটা কেউই তৈরি করতে পারছিলো না। হঠাৎ করে ১৯৯৩ সালে, প্রায় সম্পূর্ণ একক চেষ্টায়, জাপানের 'নিচিয়া' নামে একটা সংগঠনে কর্মরত শুজি নাকামুরা নামে এক বিজ্ঞানী এমন একটা পদ্ধতি আবিষ্কার করলেন যা দিয়ে সবচেয়ে কমখুঁত গ্যালিয়াম নাইট্রাইড তৈরি হলো। সেটা থেকে পাওয়া সবুজ আলো, নীল আলো এবং নীল-সবুজ-লাল মিশিয়ে সাদা আলো সৃষ্টি করতে বেশিদিন লাগলো না। এখন যে সাদা LED চালু হয়েছে তা অবশ্য ওইরকম তিন রঙ মেশানো নয়। ওগুলিতে গ্যালিয়াম নাইট্রাইড এবং গ্যালিয়াম ইন্ডিয়াম নাইট্রাইডের মাধ্যমে তৈরি হয় নীল আলো। সিরিয়াম মেশানো ইট্রিয়াম অ্যালুমিনিয়াম গারনেট (ইংরিজিতে Ce:YAG) নামে একটা হলুদ অনুপ্রভ পদার্থের উপর সে আলো ফেললে পাওয়া যায় হলুদ আলো। সে হলুদ আর ওই নীল মিশে সুন্দর সাদা আলো সৃষ্টি করে।

এখন পৃথিবীব্যাপী চেষ্টা চলছে টাংস্টেনের উত্তপ্ত তার দিয়ে তৈরি বাল্‌ব অথবা ফ্লুরেসেন্ট বাতি বাতিল করে অর্ধপরিবাহী দিয়ে আলো জ্বালানোর। টাংস্টেনের বাল্‌বে শক্তির অপচয় হয় বড্ডো বেশি। ১০০ ওয়াট শক্তির একটা বাল্‌বে ৯০ শতাংশই চলে যায় তাপে অথবা অবলোহিত আলোতে দৃশ্যমান আলো জোটে মাত্র ১০ ওয়াটের মতো। কিন্তু এখনো পর্যন্ত সেই ১০০ ওয়াট বাল্‌বের দাম হয়তো দশ-বারো টাকা। অর্ধপরিবাহীর LED থেকে দশ ওয়াট শক্তির সাদা আলো পাওয়া যে যায় না তা নয়, কিন্তু তার দাম এখনো হাজার হাজার টাকা। দামটা না কমালে জিনিশটা তো সাধারণ মানুষের কাজেই লাগবে না। তাই বিজ্ঞানীরা উঠেপড়ে লেগেছেন আরো শস্তা মালমশলা (যেমন যৌগ-রাসায়নিক প্লাস্টিক ধরণের জিনিশ) দিয়ে অর্ধপরিবাহী ও আলো তৈরি করতে। আশা আছে এ কাজে তাঁরা শিগ্গিরি সফল হবেন। জৈব-রাসায়নিক অর্ধপরিবাহীর আলো কিন্তু এখনই আমরা ব্যবহার করি — যেমন আমাদের হাতে-হাতে ঘোরা মোবাইল ফোনের পর্দায় অথবা ল্যাপটপ কম্পিউটারে। কিন্তু সারা ঘর আলোকিত করার মতো তেজ এখনো এদের থেকে পাওয়া যায়নি।

আর একটা প্রযুক্তির কথা বলে বিজলি আলোর এই আলোচনাটা শেষ করা যাক। দিন-দিন কম্পিউটারের উন্নতি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের নতুন নতুন চাহিদার সৃষ্টি হচ্ছে। আগে যেখানে একটা থালার মাপের চাকতিতে মাত্র গোটাকতক গান রেকর্ড করে গ্রামোফোনে বাজিয়ে শোনা যেতো, এখন তার থেকে অনেক ছোটো মাপের (মোটামুটি একটা প্লেটের মতো) চাকতিতে একটা গোটা সিনেমাই ঢুকিয়ে দেওয়া যায়। এটা সম্ভব হয়েছে ওই অর্ধপরিবাহী থেকে আসা আলোর জন্যই। আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য যতো ছোটো, ওই চাকতিতে ঠিক সেই রকম ছোটো ছোটো দাগ কেটে তথ্য জমিয়ে রাখা যায়, এবং পরে সেটা আলোর সাহায্যেই পড়াও যায়। কিন্তু শুধু LED-র আলো দিয়ে খুব ছোটো ছোটো দাগ কাটা সম্ভব হয় না। তার জন্য প্রয়োজন হয় লেসার রশ্মির। LED-কে কাজে লাগিয়ে নানা রঙের অর্ধপরিবাহী লেসারও তৈরি করা হয়েছে। সেগুলিকে ইংরিজিতে বলে *লেসার ডায়োড* বা LD।

বাংলা ভাষায় অ-আ-ই-ঈ ইত্যাদি গোটা পঞ্চাশেক বর্ণ রয়েছে তার সঙ্গে রয়েছে আ-কার ই-কার ইত্যাদি গোটা পনেরো চিহ্ন। এগুলি দিয়ে নানা মাপের শব্দ তৈরি করে আমরা সেগুলি লিখি ও পড়ি। কম্পিউটারের ভাষায় বর্ণের সংখ্যা মোটে দুটো সেগুলো চিহ্নিত হয় ০ আর ১, এই দুটি সংখ্যা দিয়ে। এই দুটি বর্ণ দিয়ে তৈরি হয় শব্দ, কিন্তু সে শব্দগুলি সবই এক মাপের প্রতিটি শব্দই ৮ অক্ষরের। সেই শব্দগুলিকে কম্পিউটারের ভাষায় নাম দেওয়া হয়েছে *বাইট*।

কম্প্যাক্ট ডিস্ক বা CD নামে চাকতিগুলির এক-একটাতে ৮০০ মেগাবাইট, অর্থাৎ ৮০ কোটি বাইট পরিমাণ তথ্য রাখা যায়। গ্যালিয়াম আর্সেনাইড দিয়ে তৈরি লেসার ডায়োড থেকে পাওয়া যায় ৭৮০ ন্যানোমিটার তরঙ্গদৈর্ঘ্যের অবলোহিত আলো। তাই দিয়ে লেখা ও পড়া হয় সে সিডিগুলি। গ্যালিয়াম অ্যালুমিনিয়াম আর্সেনাইড ফসফাইড দিয়ে তৈরি ৬৫০ ন্যানোমিটার তরঙ্গদৈর্ঘ্যের, অর্থাৎ লাল রঙের লেসার আলো দিয়ে লেখা ও পড়া হয় *ডিজিটাল ভিডিও ডিস্ক* বা DVD যাতে ৪ গিগাবাইট, অর্থাৎ ৪০০ কোটি বাইট তথ্য আঁটতে পারে। নাকামুরার আবিষ্কৃত পদ্ধতি দিয়ে তৈরি গ্যালিয়াম নাইট্রাইড ও গ্যালিয়াম ইন্ডিয়াম নাইট্রাইডের লেসার ডায়োড থেকে বের হয় ৪০৫ ন্যানোমিটার তরঙ্গদৈর্ঘ্যের নীল আলো। তা ব্যবহার করে জাপানের সোনি নামে একটি সংস্থা ২০০৬ সালের জুন মাস থেকে '*ব্লু-রে*' বা 'নীল রশ্মি' নামে নতুন এক তথ্যভরা চাকতি বাজারে চালু করার চেষ্টা করছে। তার মধ্যে আঁটে ৫০ গিগা বাইট অর্থাৎ ৫০০০ কোটি বাইট।

গাছের পাতায় পাখির পালক দিয়ে অথবা পাথরের গায়ে খোদাই করে হাজার হাজার বছর আগে শুরু হয়েছিলো মানুষের লেখা-লেখি। কৌতূহল আর অনুসন্ধিৎসা কাজে লাগিয়ে আজকের মানুষ তার তুলনায় কী বিশাল তথ্যের ভাণ্ডার হাতের মুঠোয় ধরে

রাখতে পারে, তা চিন্তা করতে গেলেও আশ্চর্য লাগে। এই কাজটার অনেকটাই সম্ভব হয়েছে বিজলি বাতির নানান চমকপ্রদ প্রয়োগের ফলে।

বিজ্‌লি বাতির আবিষ্কারটা এডিসনের কর্ম
ঘরে ঘরে জ্বেলে আলো
ঘোচান তিনি রাতের কালো
অনেকদিনের চেষ্টা দিয়ে বোঝেন্ তিনি মর্ম :
বলে গেছেন, সফলতার প্রায় পুরোটাই ঘর্ম।

২৫ : ট্রাফিক আলোর রঙ

পলাশ বরন পাল, শেখর গুহ

পৃথিবীর নানা দেশে, নানা অঞ্চলে ঘুরলে একটা কথা সহজেই বোঝা যায় যে, এক এক জায়গার মানুষের রঙের পছন্দ এক এক রকম। ফুল-ফলের রঙের কথা বলছি না, কেননা সেগুলো তো আর মানুষের হাতে বানানো নয়। মানুষের তৈরি জিনিশেই রঙের কতো রকমফের। বিভিন্ন জায়গার বাড়ি-ঘরের রঙ বিভিন্ন রকম হয় — কোথাও হাল্কা রঙের প্রাধান্য, কোথাও গাঢ় কালচে। বাড়ির আসবাব, পরনের জামাকাপড় — সব বিষয়েই বৈচিত্র্য। কিন্তু মানুষের তৈরি একটি বিশেষ জিনিশের রঙ সর্বত্রই সমান

তা হলো ট্রাফিকের আলো। শুধু রাস্তাঘাটে চলার জন্য নয়, ট্রেনের চলার পথে যে সব সিগনাল দেওয়া থাকে, তাদেরও রঙ সব দেশে সমান।

এতে অবশ্য খুব একটা আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই, কারণ ট্রেন বা মোটোরগাড়ির যাত্রাপথ এক দেশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে এমন কোনো কথা নেই। এক দেশের সীমান্ত পেরিয়ে অন্য দেশে ঢুকলে ট্রাফিকের বা সিগনালের আলোর রঙ যদি বদলে যায়, তাহলে গাড়ি বা ট্রেন চালানোর যে অনেক অসুবিধে হয়, সে কথা বলা বাহুল্য। কিন্তু প্রশ্ন হলো, লাল-হলুদ-সবুজ এই তিনটি রঙ কেন? এর পেছনে কি কোনো কারণ আছে, নাকি আনতাবড়ি বেছে নেওয়া হয়েছিলো এই রঙ তিনটিকে?

সূর্যের আলোয় সাত রঙ এ কথাটা আমরা বলি। বাতাস যদি খুব ঝরঝরে পরিষ্কার থাকে আর সেই সময়ে আকাশে রামধনু ওঠে, তাতে সাতটা রঙই আলাদা করে দেখতে পাওয়া যায় — এক ধার থেকে শুরু করে যথাক্রমে বেগুনি নীল আকাশি সবুজ হলুদ কমলা লাল। হলুদ আর কমলার মধ্যে পার্থক্য কম, আকাশি বলতে যে রকম রঙ বোঝানো হয় তার সঙ্গে অনেক সময়েই নীলের তফাত করা যায় না। সাধারণত আমরা দেখতে পাই পাঁচটা আলাদা রঙ – বেগুনি নীল সবুজ হলুদ লাল।

এইবার ট্রাফিক আলোর কথা ভাবতে বসলেই একটা জিনিশ লক্ষ না করে উপায় নেই — তা হলো, রামধনুতে যে বর্ণালি দেখা যায়, তার এক ধারের রঙগুলোই শুধু ব্যবহৃত হয় ট্রাফিক আলোয়। এক দিক থেকে মনে হয় সেটা বেশ আশ্চর্যের,

কেননা আমরা নিশ্চয়ই চাই যে ট্রাফিকের আলোর তিনটে রঙ পরস্পরের থেকে যথাসম্ভব আলাদা হোক, যাতে তাদের মধ্যে গুলিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা একেবারে না থাকে। তাহলে রামধনুতে যে সব রঙ পাশাপাশি আছে, সেগুলো ব্যবহার না করে দূরবর্তী রঙ ব্যবহার করলেই কি ভালো হতো না? ট্রাফিক আলোর তিনটে রঙ যদি বেগুনি সবুজ আর লাল হতো তাহলেই কি তাদের মধ্যে তফাত সবচেয়ে বেশি হতো না?

তা হতো বটে। কিন্তু সেটাই সব কথা নয়। গাড়ি নিরাপদে চালানোর জন্য আমরা এও চাই যে আলোগুলো যেন সহজে দেখা যায়, বেশ খানিকটা দূর থেকেও। রেলগাড়ি ঝমাঝম যখন দুরন্ত গতিতে ছুটে আসে, তখন যতো দূর থেকে তার চালক সিগনালের আলো দেখতে পান ততোই ভালো। অসুবিধেটা হচ্ছে, দূরের সিগনালের আলো বাতাসের মধ্যে দিয়ে এসে পৌঁছোচ্ছে চালকের চোখে। আসার পথে বাতাসের উপাদান যে সব গ্যাস, তাদের অণুতে লেগে ছিটকে-ছড়িয়ে যাচ্ছে সেই আলো অর্থাৎ আলোর বিক্ষেপণ হচ্ছে। উনবিংশ শতাব্দীতে লর্ড র‍্যালে দেখিয়েছিলেন, আলোর বিক্ষেপণ তার তরঙ্গদৈর্ঘ্যের ওপর খুব বেশিমাত্রায় নির্ভরশীল। একটা আলোর তরঙ্গের দৈর্ঘ্য যদি দ্বিতীয়টার দুগুণ হয়, তাহলে একই রকম পরিস্থিতিতে দ্বিতীয়টির বিক্ষেপণ হবে প্রথমটির তুলনায় ২ × ২ × ২ × ২ বা ষোলো গুণ বেশি।

কর্তব্য তাহলে পরিষ্কার। বিক্ষেপণ যেখানে কাম্য নয়, সেখানে ব্যবহার করতে হবে যথাসম্ভব বড়ো দৈর্ঘ্যের তরঙ্গ। আমাদের দৃষ্টির ক্ষমতার সীমার মধ্যে লাল রঙের আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্যই সবচেয়ে বেশি। ক্রমশ কমের দিকে গেলে পাবো কমলা, হলুদ, সবুজ। কমলা হলে তফাতটা বড্ডোই কম হয়ে যাবে, সে কথা আগেই বলেছি। নীল বা বেগুনির তরঙ্গদৈর্ঘ্য আরো ছোটো, বিক্ষেপণও বেশি। অতএব লাল-হলুদ-সবুজ, এই হলো ট্রাফিকের আলোর রঙ।

এর পরেও আরো বলা যায়। তিনটে রঙ নাহয় ঠিক করা হলো, কিন্তু তার কোনটা কোথায় বসবে? একটু ভেবে দেখলেই বোঝা যায়, ট্রাফিকের আলোর সবচেয়ে দরকারি কাজ হচ্ছে ট্রাফিক থামানো। দাঁড়িয়ে থাকা গাড়ি যদি আলোর সঙ্কেত দেখতে না পেয়ে চলতে শুরু না করে তাহলে পেছনের গাড়ির বিরক্তি লাগতে পারে, কিন্তু তাতে অন্তত দুর্ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা নেই। কিন্তু চলন্ত গাড়ি যদি ট্রাফিক আলো দেখতে না পেয়ে চৌমাথায় না থামে তাহলে আড়াআড়ি দিক থেকে আসা গাড়ির সঙ্গে ধাক্কা লাগবে। অতএব গাড়ি থামানোর কাজটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, যে কথা বলছিলাম। থামানোর জন্য ট্রাফিকের যে আলো, সেটা তাই লাল রঙের - অর্থাৎ যার তরঙ্গদৈর্ঘ্য সবচেয়ে বেশি, যার বিক্ষেপণ সবচেয়ে কম।

●—○—◆—○—●

এতোক্ষণ যা বলা হলো, যুক্তির দিক থেকে তা বেশ আকর্ষণীয় হলেও, একটা প্রশ্ন না তুলে উপায় নেই সত্যিসত্যি কি এতোসব ভেবেচিন্তে ট্রাফিক আলোর রঙ ঠিক করা হয়েছিলো? নাকি লাল-হলুদ-সবুজ বেছে নেওয়াটা নেহাত কাকতালীয়? বা অন্য কোনো কারণে বেছে নেওয়া হয়েছিলো এই সব রঙ?

এ রকম সন্দেহের নানা কারণ আছে। বিক্ষেপণের কথাই যদি ধরা যায়, তাহলে এ কথা না মেনে উপায় নেই যে বিক্ষেপণ সবচেয়ে বেশি হয় কুয়াশা হলে। কাজেই, কুয়াশার মধ্যেও যাতে আলো ভালোভাবে দেখা যায় দূর থেকে, সে রকম ব্যবস্থা করা উচিত। কুয়াশা হলে বাতাসে ভেসে বেড়ায় সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম জলকণা, যাদের এক-একটার ব্যাস মোটামুটি ১ থেকে ১০ মাইক্রোমিটার। দৃশ্য আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য ৪০০ থেকে ৭০০ ন্যানোমিটার, অর্থাৎ আধ মাইক্রোমিটারের আশেপাশে। তার মানে, বাতাসে যে জলকণা ভাসে বলে কুয়াশা হয়, তার ব্যাস আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্যের তুলনায় ২ থেকে ২০ গুণ বড়ো। লর্ড র‍্যালের যে সূত্রের কথা একটু আগে বলা হলো, তাতে ধরে নেওয়া হয় যে বিক্ষেপণের কেন্দ্র, অর্থাৎ যার সঙ্গে ধাক্কা লেগে বিক্ষেপণ হচ্ছে, তার মাপ আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্যের চেয়ে অনেক কম – অন্তত ১০ ভাগের ১ ভাগ। বাতাসের গ্যাসের অণু যদি বিক্ষেপণের কেন্দ্র হয়, তাহলে র‍্যালের সূত্র সানন্দে ব্যবহার করা যায়, কিন্তু বাতাসে ভাসমান জলকণার ক্ষেত্রে সে নিয়ম খাটে না। আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্যের চেয়ে খানিকটা বড়ো মাপের বস্তুকণা থেকে আলোর বিক্ষেপণ কীভাবে হয়, তা বার করেছিলেন গুস্টাফ মী এবং লুডভিগ লোরেন্স নামে দুই বিজ্ঞানী, বিংশ শতকের গোড়ায়। তাঁদের গবেষণা থেকে দেখা গিয়েছিলো, মাইক্রোমিটার বা তার চেয়ে বড়ো মাপের বস্তুকণা থেকে আলো কীভাবে কতোটা বিক্ষেপিত হবে, তা আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্যের ওপর খুব একটা নির্ভর করে না। তা যদি হয়, তাহলে বিক্ষেপণের কারণে লাল-হলুদ-সবুজ বেছে নেওয়ার যৌক্তিকতা আর থাকে না!

শুধু এইটুকু হলেও ক্ষতি ছিলো না। বলা যেতে পারতো, বেশ তো, জলকণা থেকে বিক্ষেপণের ব্যাপারে যদি সব রঙই সমান হয়, তাহলে রঙ বাছাই করে সে বিক্ষেপণ কমানো যাবে না। বাতাসের গ্যাসের অণু থেকে বিক্ষেপণটাই তাহলে কমাবার চেষ্টা করা উচিত, এবং সে জন্য বেশি তরঙ্গদৈর্ঘ্যের যে সব রঙ, সেই সব রঙের আলোই ব্যবহার করা উচিত। কিন্তু অন্য একটা কথা ভাবা হয়নি। জলের মধ্যে দিয়ে যখন আলো যায়, তখন তার খানিকটা শোষিত হয়। এই ঘটনাটা কিন্তু তরঙ্গদৈর্ঘ্যের ওপর নির্ভর করে, এবং লাল আলোই শোষিত হয় সবচেয়ে বেশি। লাল শুষে গিয়ে নীলের অনুপাত বেড়ে যায় বলেই খুব পুরু জলের মধ্যে দিয়ে এলে সূর্যের আলোকেও সামান্য নীল দেখায়। যেমন, খুব বড়ো অ্যাকোয়ারিয়াম যদি থাকে, তার মধ্যে দিয়ে তাকালে এ রকম মনে হয়।

তাহলে হিসেব করাটা শক্ত হয়ে গেলো। লাল আলো হলে বাতাসের অণু থেকে বিক্ষেপণ কম হয়, কিন্তু শোষণ বেশি হয়। নীল হলে বিক্ষেপণ বেশি, শোষণ কম। এই দু দিকের টানা-পোড়েনে কার জিত হয়, সে সব হিসেব কষে বার করে ট্রাফিকের আলোর রঙ ঠিক করা হয়েছিলো, সে কথা খুব বিশ্বাসযোগ্য মনে হয় না।

তাই মনে হয়, হয়তো রঙগুলো ঠিক করা হয়েছিলো সম্পূর্ণ অন্য কোনো কারণে। রক্তের রঙ লাল বলে লাল রঙের সঙ্গে বিপদের একটা যোগাযোগ আমরা মনে মনে কল্পনা করি। হয়তো তা থেকেই ট্রাফিক আলোর রঙ লাল -- অর্থাৎ 'সাবধান, নইলে বিপদ'।

আর সবুজ? রেলগাড়ির সিগন্যালে আলোর ব্যবহার যখন শুরু হয়েছিলো, তখন সবুজ রঙ থাকতো না। থামবার জন্য লাল, চলবার জন্য সাদা। কিন্তু লাল রঙের আলো করা হতো সাদা আলোরই সামনে লাল কাচ বসিয়ে। অনেক সময়ে হাওয়ায় কাচ পড়ে ভেঙে যেতো, তাতে লাল আলোকেও সাদা দেখাতো। যেখানে থামার কথা, সেখানে এই রঙের ভুলে ট্রেন চালিয়ে দেওয়ার ফলে দুর্ঘটনা ঘটতো। সে সব এড়ানোর জন্য ঠিক হয়, চলবার ইঙ্গিত দেওয়ার জন্য রঙিন আলো থাকবে। কেন তার জন্য সবুজ রঙই বেছে নেওয়া হলো, তা অবশ্য স্পষ্ট নয়। হয়তো যেখানে ট্রাফিক আলোর ব্যবহার শুরু হয়, সেখানে সবুজ কাচ সহজলভ্য ছিলো, নীল কাচ ছিলো না -- এ রকম কোনো কারণে সবুজ কাচের ব্যবহার শুরু হয়েছিলো!

ট্রেন থেকে শুরু। পরে যখন মোটোরগাড়ির চল হয়, তখন গাড়ি-চলার পথেও এই রঙের আলোই দেওয়া হলো। তৃতীয় আলোর ব্যবহার শুরু হয়েছিলো আরো খানিক পরে। প্রথমদিকে থাকতো কেবল দুটি রঙেরই আলো।

বিশ্ব-জুড়ে চলে গাড়ি একই নিয়মমাফিক
তিনটি রঙেই নিয়ন্ত্রিত হয় যে দেখি ট্রাফিক
জ্বললে পরে সবুজ বাতি
মেলে চলার অনুমতি
লালটা হলো যাওয়ার নিষেধ, সর্বত্রই তা ঠিক।

২৬ : পোশাক-আশাকের রঙ

পলাশ বরন পাল

কথায় বলে, 'আপ রুচি খানা, পর রুচি পরনা।' অর্থাৎ খাওয়াদাওয়া নিজের ইচ্ছে মতো করা যেতেই পারে, কিন্তু পোশাক-আশাক নির্বাচন করার সময়ে অন্যদের সামগ্রিক পছন্দের কথা মাথায় রাখতে হবে। কথাটা অনেকের মনঃপূত নয়, নিজের ইচ্ছেমতোন জামাকাপড় পরার স্বাধীনতাটুকু আমাদের ব্যক্তিস্বাধীনতার অংশ বলে আমরা অনেকেই বিশ্বাস করি। কী রকম পোশাক পরা হবে, শাড়ি-ব্লাউজ না সালোয়ার-কামিজ, পায়জামা-পাঞ্জাবি না শার্ট-প্যান্ট, এ সব নিয়ে তবু সমাজের রীতিনীতি একেবারে উপেক্ষা করা যায় না, কিন্তু পোশাকের রঙ? সেটা তো পুরোপুরি ব্যক্তিগত ব্যাপার বলেই মনে হয়!

না, ভুল হলো। "পুরোপুরি" কথাটা যে ঠিক নয়, তা একটু ভাবলেই বোঝা যায়। ফুটবল বা হকি খেলার সময়ে এক দলের সবাই একই রঙের জামা পরেন, যাতে খেলার সময়ে নিজের দলের খেলোয়াড়দের চিনতে সুবিধা হয়। বহু ইশকুলে ছাত্রছাত্রীদের যেতে হয় নির্দিষ্ট রঙের পোশাক পরে। এতে যাওয়া-আসার পথে তাদের ইশকুলের পরিচয় পাওয়া যায়, কিন্তু সেটাই মুখ্য কারণ নয়। শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে চলার অভ্যেস যাতে তৈরি হয়, তার একটা প্রচেষ্টা চালানো হয় পোশাকের মাধ্যমে। কিশোর বয়সের পড়ুয়ারা যাতে ইশকুলে একে অপরের পোশাকের রঙ বা ফ্যাশনের আলোচনায় না মাতে তারও একটা ব্যবস্থা হয়। সৈন্যদলে সেনাদের নির্দিষ্ট রঙের পোশাক পরতে হয়, অনেক বড়ো বড়ো দোকানের কর্মচারীদের একই রঙের পোশাক পরতে হয়, এ সব কিছুর পেছনে মূল কারণ এই দুটিই — হয় চিনতে পারার সুবিধে, নয়তো শৃঙ্খলা।

কিন্তু এই সব নিয়মের গণ্ডির বাইরে কি লোকে যথেচ্ছ রঙের পোশাক পরে সব সময়ে? চট করে 'হ্যাঁ' বলার ইচ্ছে হতে পারে, কিন্তু উত্তরটা অতো সহজ নয়। উদাহরণ দিলেই কথাটা স্পষ্ট হবে।

আরবের ধু-ধু মরুভূমির ওপর দিয়ে বেদুইনরা যখন যায়, তাদের পরনে থাকে সাদা আলখাল্লা। দল চিনবার সুবিধার জন্য নিশ্চয়ই এ রকম প্রথা গড়ে ওঠেনি, তা

যদি হতো তাহলে এক এক গোষ্ঠীর বেদুইনদের আলখাল্লার রঙ হতো এক এক রকম, ফুটবলের মাঠে ঠিক যে কারণে দুই দলের জামা দু রঙের হয়। আসলে এর কারণটা প্রাকৃতিক। মরুভূমির প্রচণ্ড গরমে, প্রখর রৌদ্রের মধ্যে দিয়ে যেতে হয় এই বেদুইনদের। রোদের তাপ গায়ে যতো কম লাগে ততোই ভালো। তাই দরকার সাদা রঙ, কেননা সাদা রঙের জিনিশের ওপর যে আলো এসে পড়ে, সাদা জিনিশটি তার মোটামুটি সবটাই ফিরিয়ে দেয়। গাঢ় রঙের পোশাক হলে তা শুষে নিতো খানিকটা আলো, তাই পোশাক গরম হয়ে যেতো, তার সংস্পর্শে শরীরও গরম হয়ে যেতো তাড়াতাড়ি।

এখানে একটা কথা একটু পরিষ্কার করে নেওয়া উচিত। সূর্য থেকে তো আসছে আলো! আর বেদুইনদের শরীর আরামে রাখার জন্য প্রয়োজন তাপ ঠেকানো। আলো আর তাপ তো এক জিনিশ নয়!

ঠিক কথা। কিন্তু দুয়ের মধ্যে একটা বিরাট মিল আছে দুটোই হলো শক্তি। শক্তির নানা রূপ আছে, তার একটি আলো, একটি তাপ। অন্যান্য রূপের কথা এখন না ভাবলেও চলবে। যে কথাটা তার চেয়ে জরুরি, তা হলো, শক্তি রূপ থেকে রূপান্তরে যেতে পারে, কিন্তু শক্তির পরিমাণ বদলায় না। একে বলে *শক্তি সংরক্ষণ সূত্র*। অর্থাৎ শক্তির ক্ষয়-ব্যয় নেই, শক্তি তৈরিও করা যায় না, এক রকমের শক্তি অন্য রকমের শক্তিতে রূপান্তরিত করা যায় মাত্র।

ধরা যাক আমাদের শরীরে আলো এসে পড়লো, এবং শরীর শুষে নিলো সেই আলো। আলোর শক্তি ছিলো। কী হলো সেই শক্তি? শক্তি উবে যেতে পারে না, সে কথা আগেই বলেছি। তাহলে শরীরে নিশ্চয়ই সঞ্চিত হলো আলোর সেই শক্তি। কীভাবে সঞ্চিত হলো?

শরীর বিভিন্ন অণু-পরমাণু দিয়ে তৈরি। এই সব অণু-পরমাণুই টেনে নিলো সেই শক্তি। কোনো একটা অণু বা একটা পরমাণুর মধ্যেই সবটা শক্তি গেলো না, সবাই ভাগাভাগি করে নিলো। এই সব করে অণু-পরমাণুদের গড় শক্তি বেড়ে গেলো। অণুদের গড়পড়তা শক্তি বেড়ে গেলেই তাপমাত্রা বেড়ে যায়, অর্থাৎ জিনিশ গরম হয়ে যায়।

প্রশ্ন উঠতে পারে, যে কোনো আলো পড়লেই কি তাহলে শরীর গরম হয়ে যাবে? এক কথায় এর উত্তর হচ্ছে — হ্যাঁ। জোছনা গায়ে পড়লেও শরীর গরম হয়, রাত্তিরে ঘরে যে বাতি জ্বলে তার আলোতেও হয়। আলো কেন, অন্য যে কোনো রকম শক্তি এসে পড়লেও গা গরম হয়, যদি শরীর সে শক্তি শুষে নিতে পারে। তবে কিনা বাতি থেকে মোট যতোটা শক্তি গায়ে এসে পড়ে তার পরিমাণ খুবই সামান্য, তাই শরীর যতোটুকু গরম হয় তা ধর্তব্যের মধ্যেই পড়ে না। আমরা বুঝতেও পারি না। রোদ্দুর যদি খুব জোরালো না হয় তাহলেও শরীর গরম হওয়া নিয়ে সমস্যা হয় না। যখন খুব গরম পড়ে, তখন সূর্যের আলোয় বিশাল পরিমাণে শক্তি ধেয়ে আসে আমাদের দিকে। পোশাক যদি তার খানিকটাকে গায়ে ঘেঁষতে না দেয়, তাহলে ভালো।

যে জিনিশের সাদা রঙ, তা সূর্যের আলোর সমস্ত রঙকেই মোটামুটি পুরোপুরি ফিরিয়ে দেয়। সেইজন্যই ফিরিয়ে দেওয়া আলোটাও সূর্যের আলোর মতোই সাদা লাগে আমাদের চোখে। গরম রোদ্দুরের মধ্যে ঘুরতে হলে সাদা পোশাক পরলেই তাই সবচেয়ে লাভ। অন্য রঙের জামা যদি হয়, ধরা যাক লাল, তাহলে সূর্যের আলোর লাল ছাড়া অন্য সব রঙ সেই জামা শুষে নেবে, গরম হয়ে যাবে, তার সংস্পর্শে শরীরও গরম হয়ে যাবে। সবচেয়ে খারাপ হলো কালো, কারণ কালো সব রঙের আলোকেই শুষে নেয়, ফলে গরমও হয়ে যায় তাড়াতাড়ি। একটা সাদা জামা আর একটা কালো জামা পাশাপাশি রোদ্দুরের মধ্যে খানিকক্ষণ রেখে দিয়ে তারপর দুটোকে হাত দিয়ে ধরলেই তফাতটা বোঝা যায়।

এর মধ্যে আরো একটু কথা আছে। সূর্য থেকে আলো আসে ঢেউয়ের আকারে। উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে ম্যাক্সওয়েল বলেছিলেন, বৈদ্যুতিক বা চুম্বকীয় যে কোনো আন্দোলনই ঢেউয়ের মতো প্রবাহিত হয়, এবং আলোও এই রকমেরই ঢেউ। এক একটা তরঙ্গের দৈর্ঘ্য যদি ৪০০ থেকে ৭০০ ন্যানোমিটারের মধ্যে হয়, তাহলে আমাদের চোখে সেই ঢেউ এক রকমের সাড়া জাগায়। অর্থাৎ ওইটুকু চৌহদ্দির মধ্যে যে ঢেউ, সেই ঢেউকেই আমরা 'আলো' বলি। দৃশ্যমান আলোর মধ্যে লাল ঢেউই সবচেয়ে লম্বা। তার চেয়েও লম্বা ঢেউ হলে তাকে 'অবলোহিত' রশ্মি বলা হয়। এই অবলোহিত রশ্মির কথা একটু বিশেষ করে না ভেবে উপায় নেই। তার কারণ, সূর্য থেকে যতো শক্তি আসে তার মধ্যে অবলোহিতের পরিমাণ নেহাত ফেলনা নয়। তার ওপরে, আমাদের শরীর এই অবলোহিত রশ্মি শোষণ করে নেওয়ার ব্যাপারে খুব পটু।

সেইসঙ্গে ভাবতে হবে অতিবেগুনি রশ্মির, অর্থাৎ ৪০০ ন্যানোমিটারের চেয়ে ছোটো দৈর্ঘ্যের ঢেউয়ের কথাও। সূর্যালোকে এর পরিমাণও তুচ্ছ নয়, এবং অতিবেগুনি রশ্মি চামড়ায় বেশি পরিমাণে পড়লে চামড়ার ক্ষতি হয়। একেও যথাসম্ভব ঠেকানোর চেষ্টা করা উচিত।

এমন কোনো জিনিশ নেই, যা সব তরঙ্গদৈর্ঘ্যের ঢেউকে একেবারে পুরোপুরি ফিরিয়ে দিতে পারে। যে সাদা পোশাক ৪০০ থেকে ৭০০ ন্যানোমিটারের ঢেউকে ফিরিয়ে দিচ্ছে, তা যে অতিবেগুনি বা অবলোহিতকেও ফেরাবে তার নিশ্চয়তা কোথায়?

সত্যি বলতে গেলে, নিশ্চয়তা নেই। আবার এ কথাও ঠিক, কাঁটায় কাঁটায় ৭০০ ন্যানোমিটারে বিশাল কোনো পাঁচিল আছে, সে কথাও মেনে নেওয়া মুশকিল। যে জিনিশ ৪০০ থেকে ৭০০ ন্যানোমিটারের ঢেউকে হেলায় ফিরিয়ে দিচ্ছে, তার ফিরিয়ে দেওয়ার ক্ষমতা যে ৭০০-তেই শেষ হয়ে যাচ্ছে সে কথাও ভাবার কোনো কারণ নেই। বরং এইটাই ভেবে নেওয়া স্বাভাবিক যে ৭০০-র পরেও বেশ কিছুদূর সক্রিয়তা বজায় থাকে এই সব জিনিশের, অবলোহিত রশ্মিও শোষিত না হয়ে প্রতিফলিত হবে এদের ওপর পড়লে। একই কথা সত্যি দৃশ্যমান আলোর অন্য সীমান্তেও, অর্থাৎ ৪০০-র

কম তরঙ্গদৈর্ঘ্যের ক্ষেত্রেও। বেদুইনরা নিশ্চয়ই এ কথাটা বুঝতে পেরেছিলো অভিজ্ঞতার মাধ্যমে, তাই তারা সাদা পোশাক পরেই ঘুরে বেড়ায়।

কথাটা পুরোপুরি ঠিক কিনা, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন একদল বিজ্ঞানী। বেদুইনরা দু-প্রস্থ পুরু-পুরু ঢোলা পোশাক পরে। ওপরের জোব্বা আর ভেতরের জোব্বার মধ্যের যে ফাঁক সেখান দিয়ে হাওয়া বইতে থাকে, সেইটাই নাকি তাদের শরীরকে ঠান্ডা রাখার কাজে প্রধান ভূমিকা নেয়। অর্থাৎ ওপরের জামাটা যে রঙেরই হোক, নিচের জামাটার তাপমাত্রায় বিশেষ তারতম্য হয় না - কারণ দুই জামার মাঝখানের হাওয়ার স্রোত নিচের জামাটাকে ঠান্ডা রাখে।

তবে এই বিজ্ঞানীরাও কিন্তু স্বীকার করছেন যে, ওপরের জামাটা কতোটা ঠান্ডা বা গরম থাকবে সে ব্যাপারে প্রধান ভূমিকা নেয় রঙ। সাদা জামা হলে তা যে কালো জামার তুলনায় অনেক ঠান্ডা থাকবে, এ তাঁরা রীতিমতো মাপজোক করে দেখিয়েছেন। তাই যেখানকার জলবায়ুতে আর্দ্রতা বেশি, দু প্রস্থ পুরু জামা পরলে ঘামে কষ্ট পেতে হবে, সেখানে সাদা জামাই শরীর ঠান্ডা রাখার পক্ষে শ্রেষ্ঠ।

আমাদের দেশের মানুষ এই জ্ঞান অর্জন করেছিলো অভিজ্ঞতার মাধ্যমে, আমাদের সাবেকি পোশাকে তাই সাদারই প্রাধান্য। মেয়েদের পরনে রঙচঙে পোশাক থাকাট খুব বিরল ছিলো না -- হয়তো মেয়েরা বাইরে কম বেরোতো বলেই। কিন্তু বাংলার একটু বয়স্ক মহিলাদের পরনে সাদা খোলের শাড়িই বেশি দেখা যেতো কয়েক দশক আগে পর্যন্ত। আর পুরুষদের মোটামুটি সকলেরই পরনে থাকতো সাদা ধুতি, সঙ্গে সাদা উত্তরীয় বা সাদা পিরান।

কিন্তু এখন আমাদের পোশাকে সাদা রঙ এতো দেখতে পাওয়া যায় না। তার একটা কারণ, শরীরকে ঠান্ডা রাখার অনেক নতুন উপায় বেরিয়েছে গত শ খানেক বছরে। আগে বৈদ্যুতিক পাখা ছিলো না, হাওয়া ঠান্ডা করার যন্ত্র তো দূরস্থান! তাই তখন শরীর শীতল রাখার জন্য পোশাকের রঙের সাহায্য নেওয়াটা অনেক বেশি জরুরি ছিলো। এখন এতো রকম উপকরণ বেরোনোর পরেও পোশাকের বাড়তি সাহায্যটুকু থাকলে ক্ষতি কিছু হতো না, কিন্তু এ সম্পর্কে বোধটাই অনেকটা লোপ পেয়েছে।

আরো একটা কারণ আছে। গত শখানেক বছরে আমাদের পোশাকের ওপর ইউরোপীয় পোশাকের প্রভাব পড়েছে। ইউরোপে ঠান্ডা বেশি, তাই সেখানে পোশাকের ওপর যে আলো বা তাপ পড়ে সেটা ফিরিয়ে দেওয়ার চেয়ে শুষে নিয়ে শরীরে চালান করার চেষ্টা করাটাই দরকারি। তাই পশ্চিম ও উত্তর ইউরোপের পোশাকে গাঢ় রঙই প্রাধান্য পেয়েছে, ইউরোপীয়রা শীতের দিনে যে কোট-প্যান্ট পরে তার রঙ প্রায় অবধারিতভাবে কালো, বা তা না হলে খুব গাঢ় কোনো রঙ।

শুধু পোশাকের রঙই নয়। বাড়ি-ঘর-দোরের রঙও নির্ধারিত হয় এই সব কারণ দিয়ে। আমাদের দেশে বাড়ির রঙ বেশির ভাগই সাদা বা খুব ফিকে হলুদ, কারণ তাহলে

বাড়ির দেওয়াল বেশি তাপ শোষণ করে না, গরম হয়ে ওঠে না চট করে। ইউরোপের দক্ষিণের কিছু অংশে, যেখানে ভূমধ্য সাগরের প্রভাবে গরম বেশি, সেখানে প্রায় সব বাড়ির রঙ ধবধবে সাদা হয়। আবার উত্তর ইউরোপে ঠান্ডার প্রাধান্য, তাই সেখানে বাড়ি হয় গাঢ় রঙের।

সাদা জামা ঠিকরোয় সব রঙা আলো
তাই তো গরম দেশে সাদা পরা ভালো।
যেখানে শীতের বুড়ি
দেয় হাড়ে সুড়সুড়ি
সেখানে আরাম পেতে পরা চাই কালো।

২৭ : রঙ বানানো

শেখর গুহ

খুব ঠান্ডা পড়ে যে সব দেশে, সেখানে যারা কিছু সময়ও কাটিয়েছে তারা জানে যে ধূসর বিবর্ণ শীতের দিনগুলি শেষ হয়ে যখন নানা রঙে ভরা বসন্ত আসে, তখন মন আপনিই কেমন খুশিতে ভরে ওঠে। নানা রঙের বৈচিত্র্য আমাদের মনকে আনন্দ দেয় বলেই বোধহয় মানুষ তার নিজের গড়া জিনিশেও রঙ লাগাতে চায়। তার আঁকা ছবিতে, ছাপানো বইতে, প্রসাধনে, পোশাকে, দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহার করা নানা জিনিশে, বাড়ির ভিতর ও বাইরে, যানবাহনের গায়ে, এমনকি কেবল মনোরঞ্জনের জন্য দেখা ছায়াছবিতেও সাধারণত সাদা-কালোর চেয়ে রঙচঙেটাই লোকে পছন্দ করে বেশি। কী করে এবং কবে থেকে মানুষ তৈরি করেছে এতোসব রঙ?

ঐতিহাসিকদের মতে, মানুষের শিল্পকলার ইতিহাস অতি প্রাচীন। লেখাপড়া শুরু করার বহু আগে থেকেই মানুষ ছবি আঁকতে ও তাতে রঙ লাগাতে শিখেছে। ২০০০ সালে আফ্রিকায় জাম্বিয়া দেশের রাজধানী লুসাকার কাছে একটা জোড়া-নদীর পাড়ে গুহার মধ্যে পাওয়া গেছে কিছু রঙ এবং রঙ গুঁড়ো করার সরঞ্জাম। মনে করা হয়, সেগুলির বয়স প্রায় চার লক্ষ বছর। ফরাসী দেশের দক্ষিণ-পশ্চিম ও স্পেন দেশের উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে লাসকো, আলতামিরা ইত্যাদি গুহায় পাওয়া গেছে প্রাগৈতিহাসিক মানুষের আঁকা বাইসন, সিংহ, ঘোড়া, হরিণ ইত্যাদি বন্য প্রাণীর ছবি। ২০ থেকে ৩০ হাজার বছর পুরোনো এইসব ছবির অসাধারণ নৈপুণ্য ও শিল্পকলা সকলের মন কেড়ে নেয়।

ইউরোপের সে প্রাচীন শিল্পীরা রঙ জোগাড় করতো প্রকৃতির নানা উপাদান থেকে। কোথাও হয়তো মাটিতে মিশে থাকতো প্রচুর লৌহ অক্সাইড। সে মাটি থেকে পাওয়া যেতো লাল ও বাদামী রঙ। ম্যাঙ্গানিজ অক্সাইডে ভরা মাটি জোগাতো নীল, লৌহ কার্বনেট থেকে আসতো সবুজ রঙ। কাঠকয়লা দিতো কালো, আর চুনাপাথর বা ঝিনুকের খোলা গুঁড়ো করে সাদা রঙ পাওয়া যেতো। পরে যখন হিমযুগ শেষ হয়ে ওসব

অঞ্চলে গাছপালার প্রাচুর্য দেখা দিলো, তখন গাছের পাতা-ফুল-ফল থেকে আরো কতো রকম রঙ তখনকার শিল্পীরা পেতো।

মহেঞ্জোদারোর লোকেরা রঙিন পোশাক পরতো, প্রত্নতাত্ত্বিকেরা তার প্রমাণ পেয়েছেন। বৈদিক যুগে, অর্থাৎ আড়াই হাজার থেকে তিন হাজার বছর আগে ভারতে যে নানা রঙের পোশাক প্রচলিত ছিলো, এবং সেগুলি রাঙানো হতো কোনো না কোনো গাছের হলুদ, নীল ইত্যাদি ফসল থেকে, তার উল্লেখ রয়েছে অথর্ববেদে। ওই একই সময় নাগাদ ফিনিশীয় সভ্যতায় টায়ার অঞ্চল থেকে পাওয়া এক বিশেষ ধরণের শামুকের শ্লেষ্মা দিয়ে তৈরি করা হতো একটা ময়ূরপঙ্খী রঙ। রঙটা তৈরির পদ্ধতি ছিলো এমনই জটিল যে সে রঙে ছোপানো কাপড়ের দাম হতো অত্যন্ত বেশি। কেবল অতি ধনীরাই সে পোশাক কিনতে পারতো বলে "টাইরীয় ময়ূরপঙ্খী" রঙটা দিয়েই চিহ্নিত হতো সে পোশাকের অধিকারীর ঐশ্বর্য ও ক্ষমতা।

কালি দিয়ে লেখার কাজটা আজ থেকে হাজার পাঁচ বছর আগে চীনদেশে শুরু হয়েছে বলে মনে করা হয়। প্রদীপের তেলে পাইন কাঠের ধোঁয়া মিশিয়ে সেটাকে জন্তুজানোয়ারদের চামড়ার নির্যাস দিয়ে ক্রমাগত ঘন করে তৈরি হতো সে কালো কালি। সেকালের অন্যান্য সভ্যতাও নানারকম গাছের ফল বা মাটি দিয়ে কালি তৈরি করেছে। মিশরের প্রাচীন সভ্যতায় — আজ থেকে প্রায় সাড়ে চার হাজার বছর আগে — দেবতাদের নাম লেখা হতো লাল কালি দিয়ে, অন্য সব লেখা থেকে আলাদা করে দেখানোর জন্যই হয়তো। নীল কালি ব্যবহারের হদিশ পাওয়া গেছে এখন থেকে অন্তত ষোলোশো বছর আগে, চীনদেশে। ফেরাস সালফেট নামে লোহা ও গন্ধকের একটা যৌগের সঙ্গে বাদাম থেকে পাওয়া ট্যানিন নামে একটা পদার্থ মিশিয়ে তৈরি হতো সেই ঘন নীল কালি। মধ্যযুগে অর্থাৎ ৮০০ থেকে ১৫০০ খ্রিষ্টাব্দ অবধি — ইউরোপে পুঁথি লেখা হতো ভেড়ার চামড়া দিয়ে তৈরি পাতায়। তার উপরে লেখা হতো কালি দিয়ে। গাছের ডাল জলে ফুটিয়ে, তার মধ্যে আঙুরের মদ মিশিয়ে সে মিশ্রণটা রোদ্দুরে খানিকটা শুকিয়ে ঘন করে তৈরি হতো সে কালি।

লেখার কালিতে বা ছবি আঁকার জন্য যে সব তেল রঙ বা জল রঙ ব্যবহার করা হয়, সেগুলিকে ইংরিজিতে বলে 'পিগমেন্ট', বাংলা পরিভাষায় তার নাম 'রঞ্জক'। কাপড় ছোপানোর কাজে সাধারণত যে রঙ ব্যবহার করা হয় ইংরিজিতে তাকে বলে 'ডাই' — বাংলায় সেটাকেও 'রঞ্জক' বলা হয়। দুটোর মধ্যে তফাত আছে। পিগমেন্ট তেল বা জল জাতীয় তরল-মাধ্যমে ভেসে থাকে। ছবির উপর তুলি দিয়ে এই রঙ বসিয়ে দেওয়ার পরে যখন তরলটা বাতাসে শুকিয়ে উবে যায় - ছবির গায়ে লেগে থাকে শুধু রঙের গুঁড়োগুলো, তাই ছবিটা দেখতে রঙিন লাগে।

ইংরিজিতে যাকে ডাই বলে সে রঙ তরলমাধ্যমে সম্পূর্ণ গুলে থাকে, জলে মেশানো চিনি বা নুনের মতোন। বিজ্ঞানের ভাষায় এই গোলাটাকে বলে দ্রবণ। পিগমেন্ট আর

ডাই আলাদা করার জন্য আমরা প্রথমটাকে 'গুঁড়ো রঙ', আর দ্বিতীয়টিকে শুধুই 'রঞ্জক' বলবো।

আধুনিক যুগে রাসায়নিক উপায় দিয়ে মানুষ নানান কৃত্রিম রঙ তৈরি করে। আগেকার দিনে রঙ পেতে হলে মানুষকে নির্ভর করতে হতো পৃথিবীর মাটি বা খনি থেকে পাওয়া রঙের উপরে, অথবা জোগাড় করতে হতো গাছপালা বা প্রাণীজগতের উপাদান থেকে।

কিন্তু সব রকম রঙ প্রকৃতি থেকে খুব সহজে পাওয়া যেতো না। ইউরোপের নবজাগরণের সময়ে যখন ছবি আঁকার জগতে নতুন উদ্যম এলো, তখন শিল্পীরা ঘন নীল রঙটা পেতেন লাপিস-লাজুলি নামে একটা বেশ দুষ্প্রাপ্য ও দামি পাথর থেকে। ফ্ল্যান্ডার্স-বাসী ওলন্দাজ শিল্পী ইয়ান ভান আইখ তাঁর আঁকা ছবিতে ওই নীল রঙটা খুব বুঝেশুঝে ব্যবহার করতেন। লাপিস-লাজুলির নীল রঙটা তিনি অন্য কোনো রঙের সঙ্গে মেশাতেন তো না-ই — কেউ যদি ছবিতে সে নীল রঙটা চাইতো তাহলে তিনি সে ছবি আঁকার জন্য বেশি পয়সাও নিতেন।

লাপিস-লাজুলি থেকে যেমন নীল রঙ, তেমনি লাল রঙের গুঁড়ো পাওয়া যেতো সিঁদুর বা হিঙ্গল থেকে। পারা ও গন্ধকের এই যৌগটা একটা খনিজ পদার্থ, অনেক হাজার বছর ধরে মানুষ তা ব্যবহার করেছে।

ইতালি দেশের শিল্পী তিনতোরেত্তোর বাবা ছিলেন এক নামকরা রঙ-ব্যবসায়ী। তিনতোরেত্তোর আঁকা ছবিতে বিভিন্নভাবে ব্যবহার করা হয়েছে কোচিনিল নামে একটা পোকা থেকে পাওয়া লাল রঙ। কলম্বাসের আবিষ্কারের সাত-আটশো বছর আগেও মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকার নানান অঞ্চলে এই পোকা থেকে পাওয়া রঙের প্রচলন ছিলো। স্পেন দেশের মানুষ যখন সাগরপাড়ি দিয়ে মেক্সিকোতে আজটেক সাম্রাজ্য আক্রমণ করলো, তখন ওই রঙটার মূল্য তারা ভালোই বুঝেছিলো। স্পেনের উপনিবেশ বিস্তারের অল্প কিছুদিনের মধ্যেই ওই অঞ্চল থেকে ইউরোপে রপ্তানি করা সব জিনিশের মধ্যে দ্বিতীয় স্থান নিয়েছিলো কোচিনিল পোকার লাল রঙ, প্রথম স্থানে থাকা রুপোর ঠিক পরেই। মেয়েদের প্রসাধনে, পাদ্রীদের পোশাকে, ইংরেজ সৈন্যদের লাল কুর্তায়, এমনকি খাবারের রঙেও ওই লালের ব্যবহার খুব জনপ্রিয় হয়েছিলো -- কিন্তু রঙটার উৎস যে একটা পোকা সে খবরটা নাকি ব্যবসায়ীরা একেবারেই গোপন করে রেখেছিলো। কৌতূহলী বিজ্ঞানীরা, বিশেষ করে জীববিজ্ঞানীরা অষ্টাদশ শতাব্দীতে অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও অনুসন্ধান করে রঙটি কী দিয়ে তৈরি সেটা শেষমেশ বার করে ফেলেন।

কোচিনিল পোকারা বাস করে মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকার উষর অঞ্চলে, ক্যাকটাস জাতীয় উদ্ভিদের পাতায়। শিকারী প্রাণীদের থেকে নিজেদের রক্ষা করার জন্য পোকাগুলির শরীরে ও ডিমে কারমিনিক অ্যাসিড নামে একটা রাসায়নিক পদার্থ তৈরি হয়। পোকাগুলি শুকিয়ে গুঁড়ো করে "কোচিনিলের নির্যাস" নামে একটা লালচে রঙ

পাওয়া যায়। আবার পোকাগুলিকে অ্যামোনিয়া বা সোডিয়াম কার্বনেটের দ্রবণে একটু ফিটকিরি দিয়ে ফুটিয়ে নিলে তৈরি হয় বিশুদ্ধ লাল একটা রঙ। ফোটানোর সময়ে দ্রবণটাতে চুন মেশালে রঙটা হয় লালচে বেগুনি। আবার অন্য নানা রকম রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহার করে কমলা ইত্যাদি রঙও পাওয়া যায়।

রঙ তৈরির এ পদ্ধতিটা ছিলো খুবই পরিশ্রমের — এক কিলোগ্রাম রঙ পেতে জোগাড় করতে হতো দেড় লক্ষ মতো পোকা। তার জন্য অবশ্য ব্যবসাটার বিশেষ অসুবিধা হয়নি, কারণ মেক্সিকোতে মজুরি ছিলো খুবই শস্তা। মুশকিল দেখা দিলো যখন মেক্সিকোর লোকেরা আবদার করে বসলো যে তাদের স্বাধীনতা দিতে হবে। স্পেন তাতে রাজি না হওয়ায় শুরু হলো যুদ্ধ। ১৮১০ থেকে ১৮২০ সাল পর্যন্ত চলা সে যুদ্ধের শেষে মেক্সিকো স্বাধীন হলো, আর তার সাথে সাথে ওখান থেকে পাততাড়ি গুটিয়ে নিলো রঙ ব্যবসায়ীরা। গুয়াতেমালা, ক্যানারি দ্বীপপুঞ্জ, এই সব জায়গায় বিশাল করে তারা শুরু করলো কোচিনিল চাষের নতুন উদ্যোগ।

ব্যবসা আবার জমে উঠলো ঠিকই, কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই এলো আর এক সমস্যা ইউরোপে বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করলেন কৃত্রিম রাসায়নিক রঙ। এমনই কম খরচে সেগুলি প্রচুর পরিমাণে বানানো যেতো যে বাজারে তা চালু হওয়ার পরে কোচিনিলের ব্যবসা প্রায় উঠেই গেলো। কেবল ঐতিহ্যটা বজায় রাখার জন্য ওই পোকার চাষ একটু আধটু বাঁচিয়ে রাখা হয়েছিলো বলে হয়তো প্রযুক্তিটা পুরোপুরি বিলুপ্ত হয়ে যায়নি। কৃত্রিম জিনিশ যে নানা ভাবে মানুষের ক্ষতি করে সে বিষয়ে গত দু-এক দশকে সচেতনতা জেগেছে, আর তার সঙ্গে ওই পোকার রঙের চাহিদাও একটু বেড়েছে। ২০০৫ সালে পেরু দেশ থেকে রপ্তানি করা হয়েছে প্রায় দুশো টন কোচিনিলের রঙ। কিন্তু ওই রঙের দাম এখনো বেশি কিলোগ্রাম প্রতি প্রায় চার হাজার টাকা। সে তুলনায় কৃত্রিম রঙের দাম অনেক কম, কিলোগ্রাম প্রতি পাঁচশো থেকে হাজার টাকার মধ্যে।

ইউরোপের দেশগুলি তাদের পশ্চিম দিকের জগতে উপনিবেশ স্থাপন করে যেমন লাল রঙের ব্যবহার বাড়িয়েছিলো, ঠিক তেমনই পুব দিকের দেশগুলিতে তাদের সাম্রাজ্য ও ব্যবসার বিস্তারের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে ছিলো নীল রঙটা। ব্রিটিশ দ্বীপগুলিতে আর পশ্চিম ইউরোপের অন্য নানান দেশে বহু শত বছর ধরে নীল রঙের উৎস ছিলো 'ওয়ড' বা 'ওড' নামে একটা গাছের পাতা। [কাঠের ইংরিজি 'wood' আর রাস্তার ইংরিজি 'road', এই দুটো মিলিয়ে 'woad' শব্দ উচ্চারণ করা যায়। বাঙলায় 'w' বর্ণটার উচ্চারণ নেই বলে এখানে 'ওড'-ই লিখছি।] ব্রিটেনের লোকেরা গায়ে-মুখে ওই ওড পাতার নীল রঙ মেখে শত্রুদের ভয় দেখাতো। রোম সাম্রাজ্যের সৈন্যরা যখন প্রথম ইংল্যান্ডে হানা দেয় তখন তারা ওই রকম অদ্ভুত রঙ মাখা মানুষ দেখে অবাক হয়। গল্পে আছে, শেরউডের জঙ্গলে বীরপুরুষ রবিন হুডের দলবল সবুজ রঙের পোশাক পরতো। সম্ভবত গাছপালার সঙ্গে মিশে যাওয়ার জন্য ওটা ছিলো তাদের ছদ্মবেশ, যাতে

রাজসৈন্য তাদের ধরতে না পারে। সেই সবুজ রঙটাও নাকি আসতো ওডের নীল রঙে ছোপানো কাপড়ে মিনিয়োনেট নামে একটা বুনো গাছ থেকে পাওয়া হলুদ রঙ মিশিয়ে। সরাসরি গাছপালা থেকে সবুজ রঙটা পাওয়া খুব মুশকিল, কেননা গাছের পাতায় সবুজ রঙের পদার্থটা হলো ক্লোরোফিল, সেটা জলে সহজেই ধুয়ে যায়।

বিভিন্ন দেশে ওড গাছের পাতা থেকে নীল রঙ তৈরির কারখানা ছিলো, কিন্তু সে নীল রঙটা পাওয়ার অনেকগুলি অসুবিধাও ছিলো। রঙটা তৈরির পদ্ধতিটা ছিলো খুব জটিল, সময় ও পরিশ্রম-সাপেক্ষ, অতি নোংরা ও দুর্গন্ধযুক্ত। ইংল্যান্ডের এক রানী হুকুম জারি করেছিলেন যে তাঁর প্রাসাদের মাইল পাঁচেকের মধ্যে ওই রঙ তৈরির কোনো কারখানা থাকবে না। তার উপর ওই নীল রঙটা দেখতেও এমন কিছু আহামরি সুন্দর ছিলো না।

সে তুলনায় ভারত থেকে আসা নীল কাপড়ের কদর ছিলো অনেক বেশি। ভারতীয় নীলটা দিয়ে শুধু পশমই নয়, রেশমের জিনিশও সহজে রঙ করা যেতো, সে রঙটাতে ঘন নীল থেকে ফিকে নীলের নানা রকম বৈচিত্র্য পাওয়া যেতো, আর দেখতেও সে রঙগুলি হতো ভারি সুন্দর। কোচিনিল পোকা থেকে তৈরি লাল রঙটার মধ্যে যেমন একটা গোপনীয়তা ছিলো, নীল গাছ থেকে পাওয়া ভারতের নীল রঙে তার ছিটেফোঁটাও ছিলো না। হাজার হাজার বছর ধরে পৃথিবীর নানা দেশে ওই নীলের কথা জানা ছিলো। খ্রিস্টপূর্ব এক হাজার বছরেরও আগে বৈদিক যুগে ওই রঙের উল্লেখ রয়েছে, ভারতের সাহিত্যে রাধার নীল শাড়ির কথা আর নীল রঙের শেয়ালের গল্প অতি পরিচিত। কাছাকাছি দেশ পারস্য ও চীনে তো বটেই, আরো দূরের জাপান, সুমের, মিশর, গ্রিস, রোম ও আফ্রিকার নানান দেশের প্রাচীন সভ্যতাতেও ভারতীয় নীল কাপড়ের চল ছিলো। গ্রিসদেশের ভাষায় রঙটার নাম ছিলো 'ইন্ডিকন', অর্থাৎ 'ভারত থেকে আসা'। তা থেকে লাতিনে 'ইন্ডিকাম' ও পরে ইংরিজিতে 'ইন্ডিগো', রামধনুর রঙের তালিকায় বেগুনির পরেই ঘন নীল সেই দ্বিতীয় রঙ।

কিন্তু ইউরোপের দেশগুলিতে ভারতীয় নীল কাপড় খুব পরিচিত হলেও সেটা আমদানি করা সহজ ছিলো না। ইউরোপ থেকে ভারতে আসার স্থলপথ ছিলো বিপদে ভরা — তার উপরে ছিলো নানান দেশের সরকারি কর্মচারী ও ব্যবসায়ীদের নানা রকম কর ও ঘুষ দেওয়ার ঝক্কি। ১৪৯৮ খ্রিস্টাব্দে পোর্তুগিজ অভিযাত্রী ভাস্কো ডা গামা ইউরোপ থেকে ভারতে আসার সমুদ্রপথ আবিষ্কার করার পরে সে সব ঝামেলা কমে গেলো, আর পূর্ব-পশ্চিমের মধ্যে বাণিজ্য বাড়লো অনেক গুণ। তার সাথে ইউরোপে ভারতীয় নীলের ব্যবহারও বেড়ে উঠলো। নানান দেশে যারা ওড সরবরাহ করতো তাদের ব্যবসা কমতে শুরু করলো — তারা নানা ভাবে আইন করে ভারতীয় নীল কাপড় আসা বন্ধ করতে চেষ্টাও করলো — কিন্তু সে চেষ্টা সফল হলো না। ইউরোপের দেশগুলি নীল চাষ শুরু করলো তাদের পশ্চিমি উপনিবেশেও, যেমন মার্কিন দেশে উত্তর

ও দক্ষিণ ক্যারোলাইনাতে, আর ক্যারিবীয় দ্বীপপুঞ্জের জামাইকায়। আফ্রিকা মহাদেশ থেকে জোর করে ধরে আনা ক্রীতদাসদের লাগানো হলো সেসব জায়গায় নীলচাষের কাজে।

ভারতের সঙ্গে সমুদ্রপথে বাণিজ্য করার জন্য ইংরেজরা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির পত্তন করেছিল খ্রিষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর একেবারে শেষ দিনে, ১৬০০ খ্রিষ্টাব্দের ৩১শে ডিসেম্বর। ১৬০৫ খ্রিষ্টাব্দে সম্রাট আকবরের মৃত্যুর পর গোটা সপ্তদশ শতাব্দী জুড়ে জাহাঙ্গীর, শাজাহান ও আওরঙজেবের আমলে বণিকের মানদণ্ড হাতে ইংরেজরা ধীরে ধীরে ভারতে তাদের আধিপত্য বিস্তার করলো। তুলো, রেশম এসবের সাথে প্রথম থেকেই নীলের রপ্তানি শুরু হয়ে গেছিলো। প্রধানত গুজরাট ও সিন্ধু প্রদেশ থেকে চালান যেতো সেই নীল। পূর্ব ভারত থেকে কাঁচা মাল একেবারেই যেতো না, সেখান থেকে যেতো নীল দিয়ে রঙ করা দামি কাপড়। পৃথিবীর নানা দেশে সে কাপড়ের প্রচুর চাহিদা ছিলো বলে ঢাকা ছিলো তখনকার এক অতি সমৃদ্ধ ও শিল্পবহুল নগরী।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে দুটি ঘটনার প্রভাবে ঢাকা শহরের দুর্দিন ঘনিয়ে এলো। প্রথমটি, ১৭৩৫ খ্রিষ্টাব্দে স্কটল্যান্ডে জেমস্ ওয়াটের বাষ্পচালিত ইঞ্জিন আবিষ্কার। বিলেতের সুতিকল তার কিছুদিনের মধ্যেই যন্ত্রচালিত হয়ে কাপড়ের উৎপাদন বাড়ালো প্রচুর। দ্বিতীয় ঘটনাটি হলো ১৭৭৬ সালে মার্কিন উপনিবেশের স্বাধীনতা ঘোষণা। তার ফলে ওখান থেকে ব্রিটেনে নীলের জোগান আসাটাও গেলো বন্ধ হয়ে। বিলিতি কাপড় বিক্রি করা আর নীলের ব্যবসা অব্যাহত রাখার জন্য প্রায় মরিয়া ইংরেজরা ছলে-বলে-কৌশলে কতো কড়া শুল্ক আর আইন বসিয়ে বাংলার কাপড় উৎপাদন ও রপ্তানি প্রায় বন্ধ করে দিলো। আর সেইসঙ্গে বাংলার চাষিদের নীলের আবাদ করতে তারা বাধ্য করল।

১৭৮৮ সালের মধ্যেই পূর্ব ভারত, বিশেষ করে চম্পারন জেলা (এখন যা বিহারে) পরিণত হলো সারা পৃথিবীতে নীলের প্রধান জোগানদারে। ঢাকা নগরী প্রায় চোখের নিমেষে হারালো তার অমন রমরমা। ইংরেজদের অত্যাচারে বাংলার চাষিরা অতিষ্ঠ হয়ে উঠলো   বিশেষ করে ১৮৩৭ সালে নীল ব্যবসায়ীরা জমির মালিক হওয়ার অধিকার পাওয়ার পরে। হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় তাঁর 'হিন্দু প্যাট্রিয়ট' কাগজে চাষিদের উপরে অত্যাচার ও তাদের প্রতিবাদের কথা তীব্র ভাষায় প্রচার করলেন, দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' অভিনীত হলো ১৮৬০ সালে। নাটকটি ইংরিজিতে অনুবাদ করার জন্য জেমস লঙ নামে এক যাজককে কারাগারেও যেতে হলো   কিন্তু ইংরেজ সরকারের টনক খানিকটা নড়লোও বটে। নতুন কিছু ব্যবস্থায় চাষিদের উপর অত্যাচার একটু কমলো।

কিন্তু নীলচাষের দিন শেষ হলো অন্য কারণে। ১৮৬৫ সালে জার্মানির রসায়নবিদ য়োহান ফ্রিডরিশ বাইএর শুরু করলেন নীলের পরীক্ষা। জার্মানির বিশেষ কোনো

উপনিবেশ না থাকায় অন্য দেশ থেকে তাদের নীল কিনতে হতো চড়া দামে। ১৮৮০ সালে বাইএর রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় কৃত্রিম নীল তৈরি করে দেখালেন, আর তার বছর তিনেকের মধ্যেই নীলের আণবিক গঠনটাও বের করে ফেললেন। ১৮৯৭ সালের মধ্যে বি-এ-এস-এফ নামে জার্মানির এক সংস্থা শস্তায় নীল তৈরির প্রযুক্তিটা আয়ত্ত করে ফেললো, ও তার বছর পনেরোর মধ্যেই সেই কৃত্রিম নীল রঙ নীলচাষকে প্রায় পুরোপুরি হটিয়ে দিয়ে বাজার দখল করে নিলো। এখন বছরে প্রায় একশো কোটি জিন্‌স্‌-এর প্যান্ট ওই কৃত্রিম নীল দিয়ে রঙ করা হয়। শুধু তাই নয়, নানান বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায়, এমনকি খাবার দাবার রঙ করতেও এখন কৃত্রিম নীল রঙ ব্যবহার করা হয়। ২০০২ সালে সারা পৃথিবী জুড়ে ১৭,০০০ টন নীল কারখানায় উৎপাদন করা হয়েছিলো।

কোচিনিল পোকা বা নীলগাছের থেকে পাওয়া রঙই শুধু নয় — এখনকার দিনে প্রকৃতি থেকে সরাসরি পাওয়া প্রায় কোনো রঞ্জকই বিশেষ ব্যবহার করা হয় না — কারণ কৃত্রিম রঞ্জকগুলি অনেক শস্তায় তৈরি করা যায়। কৃত্রিম রঞ্জক প্রথম আবিষ্কার করেন ইংল্যান্ডের উইলিয়াম পারকিন। সতেরো বছর বয়সে লন্ডনে আউগুস্ট হোফমান নামে এক রসায়নবিদের সঙ্গে তিনি কয়লা থেকে পাওয়া আলকাতরা নিয়ে কাজ করছিলেন। তাঁদের উদ্দেশ্য ছিলো ম্যালেরিয়ার ওষুধ কুইনিন তৈরি করা। একদিন সেই কালো আলকাতরার সঙ্গে কিছুটা অ্যালকোহল মিশিয়ে তিনি লক্ষ করলেন যে সেটার রঙ বদলে ময়ূরপঙ্খী হয়ে গেলো। সেটা দিয়ে রেশমের কাপড়ও ছুপিয়ে রঙ করা গেলো এবং সে রঙটা বেশ টেকসই হলো। পারকিন তাঁর বাবার সঞ্চিত টাকা ব্যবহার করে ওই রঞ্জকটা ব্যবসায়িক জগতের জন্য উপযুক্ত পরিমাণে উৎপাদন করার একটা পদ্ধতিও বার করলেন। ফরাসীরা এই নতুন রঙটার নাম দিলো "মভ্‌" এবং বছর দশেকের মধ্যে সারা পৃথিবীতে সে রঙটার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়লো।

পারকিনের বানানো রঞ্জকটার আর এক নাম "ময়ূরপঙ্খী অ্যানিলিন"। পরে হোফমান নিজেই আরো অনেকগুলি উজ্জ্বল নীলচে-লাল রঞ্জক উদ্ভাবন করেন। পারকিনের ময়ূরপঙ্খী অ্যানিলিন আর হোফমানের তৈরি ওই সব রঙগুলিরই উৎস হলো অ্যানিলিন নামে একটা তেলতেলে রঙহীন পদার্থ। অ্যানিলিন থেকে শুধু লালচে-নীলচে রঙই নয়, অ্যানিলিন ব্ল্যাক নামে কালো রঙ, ম্যালাকাইট গ্রিন নামে সবুজ রঙ আর কঙ্গো রেড নামে টুকটুকে লাল রঙও পাওয়া যায়।

অ্যানিলিন থেকে পাওয়া কিছু কিছু রঙ আলোয় খানিকক্ষণ রাখলে ফিকে হয়ে আসে। তাই আরো পাকা রঙ পাওয়ার জন্য চেষ্টা চললো। ১৮৬৩ সালে জার্মানির কার্ল মার্টিয়ুস আর ইংল্যান্ডের জন লাইটফুট আবিষ্কার করলেন azo বা এজো-রঞ্জক — যাদের দলে পড়ে অজস্র রকমের মজবুত রঙ। জীব-রসায়নবিদদের সৃষ্টি করা নানা রকম কৃত্রিম রঞ্জক দিয়েই এখন প্রায় সব কাপড় রঙ করা হয় — তা রেশম, পশম, সুতি বা শণের মতো প্রাকৃতিক জিনিশে তৈরি কাপড়ই হোক, বা মানুষের

বানানো নাইলন জাতীয় জিনিশেরই হোক। নানান প্লাস্টিকের মধ্যেও তৈরির সময়ে ও রকম রঞ্জক মিশিয়ে রঙ করা হয়। কিন্তু খাবার, পানীয় ইত্যাদির রঙের জন্য প্রাকৃতিক, বিশেষ করে গাছপালা থেকে পাওয়া রঞ্জকেরই ব্যবহার বেশি। প্রাকৃতিক রঞ্জক সাজগোজের কাজেও লাগে। যেমন মেহেদি গাছের ফুল থেকে পাওয়া হেনা নামে রঞ্জকটা দিয়ে প্রসাধন উত্তর ও পশ্চিম ভারতে এবং মধ্যপ্রাচ্যের নানা দেশে প্রচলিত ছিলো। এখন পূর্ব ও দক্ষিণ ভারতেও চালু হয়ে গেছে, হিন্দির অনুকরণে বাঙালিরাও সাজটাকে "মেহেন্দি" বলে। চুলে থাকে কেরাটিন নামে একটা প্রোটিন। সেটার সঙ্গে হেনা রঞ্জকটার সরাসরি একটা রাসায়নিক বিক্রিয়া হয় তার ফলে হেনা দিয়ে চুলেও রঙ করা যায়।

ছবি আঁকার জন্য কোচিনিল থেকে পাওয়া লাল বা টাইরীয় ময়ূরপঙ্খী ইত্যাদি রঞ্জক কখনো-সখনো ব্যবহার করা হয়ে থাকলেও বেশির ভাগ ছবির রঙই আসে গুঁড়ো রঙ থেকে। লাপিস-লাজুলির মতো অতি দামি পাথর থেকে যেমন নীল রঙ পাওয়া যায়, তেমনি কোবাল্ট অ্যালুমিনেট থেকেও অনেক শস্তায় নীলের গুঁড়ো মেলে। ক্যাডমিয়াম সালফাইড থেকে হলুদ গুঁড়ো রঙ আর ক্যাডমিয়াম সেলেনাইড থেকে লাল গুঁড়ো রঙ পাওয়া যায়। আর টাইটানিয়াম ডাই-অক্সাইডের গুঁড়ো থেকে মেলে সাদা রঙ। এ সব গুঁড়োগুলো আবিরের মতো সরাসরি ছবিতে মাখানো যায় না – এগুলোকে কোনো একটা তরল মাধ্যমে গুলে তবেই সেটা তুলি দিয়ে ছবিতে লাগানো হয়। সে তরল মাধ্যমটা যদি জল হয়, তবে রঙটাকে বলে জলরঙ। জলরঙে রঙের গুঁড়োটা কোনো একটা আঠায় মেখে জলে গোলা হয়ে থাকে। ছবিতে লাগানোর পরে জলটা শুকিয়ে আঠা-মাখানো রঙটা থেকে যায়। জলরঙ নরম রাখার জন্য ওর মধ্যে একটু গ্লিসারিনও মেশানো থাকে। জলরঙ সাধারণত হাল্কা আর স্বচ্ছ দেখতে হয়। যদি গুঁড়োর পরিমাণটা খুব বেশি থাকে তাহলে রঙটা মোটা আর অস্বচ্ছ হয়ে পড়ে। ইংরিজিতে সেটাকে বলে "গুয়াশ"। কাগজ বা কাপড়ের বদলে জলরঙটা দেয়ালে চুনকাম করার সময়ে চুনটা ভিজে থাকতে থাকতে যদি লাগানো হয়, তাহলে সেটা শুকালে ছবিটার উপরে ক্যালশিয়াম কার্বনেটের একটা সূক্ষ্ম চকচকে পর্দা পড়ে যায়। এই পদ্ধতিটার নাম ফ্রেস্কো। ইতালিতে ভাটিকানে গেলে দেখা যায় রাফায়েল, মিকেলাঞ্জেলো ইত্যাদি শিল্পীদের আঁকা অতুলনীয় নানা ফ্রেস্কো ছবি।

কোন সুদূর অতীতে অজানা কোনো এক কৌতূহলী মানুষ আবিষ্কার করেছিলো যে ছবির রঙ খুব পাকা করার একটা উপায় হলো ডিমের কুসুমে রঙের গুঁড়োটা গুলে নেওয়া। এই পদ্ধতিটার নাম হলো টেমপেরা। ডিমে কুসুমটা হলো জলের মধ্যে অ্যালবুমেন নামে একটা আঠালো জিনিশ আর 'ডিমের তেল' (এগ-অয়েল) নামে একটা স্নেহপদার্থের মিশ্রণ। কুসুমের হলুদ রঙটা আসে ক্যারোটিন নামে একটা পদার্থ থেকে — বাতাসের সংস্পর্শে এলে সেটা ভেঙে রঙহীন হয়ে যায়, তাই কুসুমটাতে যে রঙের

গুঁড়ো মেশানো হয়েছিলো সে রঙটাই ছবিতে থেকে যায়। অ্যালবুমেনের আঠাটা যে খুব জোরালো দৈনন্দিন জীবনে তার প্রমাণ আমরা সহজেই পাই -- ডিমের পোচ খাওয়া হয়েছে যে থালায় সেটা যদি না ধুয়ে খানিকক্ষণ রাখা হয় তাহলে দেখা যায় যে থালায় লেগে থাকা কুসুমের ছিটেফোঁটা অতি শক্ত হয়ে এঁটে গেছে — সেটা ধুতে ভালো রকম মেহনত করতে হয়। গ্রিসদেশের ক্রিট দ্বীপে মাইসেনীয় সভ্যতায় খ্রিস্টপূর্ব ১৫০০ সালেও টেমপেরা পদ্ধতিতে ছবি আঁকা হতো, তার খোঁজ পাওয়া গেছে। মনে করা হয়, তারও কয়েকশো বছর আগে এ পদ্ধতিটার ব্যবহার শুরু হয়েছিলো। মধ্যযুগের ইউরোপে টেমপেরা দিয়ে ছবি আঁকা ছিলো বহুলপ্রচলিত -- বিশেষ করে কাঠে তৈরি দেয়ালের গায়ে। ১২০০ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ চালু হয়েছিলো টেমপেরাতে আঁকা ছবির উপরে রেড়ির তেল ইত্যাদি দিয়ে বার্নিশ করে ছবিটাকে চকচকে করে দেখানোর পদ্ধতি।

ইতালির শিল্পী রাফায়েলের সময়ে, অর্থাৎ মোটামুটি ১৫০০ খ্রিস্টাব্দ থেকে শুরু করে, ইউরোপে টেমপেরার জায়গা ধীরে ধীরে দখল করে নিলো তেলরঙ। রেড়ির বা অন্য কিছুর তেলে মেশানো সে রঙ ব্যবহার করার সুবিধাটা হলো, ছবি আঁকার সময়ে রঙটা বহুক্ষণ তরল রাখা যায় — টেমপেরার মতো তাড়াতাড়ি সেটা শুকিয়ে যায় না — তাই ছবিতে অনেক সূক্ষ্ম কাজ করার সময় পাওয়া যায়। বিংশ শতাব্দীর আগে অবধি ইউরোপীয় শিল্পে বেশির ভাগ ছবিই তেলরঙে আঁকা হতো।

১৯০১ সালে ওটো রোস্ নামে এক জার্মান রসায়নবিদ অ্যাক্রিলিক বা রজন আবিষ্কার করেন। তার বছর পঞ্চাশের মধ্যে সহজে এবং শস্তায় অ্যাক্রিলিক তৈরির নানান উপায় বের হলো। আজকের জগতে যে প্লাস্টিকের জিনিশের ছড়াছড়ি তার বেশির ভাগই অ্যাক্রিলিক দিয়ে বানানো হয়। রঙের জগতেও অ্যাক্রিলিক এক বিপ্লব ঘটালো। টলুইন, অ্যাসিটোন ইত্যাদি তরল মাধ্যমে অ্যাক্রিলিক গুলে যায় সেগুলির মধ্যে সরাসরি রঙের গুঁড়ো মিশিয়ে প্লাস্টিকের রঙ তো তৈরি হয়ই তা ছাড়াও আসবাবপত্র বা ঘরবাড়ির দেয়াল রঙ করার জন্য অ্যাক্রিলিক দিয়ে তৈরি করা হয় লেটেক্স নামে এক ধরনের রঙ। দুধ বা রক্ত যেমন জলের মধ্যে খুব ছোটো মাপের কণার মিশ্রণ, তেমনি লেটেক্সে জলের মধ্যে অ্যাক্রিলিকের ছোটো-ছোটো কণা মেশানো হয়। কণাগুলির আবার এমনই ছোটো হওয়া দরকার যাতে সেগুলি তাড়াতাড়ি থিতিয়ে না পড়ে অনেকক্ষণ জলে ভেসে থাকতে পারে। রঙের গুঁড়োটাও সেই জলটার মধ্যে আলাদা করে মেশানো হয়। দেয়ালে বা জিনিশে লেটেক্স রঙ লাগানোর পরে জলটা শুকিয়ে গেলে অ্যাক্রিলিকের কণাগুলি পরস্পর জুড়ে গিয়ে রঙটা একটা সূক্ষ্ম পর্দা তৈরি করে। রঙটা পরে ওঠাতে গেলে দেখা যায় যে পর্দাটা পুরোটাই উঠে আসছে। অ্যাক্রিলিক জলে গোলে না, এবং নানা মাধ্যমে শক্তভাবে এঁটে থাকে বলে ঘরের বাইরে যে সব ছবি, লেখা, বিজ্ঞাপন ইত্যাদি রাখতে হয় সেগুলো সাধারণত লেটেক্সের রঙ দিয়ে আঁকা বা লেখা হয়।

লেখা ও আঁকার জন্য আমরা শুধু কালি-কলম-তুলিই নয়, কালো বা রঙিন পেনসিলও ব্যবহার করে থাকি। যদিও কালো পেনসিলের দাগটা আসে গ্রাফাইট থেকে, আগে মনে করা হতো ওটা সীসা দিয়ে তৈরি, তাই পেনসিলের ভিতরের সরু লাঠিটাকে সাধারণত কালো বা রঙিন 'সীস' বলা হয়। রঙ পেনসিলের সীস তৈরি হয় রঞ্জক বা গুঁড়ো রঙের সঙ্গে এঁটেল মাটি আর গঁদ মিশিয়ে। লেখাটা মসৃণ করার জন্য সে মিশ্রণটা ভিজিয়ে নেওয়া হয় তরল মোমে। মোমটা শুকিয়ে গেলে মিশ্রণটা চেপে শক্ত করে তারপর সরু লম্বা লাঠির আকারে কেটে দু খণ্ড কাঠের ভিতরে ঢুকিয়ে কাঠ দুটিকে আঠা দিয়ে জুড়ে ও তারপরে কাঠের বাইরেটা রঙ করে তৈরি হয় আমাদের পেনসিল। সাধারণত সীসটা যে রঙের, রঙিন পেনসিলের গায়েও সেই রঙটাই লাগানো হয়।

এধারে গড়িয়া থেকে দমদমে মোতিঝিল
দলবেঁধে খুঁজি কতো মাঠ-ঘাট-নদী-বিল!
কোথাও দিলেনা দেখা
লাল রঙ ভরা পোকা
মেক্সিকো গিয়ে একা, পেলাম সে কোচিনিল!

২৮ : আলোকচিত্রের রঙ

শেখর গুহ

সেই কোন প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে মানুষ তার চোখে-দেখা দুনিয়াটাকে ধরে রাখতে চেষ্টা করেছে ছবি এঁকে। দক্ষ শিল্পীর হাতে নিপুণভাবে আঁকা ছবিতে সেটা অনেকটাই সম্ভব হতো, কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীতে ফটোগ্রাফি বা আলোকচিত্রের উদ্ভাবনের পরে বাস্তব জগতের প্রায় হুবহু প্রতিরূপ পাওয়ার কাজটা অনেক সহজ হয়ে এলো। তবু মানুষের শখের শেষ নেই। স্থির চিত্র পাওয়ার পরেই তার চাই চলচ্চিত্র, শুধু সাদা-কালো ছবিতেই সে খুশি নয় তার চাই বাস্তবের মতো রঙিন ছবি। বিজ্ঞান আর প্রযুক্তির অগ্রগতি এ সবই তাকে হাতের মুঠোয় এনে দিয়েছে। ঠিক কী করে মানুষ সাদা-কালো আর রঙিন ছবি তোলে?

আমাদের খাবারের একটা অপরিহার্য অঙ্গ হলো নুন বা লবণ। সেটা যে সোডিয়াম নামে একটা ধাতু আর ক্লোরিন নামে একটা অধাতু দিয়ে তৈরি সে কথা বোধহয় সকলেরই জানা। সোডিয়ামের মতো অন্যান্য নানা ধাতু, যেমন পটাশিয়াম, তামা, রুপো, সোনা ইত্যাদির সঙ্গে ক্লোরিনের যৌগকেও রসায়নের ভাষায় লবণ বলা হয়। আবার ক্লোরিনের জায়গায় যদি ফ্লোরিন, ব্রোমিন আয়োডিন ইত্যাদি অধাতু এসে বসে তাহলে ওই ধাতুগুলোর সঙ্গে সেই অধাতুর যৌগকেও লবণই বলা হয়ে থাকে। ৮ নম্বর ছকে এরকম কয়েকটা লবণের উদাহরণ দেখানো হয়েছে। একাধিক অধাতুও থাকতে পারে লবণে - যেমন রৌপ্য-নাইট্রেটে ধাতব রুপোর সঙ্গে থাকে অধাতু নাইট্রোজেন আর অক্সিজেন।

ত্রয়োদশ শতাব্দীতে, আধুনিক বিজ্ঞান চালু হওয়ারও আগে, জার্মানির বাভারিয়া অঞ্চলে আলবের্টুস মাগনুস লক্ষ করেছিলেন যে রুপোর কিছু লবণে আলো পড়লে সেগুলো কালো হয়ে যায়। ১৭২৭ সালে জার্মানদেশের আর এক বিজ্ঞানী, য়োহান হাইনরিখ শুলৎসা, আবিষ্কার করলেন যে রৌপ্য-নাইট্রেটের একটা তলানির উপরে যদি আলো-ছায়ার একটা নকশা পড়ে, তবে সেই তলানিটাতে নকশাটার একটা ছাপ থেকে যায়। যে জায়গাগুলিতে আলো পড়েছিলো সেগুলো হয় কালো, আর অন্য জায়গাগুলি

৮ নং ছক॥ *ধাতু ও অধাতু মিলে তৈরি লবণ। একেবারে উপরের সারিতে দুটি ধাতুর নাম। বাঁদিকের খোপগুলোয় কয়েকটি অধাতুর নাম। এদের পরমাণু জুড়ে জুড়ে কী লবণ হতে পারে, তা দেখানো হয়েছে ছকের মূল অংশে।*

	সোডিয়াম	রুপো
ক্লোরিন	সোডিয়াম ক্লোরাইড	রৌপ্য ক্লোরাইড
ফ্লোরিন	সোডিয়াম ফ্লোরাইড	রৌপ্য ফ্লোরাইড
ব্রোমিন	সোডিয়াম ব্রোমাইড	রৌপ্য ব্রোমাইড
আয়োডিন	সোডিয়াম আয়োডাইড	রৌপ্য আয়োডাইড

থাকে সাদা। ১৮০২ সালে ইংল্যান্ডে টমাস ওয়েজউড আর হামফ্রি ডেভি দেখালেন যে রৌপ্য-নাইট্রেট বা রৌপ্য-ক্লোরাইড বোলানো কাগজ বা চামড়ার উপরে ছবি বা ছায়া খানিকক্ষণ ধরে রাখা যায়। সে ছবিটা পাকা করার উপায়টা বার করলেন জ্যোতির্বিজ্ঞানী জন উইলিয়াম হার্শেল। ১৮৩৯ সালে তিনি দেখালেন যে হাইপোসালফাইট নামে গন্ধকের একটা যৌগ দিয়ে রৌপ্য লবণে তোলা ছবিটা ধুলে সেটা পাকা হয়ে যায়। ১৮৩৯ সালে হার্শেলই 'ফটোগ্রাফি' নামটা প্রণয়ন করেন। এখানে উল্লেখ করা হয়তো সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে জন হার্শেলের বাবা ফ্রেডারিক উইলিয়াম হার্শেলও ছিলেন এক অসামান্য প্রতিভাধর জ্যোতির্বিজ্ঞানী ও সঙ্গীতশিল্পী। তাঁর বহু আবিষ্কারের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত দুটি হলো নিজের বানানো দূরবীন দিয়ে ইউরেনাস গ্রহটির খোঁজ দেওয়া এবং সূর্যের আলোতে মানুষের চোখে দেখতে পাওয়া নানা রঙের আলো ছাড়াও যে অদৃশ্য 'অবলোহিত' রশ্মি রয়েছে, তা মেপে দেখানো। তাঁর জন্ম জার্মানিতে, কিন্তু তিনি ইংল্যান্ডে এসে বসবাস করেন। সেখানে বাথ শহরে তাঁর বাড়িটি এখন একটি বৈজ্ঞানিক সংগ্রহশালারূপে রক্ষিত।

'ক্যামেরা' নামে একটা বাক্সের ভিতরে প্রথম ছবি তোলার কৃতিত্বটা দেওয়া হয় জোসেফ নিসেফোর নিপসে নামে এক ফরাসী মুদ্রককে। ১৮২৬ সালে তিনি আট ঘন্টা ধরে আলো ফেলে প্রথম ছবি তোলেন। সে ক্যামেরার পর্দাটায় তিনি লাগিয়েছিলেন পিচ — যা দিয়ে এখন রাস্তা তৈরি হয়। পরে লুই দাগের নামে প্যারিস শহরের এক নামকরা চিত্রশিল্পীর সঙ্গে তিনি ছবি তোলা নিয়ে কাজ করেন ও দুজনে মিলে নানান নতুন পরিকল্পনা করেন। নিপসের মৃত্যুর পরে দাগের সে কাজ চালিয়ে যান, এবং নানান রৌপ্য লবণ নিয়ে পরীক্ষা করতে থাকেন। ১৮৩৭ সালে তিনি সরাসরি ছবি তোলার একটা সহজ উপায় আবিষ্কার করেন। একটা রুপোর প্লেটে আয়োডিনের

বাষ্প বুলিয়ে তিনি প্রথমে রৌপ্য আয়োডাইডের একটা পর্দা তৈরি করেন। সে পর্দাটার উপরে আধ ঘন্টা ধরে একটা দৃশ্যের ছবি পড়লে, এবং তার পরে সেটা পারা দিয়ে ধুলে, দৃশ্যটার কালো অংশগুলি, অর্থাৎ যেখানে কোনো আলো ছিলো না, সেগুলো পর্দাটাতেও পাকাপাকি কালো রঙ নেয়। পর্দাতে দৃশ্যটার সাদা অংশগুলি, অর্থাৎ যেখানে যেখানে আলো পড়েছিলো, সেগুলোও একটা লবণের দ্রবণে ধুলে পাকাপাকিভাবে সাদা হয়ে যায়। এইভাবে একটা দৃশ্যের সাদা-কালো প্রতিরূপ হুবহুভাবে সরাসরি পর্দাতে ধরে রাখা গেলো। ১৯৩৯ সালে ফরাসী সরকার 'দাগেরোতিপ' নামে এই পদ্ধতিটা ঘোষণা করেন ও অচিরে সেটা সারা পৃথিবীতে খুবই জনপ্রিয় হয়ে পড়ে।

ব্রোমিন নামে মৌল পদার্থটির আবিষ্কর্তা আঁতোয়ান জেরোম বালার ১৮২৬ সালে দেখালেন যে রৌপ্য-ব্রোমাইড লবণটাতে আলো পড়লে সেটাও কালো হয়ে যায়। পরে দেখা গেলো যে ছবির পর্দায় কেবল রৌপ্য আয়োডাইড বা রৌপ্য-ক্লোরাইডের বদলে যদি রৌপ্য আয়োডাইডের সঙ্গে রৌপ্য ব্রোমাইড বা রৌপ্য ক্লোরাইডের মিশ্রণ ব্যবহার করা হয় তাহলে সেটাতে ছবি খুব তাড়াতাড়ি উঠতে পারে। ১৮৪১ সালের মধ্যেই দাগেরোতিপ ক্যামেরার পর্দায় ও রকম মিশ্রণ ব্যবহার করে আধ ঘণ্টা বা এক ঘণ্টার বদলে আধ সেকেন্ড সময়েই ছবি তোলা সম্ভব হলো।

আমাদের চোখের মণিতে রয়েছে সীমের বিচির আকারের একটা লেন্স, যার কাজ হলো বাইরের জগতের বিশাল ছবিটাকে সঙ্কুচিত করে চোখের পর্দায় বা রেটিনাতে ফেলা, যাতে রেটিনার স্নায়ুগুলি সে ছবিটাকে আমাদের মস্তিষ্কে পৌঁছে দিয়ে সেটা আমাদের দেখাতে পারে। দাগেরের ক্যামেরাতেও সেই রকমের একটা সরল লেন্স ব্যবহার করা হতো, যাতে একটা বড়ো দৃশ্যের ছবি ছোটো পর্দায় ধরে রাখা যায়। ১৮৪১ সালেই য়োসেফ পেৎসভাল নামে ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক গণিতের অধ্যাপক একটি জটিল লেন্স সমষ্টি উদ্ভাবন করলেন। সেটা দিয়ে দাগেরের সরল লেন্সের চেয়ে পনেরো গুণ বেশি আলো সংগ্রহ করা গেলো, এবং তার ফলে দাগেরোতিপ ক্যামেরাতে বেশ অল্প সময়ে বেশ ভালো ছবি তোলা গেলো। ক্যামেরার সঙ্গে একটা হাপর লাগিয়ে দৃশ্যের দূরত্ব অনুযায়ী পেৎসভালের সে লেন্সগুলি আগুপিছু করা যেতো -- যাতে সে দৃশ্যের ছবিটা স্পষ্টভাবে পর্দায় পড়ে। এই রকম লেন্স লাগানো দাগেরোতিপ ক্যামেরা প্রচুর জনপ্রিয়তা আর ব্যবসায়িক সাফল্য অর্জন করেছিলো।

দাগেরোতিপ ক্যামেরা দিয়ে কোনো একটা দৃশ্যের ছবি সরাসরি তোলা যেতো ঠিকই, কিন্তু তখনকার দিনে তো এখনকার মতো সহজে নকল করার 'কপি মেশিন' ছিলো না, তাই একবার তোলা ছবির একটা মাত্র আসল সংস্করণ নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হতো। দাগেরের সমসাময়িক, উইলিয়াম হেনরি ফক্স ট্যালবট নামে এক ইংরেজ প্রত্নতত্ত্ববিদ ১৮৪১ সালে আবিষ্কার করলেন 'ফিল্ম'। ট্যালবটের সে ফিল্মে একটা কাগজে রৌপ্য-ক্লোরাইড মাখানো থাকতো। তার উপরে কোনো দৃশ্যের ছবি পড়লে

ছবিটার আলোকিত অংশগুলো কালো হয়ে যেতো। হার্শেলের আবিষ্কার করা সোডিয়াম থায়োসালফেট দিয়ে ছবিটা পাকা করলে কাগজটাতে দেখা যেতো যে দৃশ্যের ছবি তোলা হয়েছে তার ঠিক উল্টো প্রতিরূপ --- অর্থাৎ দৃশ্যের সাদা বা আলোকিত অংশগুলি দেখাতো কালো, আর কালো অংশগুলি রয়ে যেতো সাদা। এই উল্টো ছবিটাকে বলা হয় 'নেগেটিভ' বা 'বিপরীত'। সেই বিপরীতটা আবার রৌপ্য-ক্লোরাইড মাখানো কাগজের উপর রেখে তার উপরে সাদা আলো ফেললে বিপরীতের উল্টো, অর্থাৎ আসল ছবিটা কাগজটাতে ফুটে উঠতো। দাগেরোতিপের মতো কেবল একটা মাত্র সংস্করণের বদলে, একটা বিপরীত ফিল্ম থেকে যতো খুশি ছবি তৈরি করা যেতো – ফিল্ম-ক্যামেরার এটা একটা বিরাট সুবিধা ছিলো।

প্রথম দিকের ফিল্ম ক্যামেরা দিয়ে একটা দৃশ্যের ছবি তুলতে কয়েক সেকেন্ড সময় লাগতো। এক-আধ সেকেন্ডে কেউই খুব বেশি নড়ে চড়ে না, তাই মোটামুটি স্থির হয়ে থাকা মানুষের ছবি ওই ক্যামেরায় ভালোই তোলা যেতো। কিন্তু জোর কদমে চলা ঘোড়ার গাড়ি, বা তাড়াতাড়ি পাল্টাচ্ছে যে সব দৃশ্য — সেগুলির ছবি তুলতে গেলেই হতো মুশকিল। সেটা সম্ভব হলো ফক্স ট্যালবটের আর একটা দুর্দান্ত আবিষ্কারের ফলে। ১৮৪০ সালে তিনি দেখলেন যে ফিল্মের উপর যদি অতি অল্প সময়ের জন্যও কোনো দৃশ্যের প্রতিচ্ছায়া পড়ে, তাহলে সেটা সেই ফিল্মের 'স্মৃতি'-তে থেকে যায়। সে ফিল্মটার গায়ে কোনো ছবি চোখে দেখা না গেলেও পরে একটা রাসায়নিক পদ্ধতিতে ছবিটা ফুটিয়ে তোলা যায়। সেই রাসায়নিক পদ্ধতিটাকে বলে 'ডেভেলপ' করা।

কী করে ছবি ডেভেলপ করা হয় তা বুঝতে গেলে অণু-পরমাণুর গঠন নিয়ে একটু আলোচনা করা দরকার। হাইড্রোজেন, হিলিয়াম, ফ্লোরিন, ক্লোরিন, সোনা, রুপো ইত্যাদি সব মৌল পদার্থের পরমাণুতে থাকে নির্দিষ্ট সংখ্যার ইলেকট্রন। হাইড্রোজেনের পরমাণুতে রয়েছে একটা মাত্র ইলেকট্রন, আর রুপোর পরমাণুতে থাকে ৪৭টা। কোনো পরমাণু যদি তার একটা বা কয়েকটা ইলেকট্রন কোনো কারণে হারিয়ে ফেলে, অথবা যদি বাড়তি এক বা একাধিক ইলেকট্রন পরমাণুটার গায়ে জুড়ে বসে, তখন আর সেটা 'পরমাণু' থাকেনা, সেটার নাম হয় আয়ন। যেমন, হাইড্রোজেনের পরমাণু যদি কোনো কিছুর সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে তার সবেধন নীলমণি ইলেকট্রনটি হারায়, তখন সেই ইলেকট্রনহীন হাইড্রোজেন পরমাণুকে বলা হয় হাইড্রোজেন আয়ন। তেমনি রুপোর পরমাণু যদি কোনো কারণে তার একটা ইলেকট্রন হারায়, তখন সেটা হয়ে যায় রুপোর আয়ন।

রুপো ও ক্লোরিনের পরমাণুগুলি পরস্পর জুড়ে তৈরি করে রৌপ্য-ক্লোরাইডের অণু। ফিল্মের গায়ে মাখানো রৌপ্য-ক্লোরাইডে সেই অণুগুলির সাথে থাকে কিছু রুপোর পরমাণু থেকে একটি ইলেকট্রন খসা আয়ন। সেই রুপোর আয়নগুলি ছাড়া গরুর মতো রৌপ্য-ক্লোরাইডের অণুর ফাঁকে ফাঁকে ঘুরে বেড়ায়। ফিল্মের গায়ে আলো পড়লে সে আলোর

শক্তিটা শুষে নেয় রৌপ্য-ক্লোরাইডের অণু। শুষে নেওয়া সে শক্তিটা যায় কোথায়? সেটা খরচ হয় রৌপ্য-ক্লোরাইডের অণু থেকে একটা ইলেকট্রনকে মুক্তি দিতে। অর্থাৎ ফিল্মের যেখানে আলো পড়েছে ঠিক সেখানে কিছু ইলেকট্রন জমে। ঘুরে বেড়ানো রুপোর আয়নের কোনো একটা যদি সে জায়গায় এসে পড়ে তাহলে ইলেকট্রনের সঙ্গে জুড়ে আয়নটা আবার রুপোর পরমাণু হয়ে যায়। সে পরমাণুটা ছাড়া পাওয়া আয়নের মতো ভ্রাম্যমাণ হয় না, যেখানে তৈরি হলো সেখানেই সেটা থেকে যায়। সাধারণ দৃশ্যের আলো অল্প সময়ের জন্য ফিল্মে পড়লে আলোকিত জায়গাগুলিতে গোটা কয়েক মাত্র রুপোর পরমাণু তৈরি হয়। ডেভেলপ করার কাজ হলো একটা রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় ওই রুপোর পরমাণুগুলোর সংখ্যা বাড়ানো।

যে জায়গাগুলিতে মাত্র কয়েকটা রুপোর পরমাণু জড়ো হয়েছিল, ডেভেলপ করার পরে সেখানে কোটি কোটি পরমাণু দানা বাঁধে। ফিল্মে যেখানে যতোটা আলো পড়েছিলো সেই অনুপাতে দানাগুলি বড়ো বা ছোটো হয়। দানাগুলি অণুবীক্ষণ দিয়ে পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে ওগুলোর গঠন হলো জটপাকানো চুলের মতো। রুপোর পরমাণুগুলো জুড়ে জুড়ে সুতোর মতোন আকার নেয়— তারপর সেগুলো জড়িয়ে পাকিয়ে যায়। সেই জটপাকানো দানার ভিতরে আলো বারবার প্রতিফলিত হয়ে আটকে যায়, তাই দানাগুলি সাদা আলোতে দেখায় কালো।

যথেষ্ট পরিমাণে ডেভেলপ করা হয়ে গেলে প্রথমে ফিল্মটা ডোবানো হয় অ্যাসেটিক অ্যাসিডে, যাতে আর বেশি ডেভেলপ হওয়াটা বন্ধ হয়ে যায়। তার পরের ধাপ হলো সেই কবে হার্শেলের আবিষ্কার করা পদ্ধতিতে সোডিয়াম থায়োসালফেট দিয়ে ফিল্মটাকে ধোয়া। এখনো চলতি ভাষায় সোডিয়াম থায়োসালফেটকে 'হাইপো' বলা হয়। সেভাবে ধুয়ে ফিল্মের রৌপ্য-ক্লোরাইডটা সরিয়ে দেওয়া যায় --- শোকানোর পরে ফিল্মে লেগে থাকে কেবল রুপোর দানাগুলি। সে দানাগুলির রঙ কালো বলে ফিল্মটা হয় আসল দৃশ্যটার বিপরীত প্রতিরূপ বা নেগেটিভ। সেই নেগেটিভটার ভিতর দিয়ে সাদা আলো চলে গিয়ে একটা রৌপ্য-ক্লোরাইড মাখানো কাগজে পড়লে সে কাগজে ফুটে ওঠে আসল দৃশ্যটার সাদা-কালো ছবি।

●—○—●—○—●

সাদা-কালো ছবি তোলার পদ্ধতিগুলি ভালোমতো আয়ত্ত করার চেষ্টা যখন চলছিলো, তখন একই সাথে চেষ্টা চলছিলো রঙিন ছবি তোলবার। স্কটল্যান্ডের বিজ্ঞানী জেম্‌স্‌ ক্লার্ক ম্যাক্সওয়েল ১৮৭০ সালে অঙ্ক কষে দেখান যে আলো হলো মূলত বিদ্যুৎ-চুম্বকীয় ঢেউ। তিনি যে শুধু অঙ্ক কষে তাত্ত্বিক কাজই করতেন তা নয়। ১৮৬১ সালে লন্ডন শহরের রয়াল সোসাইটিতে তিনি স্কটল্যান্ডের প্রতীক একটা রঙিন টার্টান ফিতের ছবি দেখান — সেটাই পৃথিবীর সর্বপ্রথম রঙিন আলোকচিত্র। সে ছবিটা তুলতে তিনি
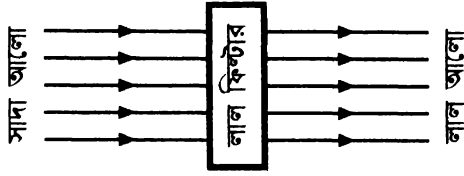
৩৮ নং ছবি॥ *রঙিন ফিল্টারের মধ্যে দিয়ে আলো গেলে কী হয়।*

নীল সবুজ ও লাল রঙের তিনটি ফিল্টার ব্যবহার করেন। চালনি বা ছাঁকনির কাজ হলো একটা মিশ্রণের বিভিন্ন উপাদানগুলিকে আলাদা করা। আলোর ফিল্টারও সেই রকম ছাঁকনির কাজ করে। নানা রঙ মেশানো আলো যদি কোনো এক রঙের ফিল্টারের উপর পড়ে, তাহলে কেবল সেই একটা রঙই ফিল্টারটার মধ্যে দিয়ে চলে যায়, মিশ্রণের অন্য সব রঙগুলি যায় আটকে। অর্থাৎ লাল ফিল্টারের উপর একদিক থেকে সাদা আলো পড়লে ফিল্টারটা লাল ছাড়া অন্য সব রঙ আটকে দেয় — কেবল লাল রঙটাই অন্যদিকে পৌঁছোতে পারে, ৩৮ নম্বর ছবিতে যেমন দেখানো হয়েছে।

নীল, সবুজ ও লাল রঙের আলো দিয়ে ম্যাক্সওয়েল প্রথমে ফিতেটার তিনটি একরঙা, অর্থাৎ সাদা-কালো, ছবি তোলান তিনটি স্বচ্ছ পর্দায়। তারপর, নীল আলোতে তোলা ছবিটা একটা নীল বাতির সামনে, সবুজ আলোতে তোলা ছবিটা একটা সবুজ বাতির সামনে আর লাল আলোতে তোলা ছবিটা একটা লাল বাতির সামনে রেখে তিনি বাতিগুলির আলো একসঙ্গে ফেললেন একটা সাদা দেয়ালের উপরে। দেয়ালে তখন দেখা দিলো ফিতেটার রঙিন ছবি।

ম্যাক্সওয়েলের তোলা সে প্রথম রঙিন ছবি দেখানোর পর প্রায় দেড়শো বছর কেটে গেছে। আজকাল রঙিন ছবি তোলা ও দেখানো অতো ঝামেলার নয়। ক্যামেরাতে রঙিন ছবির ফিল্ম পুরে বোতাম টিপলেই ছবি ওঠে। ফিল্মটা অনেক ছবিতে পুরো ভর্তি হয়ে গেলে সেটাকে নিয়ে যেতে হয় ফটো ছাপানোর দোকানে -- সেখান থেকে কিছু সময় পরেই পাওয়া যায় রঙিন ছবিগুলি। কাজটা এখন এতো সহজ হয়েছে এই প্রযুক্তির ক্রমাগত উন্নতির ফলে ··· কিন্তু রঙিন ছবির এতো সাফল্যের মূলে কিন্তু রয়েছে ম্যাক্সওয়েলের দেখানো পুরোনো ধারণাটা, যে সাদা আলোর সঙ্গে লাল সবুজ ও নীল, আর তাদের পূরক তুঁতে, ময়ূরপঙ্খী ও হলুদ, এই কটা রঙের বিভিন্ন রকম যোগ-বিয়োগে আর সব রকম রঙ তৈরি করা যায়। "রঙের যোগ-বিয়োগ" অধ্যায়টাতে এ বিষয়ে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে।

ফরাসী দেশে অগুস্ত ও লুই লুমিয়ের নামে দুই ভাই বিংশ শতকের গোড়ার দিকে রঙিন ছবি তোলার একটি নির্ভরযোগ্য পদ্ধতি বের করেন। এখানে অপ্রাসঙ্গিক হলেও উল্লেখ করার লোভ সামলানো কঠিন যে ফরাসী ভাষায় তাঁদের পদবীটার মানে হলো

আলো, এবং আলো নিয়ে কারবার যেন তাঁদের পারিবারিক ব্যাপার ছিলো, কেননা, তাঁদের বাবাও ছিলেন আলোকচিত্র-ব্যবসায়ী। পরবর্তীকালে এই দুই ভাই চলচ্চিত্র ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত হয়েও খুব নাম করেছিলেন, কিন্তু সে কথা থাক।

তাঁদের উপায়টা ছিলো অনেকটা ম্যাক্সওয়েলের উদ্ভাবিত তিন রঙের ফিল্টার ব্যবহার করার মতোই -- কিন্তু তিনটে আলাদা ফিল্টারের বদলে তাঁরা খুব মিহি করে গুঁড়ো করা আটার সঙ্গে লাল সবুজ ও নীল এই তিনটে রঙের রঞ্জক সমান পরিমাণে মিশিয়ে তা দিয়ে একটা সূক্ষ্ম স্তর ফিল্মের উপরে লেপে দিয়েছিলেন। সেই স্তরটার মধ্যে দিয়ে ছবি তোলার পরে সে ফিল্মটা ডেভেলপ করা ও ছাপানো হতো। ছাপা ছবিটার উপরে আবার সেই লাল সবুজ নীল মেশানো স্তর লেপে দিলে সাধারণ সাদা আলোতে ঠিক রঙিন ছবিটা দেখা যেতো। এই পদ্ধতিটার নাম দেওয়া হয়েছিলো 'অটোক্রোম'। ১৯১০ সাল নাগাদ রঙিন ছবি তোলার এটাই সবচেয়ে জনপ্রিয় উপায় হয়ে দাঁড়ালো।

আরো সহজে রঙিন ছবি তোলার উপায় ১৯৩৫ সালে আবিষ্কার করলেন লিওপোল্ড গোডোস্কি আর লিওপোল্ড ম্যানেস নামে দুই মার্কিনী। নিউইয়র্ক শহরে তাঁরা পেশায় ছিলেন সঙ্গীতশিল্পী - আর অবসর সময়ে তাঁদের শখ ছিলো রঙিন ছবি নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানো। পরে ইস্টম্যান কোডাক ল্যাবোরেটরি নামে একটা গবেষণাগারে তাঁরা কাজ করার সুযোগ পান, এবং 'কোডাক্রোম' নামে রঙিন ছবি তোলার পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন।

মার্কিনদেশের কোডাক, জার্মানির আগফা, জাপানি ফুজি -- নানা দেশের সংস্থা নানাভাবে রঙিন ছবি তোলার ফিল্ম তৈরি করে। সেগুলি বানানোর পদ্ধতিতে নানান খুঁটিনাটি পার্থক্য রয়েছে, কিন্তু তার বিশদ বর্ণনায় না গিয়ে সব রঙিন ফিল্মই কীভাবে কাজ করে, আর কী করে তাই দিয়ে রঙিন ছবি পাওয়া যায়, এখানে আমরা সেটাই মোটামুটি বোঝার চেষ্টা করবো।

গত শতাব্দীর পঞ্চাশের দশক অবধি ছায়াছবির জগৎ ছিলো সাদা-কালো। রঙিন ছবির যুগ শুরু হলো মোটামুটি ষাটের দশক থেকে। পুরোনো সাদা-কালো ছবিতে দেখা যায় যে দিনের বেলায় আকাশের রঙটা সাদা, গাছের পাতার রঙ কালো, গোলাপ ফুলের রঙ কালো, আবার তেমনি খুনোখুনির দৃশ্যে রক্তের রঙও কালো। কেন সাদা-কালো ছবিতে নীলরঙের জিনিশ (যেমন আকাশ) সাদা দেখায় আর সবুজ-লাল জিনিশ দেখায় কালো?

তার কারণ, রৌপ্য-ক্লোরাইড বা রৌপ্য-ব্রোমাইড মেশানো জেলাটিন নীল রঙ শুষে নিতে পারে সহজে --- কিন্তু সবুজ বা লাল রঙ এতে কোনো সাড়া জাগায় না। তাই আকাশের নীল বা সমুদ্রের জলের নীল রঙটাই সে ফিল্মে 'আলো'-র কাজ করে। যেহেতু লাল বা সবুজ কোনো সাড়া জাগায় না তাই ফিল্মের কাছে সে রঙগুলো কালো রঙের মতোই, অর্থাৎ আলোর অভাবই বোঝায়।

৩৯ নং ছবি॥ *রঙিন ফিল্মের গঠন। তিন রকমের রঞ্জক ভরা তিনটি স্তর ও দুটি ফিল্টার।*

তাহলে লাল-সবুজ রঙ কোনো ফিল্ম আলাদা করে বুঝবে কী করে? সেটার উপায় বের করেছিলেন হেরমান ভিলহেল্ম ফোগেল নামে জার্মানীর এক অধ্যাপক। ১৮৭৩ আর ১৮৮৪ সালে তিনি দেখিয়েছিলেন যে জেলাটিনের মধ্যে রৌপ্য-ব্রোমাইডের সঙ্গে হাল্কাভাবে নানান রঞ্জক মেশালে সে ফিল্মটা সবুজ আর কমলা আলোতেও প্রভাবিত হয়। লাল আলোতে সাড়া দেয় এমন ফিল্ম তৈরি করতে আরো কয়েক দশক সময় লেগেছিলো। নীল সবুজ লাল, এবং তাদের মিশ্রণে পাওয়া অন্য সব রঙে যে ফিল্ম সাড়া দেয় তাকে বলে 'প্যান-ক্রোমাটিক', অর্থাৎ 'সর্ববর্ণীয়'।

এখনকার সর্ববর্ণীয় বা রঙিন ফিল্মের ভিত্তিতে থাকে সেলুলয়েড বা স্বচ্ছ প্লাস্টিকের একটা ফিতে। ফিতেটার উপর পরপর পাতা হয় গোটা-পাঁচেক স্তর, যেমন দেখানো হয়েছে ৩৯ নম্বর ছবিতে। এই স্তরগুলি খুবই পাতলা সব কটা স্তর মিলিয়েও পুরো ফিল্মটা বইয়ের পাতার চেয়ে মোটা হয় না। সবচেয়ে উপরের স্তরটা হলো একটা ফিল্টার, তার কাজ অতিবেগুনি রশ্মি আটকানো। সূর্যের বা অন্য বাতির আলোতে যে অতিবেগুনি রশ্মি থাকে তা আমাদের চোখে দেখার কাজে কোনোই সাহায্য করে না, কিন্তু আলোকচিত্রের ফিল্মে পড়লে গোটা ফিল্মটাকে একেবারে কালো করে দিতে পারে। তাই সেটাকে আটকানো দরকার। সেটার পরে থাকে স্রেফ রৌপ্য-ব্রোমাইড বা রৌপ্য-ক্লোরাইড মেশানো জেলাটিনের স্তর। সেটা খালি নীল আলোতে সাড়া দেয়। সেই স্তরটার নিচে থাকে একটা হলুদ রঙের ফিল্টার, যার কাজ হলো বাকি নীল আলোকে আটকে দেওয়া - যাতে সে নীল আলো পরের স্তরগুলিতে পৌঁছোতে না পারে। এই দ্বিতীয় ফিল্টারটার নিচে থাকে ফোগেলের আবিষ্কার করা রঞ্জক মেশানো রৌপ্য-ব্রোমাইড বা ক্লোরাইড ও জেলাটিন, যা শুধু সবুজ আলোতে সাড়া দেয়। সেটার নিচে থাকে অন্য রঞ্জক মেশানো রৌপ্য-ব্রোমাইড বা ক্লোরাইড ও জেলাটিনের আর একটি স্তর - যা কেবল লাল আলোতে সাড়া দেয়। দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্তরের মধ্যে সবুজ রঙ আটকানোর কোনো ফিল্টার বসানোর প্রয়োজন হয় না কেননা তৃতীয় স্তরটাতে সবুজ আলো কোনোই সাড়া জাগায় না। নীল আলো কিন্তু সব কটা স্তরেই সাড়া জাগাতে পারে, তাই প্রথম স্তরটার পরেই সে রঙের আলোকে আটকে দিতে হয়।

৪০ নং ছবি॥ *স্তরে স্তরে সাজানো ফিল্মের উপর নানা রঙের আলো পড়লে কী হয়। এখানে ⊕, ⊗ এবং ⊙ হলো যথাক্রমে নীল, সবুজ এবং লাল রঙ-শোষা রঞ্জক। (ক) ছবি তোলা : বস্তু থেকে নানা রঙের আলো এসে পড়ছে ফিল্মের ওপর, তাতে রঞ্জকগুলো কোথায় জড়ো হচ্ছে। (খ) ডেভেলপ করা : রঞ্জক জড়ো হওয়ার পরে ফিল্মের উপর সাদা আলো ফেললে তলায় পাওয়া যায় পূরক রঙের আলোর বিপরীত নকশা, তৈরি হয় ছবির নেগেটিভ। (গ) ছবি ছাপানো : বিপরীত নকশার আলো রঙিন ছবি ছাপানোর কাগজের উপর ফেলে ডেভেলপ করার পরে পাওয়া যায় আসল নকশাটার রঙিন ছবি। (এ ছবিটি রঙে দেখা যাবে ৪৮ ও ৪৯ পৃষ্ঠার মাঝখানে রঙিন ছবির জন্য নির্ধারিত আলাদা পাতায়।)*
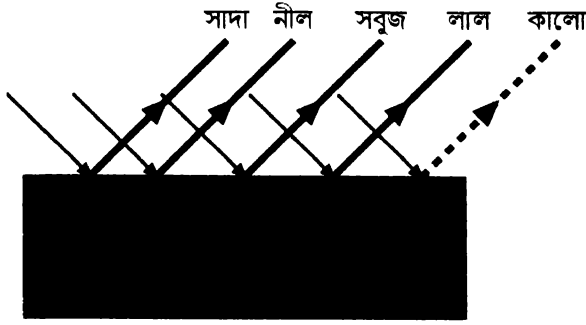
৪১ নং ছবি॥ *বাঁদিক থেকে তেরচাভাবে সাদা আলো যদি ৪০ নম্বর (গ)-তে দেখানো ছবিতে পড়ে, তবে প্রতিফলিত আলোতে কী কী রঙ দেখা যায়। প্রতিফলিত আলোর রশ্মিগুলি মোটা তীরচিহ্ন দিয়ে দেখানো হয়েছে। (কালোতে আসলে কোনো রশ্মি নেই, শুধু দিকটা বোঝানোর জন্য ড্যাশ-দেওয়া লাইন ব্যবহার করা হয়েছে।) আঁকার সুবিধার জন্য প্রতিফলন দেখানো হয়েছে উপরের স্তর থেকে, কিন্তু আসলে তা হয় গোটা ফিল্মটি ভেদ করে নিচের স্তর থেকে, (১৬০পৃষ্ঠায়) ৩২ নম্বর ছবিতে যা বিশদভাবে দেখানো হয়েছিলো। যে নকশাটা ৪০ নম্বর (ক) ছবিতে দেখানো হয়েছিলো প্রতিফলিত আলোয় সেটাই আবার দেখা যাচ্ছে।*

এই স্তরে স্তরে সাজানো ফিল্মটার উপর নানা রঙের আলো পড়লে কী হয় তা ৪০ নম্বর ছবিটা দেখে বোঝার চেষ্টা করা যাক এবার। মনে করা যাক সাদা, নীল, সবুজ, লাল আর কালো একটা নকশায় আলো এসে পড়েছে ওই ফিল্মটার উপর। প্রথম স্তরটা খালি নীল আলোয় সাড়া দিতে পারে, তাই নকশাটার নীল জায়গাটা প্রথম স্তরটাতে ছাপ ফেলবে। সাদা জায়গাগুলোও ফেলবে, কেননা সাদার মধ্যে তো মিশে আছে নীল রঙ। ছাপটা ফেলার পরে যে নীলটুকু অবশিষ্ট থাকবে তা আটকে যাবে নীল শুষে-নেওয়া স্তরটাতে। নকশাটার সাদা এবং সবুজ জায়গাগুলি ছাপ ফেলবে কেবল দ্বিতীয় স্তরটাতে, এবং সাদা ও লাল জায়গাগুলি ছাপ ফেলবে কেবল তৃতীয় স্তরে। যেখানে কালো, অর্থাৎ আলো নেই, সেখানে ফিল্মের কোনো স্তরেই ছাপ পড়বে না।

রঙিন নকশার আলো-পড়া ফিল্মটাকে সাদা-কালো ফিল্মের মতোই ডেভেলপ করতে হয় প্রথমে, যাতে ছাপ-পড়া জায়গাগুলিতে রুপোর দানা গজিয়ে ওঠে। তারপরে করা হয় নতুন একটা কাজ, যেটা সাদা-কালো ফিল্মে কখনোই করতে হতো না। তা হলো রঞ্জক-সংযোজক বলে এক ধরণের রাসায়নিক পদার্থ দিয়ে একটা প্রক্রিয়া ঘটানো। রঞ্জক-সংযোজকের কাজ হলো -- যেখানে রুপোর দানা রয়েছে, ঠিক সেই সব জায়গায় রঞ্জকের সৃষ্টি করা। প্রথম স্তরটাতে তৈরি হয় নীল শুষে-নেওয়া, অর্থাৎ সবুজ আর লালের মিশ্রণে পাওয়া হলুদ রঙের রঞ্জক। ৪০ নম্বর ছবিতে সেটা দেখানো হয়েছে ⊕

চিহ্ন দিয়ে। দ্বিতীয় স্তরে তৈরি হয় সবুজ রঙ শুষে-নেওয়া, অর্থাৎ ময়ূরপঙ্খী রঙের রঞ্জক (২)। আর তৃতীয় স্তরে তৈরি হয় লাল রঙ শুষে-নেওয়া, অর্থাৎ তুঁতে রঙের রঞ্জক (৩)।

ডেভেলপ করা ও রঞ্জক সংযোজনের পরে ফিল্মটার এক পাশ থেকে সাদা আলো এসে পড়লে অন্য পাশে কেমন দেখাবে, তা ৪০ নম্বর ছবিটা থেকে সহজেই বোঝা যায়। যেখানে তিনরঙা রঞ্জক রয়েছে, সেখানে সাদা আলো সবটাই শুষে যাবে, তাই সে জায়গাটা দেখাবে কালো। যেখানে কেবল নীল শুষে-নেওয়া হলুদ রঞ্জক রয়েছে, সে জায়গাটা দেখাবে হলুদ। সবুজ শুষে-নেওয়া রঞ্জক রয়েছে যেখানে, সেখানে সাদা আলো থেকে খালি সবুজটা বাদ যাবে, তাই (১৫৮পৃষ্ঠায়) ৬ নম্বর ছক অনুযায়ী ফিল্মের সে জায়গাটা দেখাবে ময়ূরপঙ্খী। আর লাল রঙ শুষে-যাওয়া জায়গাটা অন্য পাশ থেকে দেখলে দেখাবে তুঁতে রঙের। যেখানে কোনো রঞ্জকই নেই, সেখানে যে পাশ থেকে সাদা আলো আসছে তার উল্টোপাশটাতেও কেবল সাদাই দেখা যাবে, কেননা সাদার কোনো অংশই সেখানে শুষে যাচ্ছে না। রঙিন যে নকশাটার ছবি তোলার চেষ্টা হচ্ছে, সেটার সঙ্গে তুলনা করলে দেখা যাবে যে সাদা আলোয় ফিল্মটাতে পাওয়া যাচ্ছে তার পূরক রঙগুলি। পূরক রঙ বলতে কী বোঝায় তা 'রঙের যোগ-বিয়োগ' অধ্যায়ে বিশদ করে বলা হয়েছে। সাদা-কালো ছবিতে যেমন ফিল্মে একটা দৃশ্যের নেগেটিভ তৈরি করা হতো, তেমনই পূরক রঙের ফিল্মটা হলো ছবির রঙিন নেগেটিভ। এই নেগেটিভ থেকে কী করে পজিটিভ ছবি ছাপানো হবে, তা আমাদের পরবর্তী আলোচ্য বিষয়।

বিপরীত রঙের নকশাটা দিয়ে রঙিন ছবি ছাপানো হয় যে কাগজে, সেটার ভিত্তিটা সাদা রঙের হয়। রঙিন ফিল্মে যেমন পরপর কয়েকটা স্তর থাকে, তেমনই থাকে ওই সাদা কাগজটার উপর। হলুদ আলো সে স্তরগুলির উপরে পড়লে তার ছাপ পড়ে দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্তরে। কেননা হলুদ আলো হলো সবুজ ও লাল আলোর মিশ্রণ – সবুজটা ছাপ ফেলে দ্বিতীয় স্তরে ও লাল আলো ছাপ ফেলে তৃতীয় স্তরে। ঠিক একইভাবে, ময়ূরপঙ্খী আলো ছাপ ফেলে প্রথম ও তৃতীয় স্তর দুটিতে, আর তুঁতে রঙের আলোর ছাপ পড়ে প্রথম ও দ্বিতীয় স্তরে। সাদা আলো তিনটি স্তরেই ছাপ ফেলে। আর নকশার যে জায়গাটা কালো, সেখান থেকে তো কোনো আলোই আসছে না, তাই তা কোনো স্তরেই ছাপ ফেলে না।

রঙিন নেগেটিভটার উপর একপাশ থেকে সাদা আলো ফেলে অন্যপাশে আলোর যে নকশাটা পাওয়া যায়, সেটা ফেলা হয় রঙিন ছবি ছাপানোর কাগজটার উপর। রঙ-বেরঙের সে নকশাটা ছাপ ফেলে কাগজটার উপরে থাকা বিভিন্ন স্তরগুলিতে। কাগজটা ডেভেলপ করলে ছাপ-পড়া জায়গাগুলিতে দানা বেঁধে ওঠে রুপো। তারপরে রঞ্জক-সংযোজকের সাহায্যে সে জায়গাগুলিতে রঞ্জকগুলির জোট বাঁধানো হয় এবং একটা রাসায়নিক পদার্থ দিয়ে ধুয়ে সরিয়ে দেওয়া হয় রুপোর দানাগুলিকে — কাগজে জমা

পড়ে থাকে শুধু রঞ্জকগুলি। সেই রঞ্জিত কাগজটা সাদা আলোয় ধরলে কেমন দেখাবে? ৪১ নম্বর ছবিতে তা বোঝানোর চেষ্টা করা হয়েছে। যেখানে কোনো রঞ্জকই নেই, সেখানে সাদা আলো পড়লে তার সবটাই প্রতিফলিত হবে, তাই সেখানটা দেখাবে সাদা। যেখানে সবুজ শুষে-নেওয়া ও লাল শুষে-নেওয়া রঞ্জক রয়েছে, সেখান সাদা আলো পড়লে প্রতিফলিত হবে কেবল নীল আলো --- তাই সেখানটা দেখাবে নীল। যেখানে নীল শুষে-নেওয়া ও লাল শুষে-নেওয়া রঞ্জক রয়েছে, সেখানে সাদা থেকে প্রতিফলিত হবে কেবল সবুজ। নীল আলো ও সবুজ আলো শুষে-নেওয়া রঞ্জকের জায়গাটা থেকে প্রতিফলিত হবে কেবল লাল। যেখানে নীল-সবুজ-লাল এই তিন রঙই শুষে যায় সেখান থেকে কোনো রঙই প্রতিফলিত হবে না সে জায়গাটা দেখাবে কালো। যে নকশাটা নিয়ে আলোচনাটা শুরু হয়েছিলো, এইভাবে পাওয়া যাবে তার রঙিন ছবি। নকশাটার বদলে যেকোনো দৃশ্যই থাক না কেন, একইভাবে তারও রঙিন ছবি পাওয়া যাবে।

● — ○ — ● — ○ — ●

ক্যামেরায় ফিল্ম ভরে তা দিয়ে ছবি তোলার একটা অসুবিধা হলো, ছবিটা কেমন উঠলো তা জানার জন্য অনেকক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়। সাধারণত দোকানে যে গোলপাকানো ফিল্ম কিনতে পাওয়া যায় তাতে অনেকগুলি ছবি ওঠে, তাই গোটা ফিল্মটা তো আগে শেষ হওয়া চাই। তারপরে সেটা ক্যামেরা থেকে বের করে ছবি ডেভেলপ করা ও ছাপানোর দোকানে পাঠানো, সেখান থেকে আনার ব্যবস্থা করা -- অনেক হাঙ্গামা। ছবি তুলেই সেটা না দেখা পর্যন্ত যাদের তর সয় না, তাদের জন্য ক্রমশ তৈরি হলো এক ঘণ্টায় ছবি ছাপানোর দোকান। যারা আরো অধৈর্য, তাদের জন্য পোলারয়েড নামে এক মার্কিনি প্রতিষ্ঠান বের করেছিলো কয়েক মিনিটে আপনা থেকেই ডেভেলপ করা ও ছাপা যায় এমন ফিল্ম। কিন্তু দামটা একটু বেশি এবং ছবিও তেমন ভালো ওঠে না বলে সেগুলি খুব একটা জনপ্রিয় হয়নি।

১৯৯০-এর দশকে 'ইলেকট্রনিক' বা বৈদ্যুতিন ক্যামেরা চালু হওয়ার পরে চটপট ছবি পাওয়ার উপায়টা অনেক সহজ হয়ে গেছে। সে ক্যামেরাতে ছবি তুলতে কোনো ফিল্মই লাগে না। একটা ছবি তোলার পরেই ছবিটা কেমন উঠেছে তা ক্যামেরার গায়ে লাগানো একটা পর্দাতেই পরখ করা যায়। নানান উপায়ে ক্যামেরা থেকে সে ছবি কম্পিউটারেও পাঠিয়ে দিয়ে কম্পিউটারের আরো বড়ো পর্দায় ভালোভাবে দেখা যায় ও ইচ্ছা হলে যতো খুশি ছাপিয়েও নেওয়া যায়। ফিল্মে ছবি তোলার চেয়ে এটা যে অনেক বেশি সুবিধার, তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু ফিল্ম ছাড়া ছবি ওঠে কী করে?

লেখা, ছবি, গান-বাজনা, কথা ইত্যাদি যে কোনো তথ্যই কম্পিউটারে জমা রাখা হয় প্রথমে সে তথ্যটাকে কোনো না কোনো উপায়ে সংখ্যায় পরিবর্তন করে।
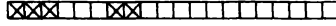
৪২ নং ছবি॥ *পিক্সেলের সারি। কয়েকটা পিক্সেলে আলো পড়েছে, সেগুলো বোঝানো হয়েছে ঢ্যারা দাগ দিয়ে।*

কম্পিউটারের ভাষা হলো অঙ্কের ভাষা — কম্পিউটারের কাজই হলো সংখ্যাদের নিয়ে যোগ-বিয়োগ-গুণ-ভাগ ইত্যাদি করা, সেগুলিকে স্মৃতিতে জমিয়ে রাখা, এবং চাইলেই স্মৃতি থেকে বার করে জানানো। বৈদ্যুতিন ক্যামেরায় তোলা প্রতিটি ছবি তেমনি অজস্র সংখ্যার সমাবেশ। ছবির কোন অংশটা কী রঙের, এবং কতো উজ্জ্বল বা অনুজ্জ্বল, সংখ্যাগুলি সেটাই মাপে। ছবিকে এভাবে সংখ্যায় পরিণত করার একটা উপায় আবিষ্কার করেছিলেন উইলার্ড বয়েল ও জর্জ স্মিথ নামে দুই মার্কিন বিজ্ঞানী, ১৯৬৯ সালে। তাঁরা কাজ করতেন মার্কিন দশের নিউজার্সি রাজ্যে বেল টেলিফোন ল্যাবোরেটরি নামে একটা গবেষণাগারে। সেখানে টেলিফোনে ছবি পাঠানো নিয়ে কাজ চলছিলো বেশ কিছুদিন — তাঁদের কাজ ছিলো অর্ধপরিবাহী পদার্থে কীভাবে তথ্য জমিয়ে রেখে কৃত্রিম 'স্মৃতি' তৈরি করা যায় তা নিয়ে।

সিলিকন, জার্মেনিয়াম ইত্যাদি বস্তুর উপরে আলো যেখানে পড়ে সেখানে আলোর শক্তি পরমাণুর বাঁধন থেকে ইলেকট্রনকে মুক্ত করে। এই ব্যাপারটার নাম 'আলোকবিদ্যুৎ প্রক্রিয়া', ১৯০৫ সালে জার্মানীর বিজ্ঞানী আলবার্ট আইনস্টাইন প্রথম এর ব্যাখ্যা দেন। অর্ধপরিবাহী দিয়ে তৈরি একটা চাকতিতে একেক জায়গায় যদি একেক পরিমাণ ইলেকট্রন জমা হয়, তাহলে কীভাবে সেই ইলেকট্রনগুলি জিনিশটার গা দিয়ে বয়ে নিয়ে তাদের সংখ্যাগুলি বিশদভাবে মাপা যায়, সেটার উপায় বের করলেন বয়েল ও স্মিথ। ইলেকট্রনের বৈদ্যুতিক চার্জ আছে বলে তাঁদের উদ্ভাবিত এই কলটার নাম "চার্জ-কাপল্ড ডিভাইস" — ইংরিজি নামটার আদ্যাক্ষরগুলি দিয়ে CCD। সি-সি-ডি আবিষ্কারের অনতিকাল পরেই বিজ্ঞানীরা বুঝলেন যে আলোকবিদ্যুৎ প্রক্রিয়া কাজে লাগিয়ে সি-সি-ডি দিয়ে ছবি তোলা সম্ভব। সরু একটা লাঠির আকারে একটা সিলিকনের টুকরো দিয়ে সি-সি-ডি তৈরি করে এবং তার উপরে আলো ফেলে প্রথম ছবি তোলা হয়েছিলো বেল ল্যাবোরেটরিতে, ১৯৭০ সালে।

লাঠির আকারের সে সি-সি-ডিটা ছিলো গায়ে গায়ে লাগানো অনেকগুলি খোপে খোপে ভাগ করা। সেই খোপগুলিতে আলো পড়লে সেখানে ইলেকট্রনগুলি পরমাণু থেকে ছাড়া পেয়ে জমা হয়, এবং কোন খোপে কতো ইলেকট্রন রয়েছে তার মাপ থেকে বোঝা যায় কোন খোপে কতোটা আলো পড়েছিলো। ওই খোপগুলিতে পড়া আলোর মাপ দিয়ে ছবি তৈরি হয় বলে ওগুলিকে বলা হয় "পিকচার এলিমেন্ট" বা সংক্ষেপে

"পিক্সেল"। ৪২ নম্বর ছবিতে দেখানো কুড়িটা পিক্সেলে যদি আলো-ছায়ার এমন একটা নকশা পড়ে যাতে শুধু প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পিক্সেলগুলোয়, আবার সপ্তম আর অষ্টমটাতে আলো পড়ছে, আর বাকিগুলো ছায়ায় রয়েছে, তাহলে শুধু ১,২,৩,৭ আর ৮ নম্বরের পিক্সেলগুলো থেকেই ইলেকট্রন আসবে, অন্যগুলো থেকে আসবে না। এই তথ্যটা সি-সি-ডির স্মৃতিতে রেখে দিলে পরে যে কোনো সময়ে ওই রকম আলো-ছায়ার নকশাটা তৈরি করা যাবে। সি-সি-ডির এই আবিষ্কারটা প্রযুক্তির জগতে প্রচুর সাড়া জাগিয়েছিলো। আমেরিকার ফেয়ারচাইল্ড সেমিকন্ডাক্টর, টেক্সাস ইন্সট্রুমেন্ট আর রেডিও কর্পোরেশন অফ আমেরিকা এবং জাপানের সোনি সি-সি-ডি নিয়ে আরো গবেষণা শুরু করলো। ১৯৭৪ সালে ফেয়ারচাইল্ড বিক্রির জন্য বের করলো ৫০০ পিক্সেলের সারি বসানো সি-সি-ডি। শুধু এই রকম পিক্সেলের সারিই নয় — একটা সিলিকনের চাকতিতে একটা সারির উপরে পরপর আরো সারি বসিয়ে হাজার হাজার পিক্সেলওলা চৌখুপি সি-সি-ডিও তৈরি হলো।

১০০ পিক্সেলের ১০০টা সারি দিয়ে তৈরি, অর্থাৎ ১০ হাজার পিক্সেলের সি-সি-ডিও প্রথম তৈরি হলো ১৯৭৪ সালে। কাজুও ইওয়ামা-র নেতৃত্বে সোনি কর্পোরেশন শস্তায় সি-সি-ডি তৈরির জন্য প্রচুর টাকা ঢেলে গবেষণা শুরু করেছিলো। সে চেষ্টা সফলও হলো — সোনির তৈরি সি-সি-ডি দিয়ে ১৯৮০-র দশকে বাজারে এলো 'ক্যামকর্ডার' নামে হাতে-ধরা চলমান ছবি তোলার ক্যামেরা। ইওয়ামা কিন্তু সেটা দেখে যেতে পারেননি, ১৯৮২ সালে তাঁর মৃত্যু হয়।

লাঠির মতো একটা সারির বদলে চৌখুপি ছকে সাজানো সারি সারি পিক্সেলওলা সি-সি-ডিতে ছবি তোলা খুব সহজ হয়ে এলো। ক্যামেরাতে যেখানে ফিল্ম বসানো থাকতো সে জায়গায় সি-সি-ডির চাকতিটা রাখলে তার উপরে বাইরের দৃশ্যটার ছাপ এসে পড়বে। সে দৃশ্যটা থেকে আসা আলো যে পিক্সেলগুলিতে পড়বে শুধু সেখানেই মুক্ত ইলেকট্রনের সৃষ্টি হবে। সি-সি-ডির কাজ হলো কোথায় কতোগুলি ইলেকট্রন মুক্ত হলো সেটা হিসেব রাখা। সে তথ্যটা ক্যামেরার ভিতরে থাকা ছোটো এক কম্পিউটারে জমিয়ে রাখলে দৃশ্যটা পুরোপুরি জানা হয়ে যাবে। পিক্সেলের সংখ্যা যতো বেশি, ছবিটাও ততোই স্পষ্ট হবে।

১৯৮০-র দশকে শুরু হলো খুদে কম্পিউটারের যুগ। বছরে-বছরে কম্পিউটার প্রযুক্তির অগ্রগতির সাথে সাথে কমতে শুরু করলো কম্পিউটারের আয়তন, ওজন ও দাম। অতিক্ষুদ্র-কম্পিউটার, ইংরিজিতে যাকে বলে মাইক্রোকম্পিউটার, এবং তার সাথে লাগানো সি-সি-ডি বা ওইজাতীয় কল ব্যবহার করে ১৯৯৪ সালে প্রথম বৈদ্যুতিন ক্যামেরা বাজারে চালু করলো 'কোডাক' নামে ফিল্মনির্মাতা আর 'অ্যাপ্‌ল' নামে এক কম্পিউটারের প্রতিষ্ঠান। প্রথম দিকের সে ক্যামেরার সি-সি-ডিতে পিক্সেলের সংখ্যা খুব বেশি হতো না — তার প্রতি সারিতে থাকতো ২৫৬টা পিক্সেল, এবং সে রকম ২৫৬টা

সবুজ	নীল	সবুজ	নীল	সবুজ	নীল	সবুজ	নীল
লাল	সবুজ	লাল	সবুজ	লাল	সবুজ	লাল	সবুজ
সবুজ	নীল	সবুজ	নীল	সবুজ	নীল	সবুজ	নীল
লাল	সবুজ	লাল	সবুজ	লাল	সবুজ	লাল	সবুজ
সবুজ	নীল	সবুজ	নীল	সবুজ	নীল	সবুজ	নীল
লাল	সবুজ	লাল	সবুজ	লাল	সবুজ	লাল	সবুজ

৪৩ নং ছবি ॥ *বেয়ারের ফিল্টার। মাঝখানে যে চারটি বাক্স মোটা দাগ দিয়ে ঘিরে দেওয়া হয়েছে, সেই এককটিই পুনরাবৃত্ত হচ্ছে।*

সারি থাকতো, অর্থাৎ মোট পিক্সেলের সংখ্যা হতো ২৫৬ × ২৫৬, প্রায় ৬৫০০০-এর মতো। ক্রমশ সি-সি-ডির প্রযুক্তিও এগিয়ে চললো, তৈরি হলো ৬৪০ × ৪৮০ (অর্থাৎ প্রতি সারিতে ৬৪০টা পিক্সেল, এবং সে রকম ৪৮০টা সারির) সি-সি-ডি। এদের মাধ্যমে তোলা ছবি কম্পিউটারে দেখতে খারাপ লাগে না -- ই-মেলে বা হাতে-ধরা টেলিফোনে এই মাপের ছবিগুলিই সাধারণত পাঠানো হয়ে থাকে। কিন্তু ছাপালে পরে সে ৬৪০ × ৪৮০ মাপের ছবিও দেখতে খুব একটা ভালো হয় না, খানিকটা দানা-দানা লাগে। সে অসুবিধাটা দূর হলো তার পরের ধাপে, ১২১৬ × ৯১২ (অর্থাৎ ১১ লক্ষেরও বেশি) পিক্সেলওলা সি-সি-ডি বাজারে আসার পরে। ১০ লক্ষ পিক্সেলকে প্রযুক্তির ভাষায় ১ মেগাপিক্সেল বলা হয়।

কিন্তু সিলিকন তো সাদা আলোর সব রঙই প্রায় সমানভাবে শুষে নেয়। তাই সিলিকন দিয়ে তৈরি প্রথম সি-সি-ডিগুলিতে তোলা ছবি কেবল সাদা-কালো রূপেই দেখা যেতো। সি-সি-ডি দিয়ে রঙিন ছবি তোলার উপায় ১৯৭৬ সালে বের করেন মার্কিন বিজ্ঞানী ব্রাইস বেয়ার, জেমস ক্লার্ক ম্যাক্সওয়েলের সেই পুরোনো তিনরঙা ফিল্টারের ধারণাটা কাজে লাগিয়ে। বেয়ার দেখালেন যে সি-সি-ডির পিক্সেলগুলির ঠিক উপরেই যদি লাল সবুজ ও নীল ফিল্টারের একটা চৌখুপি নকশা পেতে দেওয়া যায় তাহলে প্রতিটি পিক্সেলে কেবল একটি মৌলিক রঙের আলো পড়বে — অর্থাৎ লাল,

সবুজ বা নীল। কোন পিক্সেলটার উপর কোন রঙের ফিল্টার রয়েছে সেটা জানা থাকলে ছবিটার কোন অংশে কতোটা এবং কী রঙ রয়েছে তার ঠিক হিসাবটা পাওয়া যাবে সেই পিক্সেলে কতোগুলি মুক্ত ইলেকট্রন জমা হলো তার গুনতি থেকে। এই তথ্যগুলি মনে রাখা কম্পিউটারের পক্ষে বেশ সহজ ব্যাপার -- এবং সেই তথ্য পর্দায় বা ছাপানোর যন্ত্রে পাঠিয়ে দিয়ে রঙিন ছবিটা দেখা বা ছাপানোও কঠিন নয়। বেয়ারের ফিল্টারটাতে লাল, সবুজ ও নীলের নকশাটা ছিলো ৪৩ নম্বর ছবির মতোন। লাল-সবুজের পরপর খোপ-খোপ একটা সারি, তার পরেই সবুজ-নীল করে করে আবার একটা সারি — তার পরেই ঘুরে আসছে আবার লাল-সবুজের সারি, এভাবে পাল্টে-পাল্টে তৈরি হয় বেয়ারের ফিল্টার। সি-সি-ডির যে কোনো একটা পিক্সেলের উপর থাকে ৪৩ নম্বর ছবিতে ভারি করে দাগ দেওয়া অংশটার মতো একটা নকশা, যার চার ভাগের মধ্যে দু ভাগ ঢাকা থাকে সবুজ ফিল্টারে, আর বাকিটায় সমান সমান অংশ থাকে লাল আর নীল ফিল্টারের। এই বৈষম্যের কারণ, মানুষের চোখে সবুজ রঙটা সাড়া জাগায় বেশি, (১৪৭ পৃষ্ঠায়) ২৯ নম্বর ছবিতে যা দেখানো হয়েছিলো। তাই ক্যামেরাতে তোলা ছবিতেও সবুজ রঙটা প্রকট করতে হয় একটু বেশি। বেয়ার ফিল্টার ছাড়াও আরো কয়েক রকমভাবে সি-সি-ডিতে রঙিন ছবি তোলা যায়, কিন্তু শস্তা ও সহজ বলে এটাই এখন পর্যন্ত বেশির ভাগ রঙিন বৈদ্যুতিন ক্যামেরায় ব্যবহার করা হয়।

অবলোহিত-রশ্মি বোঝার কৃতিত্ব যে হার্শেলের
আলোকচিত্র সৃষ্টি করার কাজটা হলো তাঁর ছেলের।
তাঁদের হাতে পড়লো ধরা
দূরের কতো গ্রহ-তারা
বাথ শহরে তাইতো গড়া, মূর্তি তাঁদের মার্বেলের।

২৯ : রঙের নাম

পলাশ বরন পাল

মেঘ কালো, আঁধার কালো, আর কলঙ্ক যে কালো,
যে কালিতে বিনোদিনী হারালো তার কূল
তার চেয়ে কালো কন্যা তোমার মাথার চুল॥

'কালো'-কে রঙ বলা উচিত কিনা তা নিয়ে তর্ক চলতে পারে, কারণ সব রঙের আলোর অনুপস্থিতিতেই কোনো জিনিশকে কালো দেখায়। তবে ওপরের উদ্ধৃতিতে যে 'কালো' শব্দটি একটা রঙের নাম হিসেবেই ব্যবহৃত হয়েছে, তা নিয়ে কোনো তর্ক নেই। কেননা, লোকগীতির ধারা অনুসরণে গৌরীপ্রসন্ন মজুমদারের লেখা এই গানের পরবর্তী স্তবকগুলোতে রয়েছে যথাক্রমে সাদা, লাল ও সবুজ রঙের প্রসঙ্গ তুলে উদ্দিষ্ট কন্যার স্তুতি।

আরো নানা রঙ নিয়েও তো করা যেতে পারতো! আমেরিকার কিছু কিছু বিশ্ববিদ্যালয়ে নাকি সাহিত্যরচনা শেখার পাঠক্রম থাকে। ধরা যাক, সেই ধাঁচে বাংলায় কবিতা লেখার একটা কোর্স চালু হলো, এবং পড়ুয়াদের বলা হলো, আরো নানা রঙ নিয়ে এক একটি করে স্তবক রচনা করো এই রকম। কী কী রঙ নিয়ে লেখা যেতে পারে, তা তো ভাবতে হবে তখন তাদের! কেমন হবে তাদের ভাবনা?

নীল — নিশ্চয়ই। ধরা যাক কেউ লিখতে শুরু করলেন *'সমুদ্র নীল, অপরাজিতা নীল'* ইত্যাদি ইত্যাদি। বেশ। তারপর? গোলাপি? এখানে কি শুরু করবো *'গোলাপ গোলাপি'* দিয়ে? সেটা একটু খেলো শোনাবে না? কিম্বা বেগুনি রঙ দিয়ে লিখতে গিয়ে যদি শুরু করি *'বেগুন বেগুনি'*, তাহলেও মনে হয় খুব একটা ভালো শোনাবে না। যাই হোক, গান লেখা আমাদের আসল লক্ষ্য নয়। আসল লক্ষ্য হলো, কীসের রঙ কী রকম, সেই প্রশ্নটিকে অনুসরণ করে বিভিন্ন রঙের নাম নিয়ে খানিক চিন্তা করা।

বেগুনি বা গোলাপি নিয়ে যে সমস্যার কথা বললাম, সেই সমস্যা কিন্তু লাল সবুজ নীল সাদা কালোর কথা বলার সময়ে হয়নি। কেন হয়নি, এবং গোলাপি-বেগুনির

বেলাতেই বা হলো কেন? কারণ, এই যে গোলাপি বা বেগুনি রঙের কথা বলা হলো, এই সব রঙের নামগুলো আলাদা জাতের। বেগুনি রঙের নামটাই এসেছে বেগুন থেকে। বেগুনের সচরাচর যে রঙ হয়, সেটাই বেগুনি। বেশিরভাগ গোলাপ যে রঙের হয়, সেটাই গোলাপি। বিশেষ প্রক্রিয়ায় অন্য রঙের গোলাপ যে তৈরি করা যায় না তা নয়, কিন্তু সাধারণত গোলাপ ফুলের রঙ বলতে যে রঙটা আমাদের মনে আসে, সেই রঙটির নাম হচ্ছে গোলাপি। আকাশের রঙ প্রতিদিন এক রকম থাকে না, তবু আকাশি রঙ বললে নীলচে গোছের একটা কিছু ধরে নিই।

এই সব রঙের নামকে বলা যেতে পারে *বস্তুবাচক বর্ণনাম।* অর্থাৎ এ সব রঙের নিজস্ব কোনো নাম নেই, কোনো সুপরিচিত বস্তুর নাম দিয়ে এদের নাম। এ রকম প্রচুর রঙের নাম আমরা ব্যবহার করি বাংলায়। তুঁতে রঙ, খয়েরি রঙ, দুধে-আলতা রঙ, বাদামি রঙ, ছাই রঙ, সোনালি রঙ, কচি-কলাপাতা রঙ, কাঁচা-হলুদ রঙ — এ সবই বস্তুবাচক বর্ণনামের নমুনা। নতুন নতুন নাম তৈরি করাও যায়। নজরুল যখন 'কামরাঙা রঙ শাড়ি'-র কথা লিখেছিলেন, তখন এই রকমই একটি বস্তুবাচক রঙের নাম উদ্ভাবন করে সৃষ্টি করেছিলেন কাব্যিক ব্যঞ্জনা।

লাল বা কালো কিন্তু এ রকম শব্দ নয়। সেগুলো শুধু এক একটা রঙেরই নাম, অন্য কোনো জিনিশের নাম থেকে আসেনি এ সব শব্দ। নীল বা সাদা সম্পর্কেও সেই একই কথা। এই জাতীয় রঙের নামকে বলা যেতে পারে *মুখ্য বর্ণনাম।* এ ছাড়া আর যতোরকম শব্দ দিয়ে রঙের নাম বোঝানো হয়, তাদেরকে সমবেতভাবে বলা যাক *গৌণ বর্ণনাম।* যেহেতু আগাগোড়া রঙের কথাই বলা হচ্ছে, বিভ্রান্তির সম্ভাবনা নেই, তাই *'বর্ণ'* কথাটা উহ্য রেখে মাঝে মাঝে ছোটো করে শুধু *মুখ্য নাম* আর *গৌণ নাম* কথা দুটোও ব্যবহার কববো। আর একটা কথা বলে রাখা দরকার, 'মুখ্য' বা 'গৌণ' শব্দ দুটো কিন্তু রঙের উপযোগিতা বা তার ভৌতধর্ম সম্পর্কে কোনো মন্তব্য নয়। কোনো একটি ভাষায় রঙের নামটা কী ধরনের শব্দ বা শব্দগুচ্ছ দিয়ে বোঝানো হয়, শুধু সেই কথাটুকুই আমাদের আলোচ্য।

এক ধরণের গৌণ রঙের নামের কথা আগেই বলেছি, সেগুলো হলো বস্তুবাচক রঙ। অন্য জাতের গৌণ রঙও হয়। যেমন যদি বলি 'ঘন নীল' বা 'ফিকে সবুজ', তাহলে মুখ্য নামের সঙ্গে একটা বিশেষণ যোগ করে রঙের বর্ণনাটা আরো সম্পূর্ণ করার চেষ্টা হচ্ছে। এগুলোকে বলা যেতে পারে *বিশেষিত বর্ণনাম।* বস্তুবাচক রঙের নামের মতোই এ ধরণের নামের সংখ্যাও অজস্র। শুধু তাই নয়, নতুন নতুন নাম তৈরি করাও যেতে পারে অনায়াসেই। যদি বলি 'সামান্য ফিকে নীলের সঙ্গে সবুজের আভা মেশানো' — তাহলেই একটা রঙের নাম তৈরি হয়ে গেলো। কল্পনার ঘোড়ায় চেপে বসলেই এ রকমের আরো নাম তৈরি করা যায় অনায়াসে — সম্ভাবনা অগুনতি। অবশ্য এমনি

করে এমন অনেক রঙের নামও তৈরি করা যাবে যেগুলো বাস্তবে মেলে না, যেমন হলদেটে নীল বা সবজেটে গোলাপি।

● — ○ — ● — ○ — ●

মুখ্য বর্ণনামের সংখ্যা কিন্তু খুব বেশি নয়। শুধু বাংলায় নয়, পৃথিবীর কোনো ভাষাতেই। এবং গৌণ নামের সঙ্গে আর একটি মৌলিক পার্থক্য হলো, মুখ্য রঙের নাম ইচ্ছেমতো তৈরি করে নেওয়া যায় না। সাদা কালো লাল বা নীলের মতো আর একটা শব্দ ইচ্ছে হলেই বানানোর সাধ্য কারুর নেই। আমরা যদি ভেবে বসি, যা খুশি কয়েকটা বর্ণ জুড়ে একটা শব্দ বানালেই তাবৎ বাংলাভাষী লোক সে শব্দের একটা অর্থ মেনে নেবে, তাহলে ভয়ঙ্কর ভুল হবে। ওভাবে কোনো ভাষাতেই শব্দ তৈরি হয় না।

বাংলায় মুখ্য রঙ কটা? আগের প্যারাগ্রাফে চারটে রঙের নাম দিয়েছি, সম্ভবত কেবল সেই চারটেই। 'হলুদ' শব্দটির বাংলায় দুটি অর্থ — একটি রঙের নাম, এবং একটি মশলার নাম। সংস্কৃতে এ দুটি অর্থে দুটি আলাদা শব্দ, যথাক্রমে 'পীত' ও 'হরিদ্রা'। মনে হয়, মশলার এই নামটাই বিবর্তিত হয়ে 'হলুদ' হয়ে গেছে, রঙের নামটা এসেছে তার থেকে। 'সবুজ' তেমনি 'সবজি' থেকে এসেছে, ফার্সি শব্দ। 'কমলা' রঙ হলো কমলালেবুর রঙ। কেন ফলটির ওই নাম হলো, তা অবশ্য স্পষ্ট নয়। হয়তো খোসা ছাড়িয়ে কোয়াগুলো ছড়িয়ে দিলে পদ্মফুলের মতো দেখতে লাগে বলে পদ্মের নামে ফলের নাম। তারপর তা থেকে রঙের নাম। আর 'বাদামি' নামটা অতি সাম্প্রতিক, সম্ভবত ইংরিজি 'brown' শব্দটির জুতসই বাংলা করার তাগিদে উদ্ভূত শব্দ।

আবার, এমন কিছু কিছু রঙের নামও থাকে, যেগুলোকে মুখ্য বর্ণনাম বলে মনে হয়, কিন্তু আসলে মোটেই তা নয়। এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ হলো বাংলায় 'খাকি' শব্দটা। ফার্সিতে 'খাক্' মানে মাটি — যা থেকে বাংলায় এসেছে 'পুড়ে খাক হয়ে যাওয়া' কথাটা। বাংলায় 'খাক' শব্দটার আলাদা করে ব্যবহার নেই বলে, এবং 'পুড়ে খাক' শব্দগুচ্ছে 'খাক' কথাটার অর্থ আমরা অনেকেই জানি না বলে মনে হতে পারে যে এটি মুখ্য বর্ণনাম। আসলে এটি গৌণ বর্ণনাম, 'খাক' বা মাটির রঙ হলো খাকি।

ইংরিজিতে মুখ্য নামের সংখ্যা অনেক বেশি, এগারোটা। বাংলার যে কটির নাম দিয়েছি তাদের ইংরিজি প্রতিশব্দ এই এগারোটার মধ্যে পড়ে, তাছাড়া পড়ে yellow green brown purple pink gray orange এই সাতটি নাম। এর মধ্যে 'orange' শব্দটি নিয়ে আমার মনে কিছু সংশয় আছে — ফল আগে না রঙ আগে। ভাষাবিদেরা কেউ কেউ বলেন, সংস্কৃত 'নারঙ্গী' আরবীদের মারফত ইউরোপে গিয়ে 'orange' হয়েছিলো। তা যদি হয়, তাহলে ফলই আগে। এ যুক্তি মেনে এটিকে বাদ দিলেও ইংরিজির মুখ্য বর্ণনামের সংখ্যা দশ।

এমন কি কোনো ভাষা আছে, যাতে মুখ্য বর্ণনামের সংখ্যা বাংলার চেয়ে কম? অবশ্যই আছে। এমন ভাষাও আছে যাতে স্রেফ দুটো মুখ্য নাম। নিউ গিনি দ্বীপের পশ্চিম ভাগের দুগুম-দানি নামে একটি ভাষার উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে, তাতে যাবতীয় রঙ বোঝানো হয় দুটি শব্দ দিয়ে — *'মদ্‌লা'* আর *'মিলি'* — প্রথমটার অর্থ 'হালকা' বা 'উজ্জ্বল' জাতীয় একটা কিছু, আর দ্বিতীয়টার ব্যবহার সমস্ত 'গাঢ়' রঙ বোঝাতে। পূর্ব আফ্রিকার সোয়াহিলি ভাষায় আছে তিনটে, সাদা কালো আর লালের প্রতিশব্দ। সোমালিয়ার ভাষায় এর চেয়ে আর একটা বেশি, সবুজের নামটি।

মানুষের মুখের ভাষা নিয়ে যাঁরা চর্চা করেন, তাঁরা বিভিন্ন ভাষা পর্যালোচনা করে মুখ্য বর্ণনামের কেন্দ্র সম্পর্কে বেশ কিছু চমকপ্রদ তথ্য আবিষ্কার করেছেন। তথ্যগুলো বলবার আগে তাই রঙের 'কেন্দ্র' বলতে কী বোঝানো হচ্ছে, সেটা বলে নেওয়া যাক।

ধরা যাক আমরা জানলাম যে 'ঝপাং' বলে একটা ভাষা আছে, তাতে একটি রঙের নাম হচ্ছে 'ভতাং'। কোন রঙ, তা আমরা জানি না। জানবার জন্য কী করা যেতে পারে? বাড়ির দেয়ালে বা জানলায় রঙ করাতে হলে আমরা যে রকম ক্যাটালগ দেখে সে রঙের অর্ডার দিই — যাতে নানা বিচিত্র রঙের নমুনা দেওয়া থাকে, সে রকম একটা ক্যাটালগ জোগাড় করবো প্রথমে। এইবার সেই ক্যাটালগটি মেলে ধরবো ঝপাং-ভাষী একজন ব্যক্তির সামনে, এবং তাঁকে বলবো, 'মশাই, কোন রঙটিকে আপনারা আদি অকৃত্রিম ভতাং রঙ বলেন সেটা দেখিয়ে দিন দিকি!' কোনো রঙ দেখে তাঁর মনে হবে, 'দুর, এটা ভতাঙের ধারেকাছেও নয়', কোনোটা দেখে মনে হবে, 'না, এটা যেন একটু হাল্কা', অথবা 'না, এটায় যেন ভতাঙের সঙ্গে একটু পটাং রঙ মেশানো হয়েছে' ... এই করতে করতে হঠাৎ একটি রঙ দেখে তিনি বলে উঠবেন, 'এই তো, এইটা হলো ভতাং রঙ।' সেইটাকে তাহলে আমরা বলবো ভতাং রঙের কেন্দ্র।

ভাষাবিদরা লক্ষ করেছেন, যে সব ভাষায় দুটি মাত্র মুখ্য বর্ণনাম আছে, সেই দুটি রঙের কেন্দ্র অবধারিতভাবে সাদা আর কালো। অর্থাৎ, এমন কোনো ভাষা নেই যেখানে লাল বা নীলের জন্য মুখ্য বর্ণনাম আছে কিন্তু সাদা-কালোর জন্য নেই। যে সব ভাষায় তিনটি মুখ্য বর্ণনাম, তাদের ক্ষেত্রে সাদা আর কালোর সঙ্গে অন্য যে রঙটির নাম যোগ হয়, সেটির কেন্দ্রের রঙটি লাল। যে সব ভাষায় আরো একটা বেশি, অর্থাৎ চার, সেখানে সাদা-কালো-লালের পরে চতুর্থ যে নামটি যোগ হয়, দেখা গেছে যে সেটি হয় হলুদ, নয়তো নীল বা সবুজের মধ্যে একটা। পাঁচটা মুখ্য বর্ণনাম যে সব ভাষায়, তাদের হলুদ থাকেই, আর থাকে নীল বা সবুজের মধ্যে একটা। আর ছটা মুখ্য বর্ণনাম থাকতে হলে এর সঙ্গে যোগ হয় নীল আর সবুজের মধ্যে অন্যটা। অর্থাৎ কোনো ভাষায় যদি ছটা মুখ্য বর্ণনাম থাকে, তাহলে সেই রঙগুলির কেন্দ্র হবে সাদা, কালো, লাল, হলুদ, নীল, সবুজ।

৯ নং ছক॥ *মুখ্য বর্ণনামের ব্যাপারে ভাষার প্রকারভেদ। ওপরে লেখা রয়েছে ভাষায় মুখ্য বর্ণনামের সংখ্যা, নিচে আছে সেই নামগুলোর কেন্দ্র কোথায়।*

সংখ্যা	২	৩	৪	৫	৬
রঙের কেন্দ্র	সাদা	সাদা	সাদা	সাদা	সাদা
	কালো	কালো	কালো	কালো	কালো
		লাল	লাল	লাল	লাল
			হলুদ/নীল/সবুজ	হলুদ	হলুদ
				নীল/সবুজ	নীল
					সবুজ

ছয়ের পরে আরো একটি মুখ্য বর্ণনাম যে সব ভাষায় আছে, তাদের ক্ষেত্রে সেই সপ্তম রঙটির কেন্দ্র যা হয়, সেটাকে বাংলায় বলতে গেলে বলতে হয় 'বাদামি' বা 'পাটকিলে' বা 'মেটে' রঙ, মোটামুটিভাবে ইংরিজিতে যাকে brown বলা হয়। ইংরিজির আরো যে চারটি মুখ্যনাম বাদ রইলো, তার আসে এর পরে। এখানে বিশেষ কোনো অনুক্রম নেই।

ইংরিজির চেয়েও বেশি সংখ্যক মুখ্য বর্ণনাম আছে, এমন ভাষা বোধহয় নেই। ইংরিজির সমান সংখ্যক নামওয়ালা আরো কয়েকটি ভাষা আছে, কিন্তু এইটিই প্রান্তসীমা। শয়ে শয়ে মুখ্য বর্ণনাম কোনো ভাষাতেই নেই, কয়েক ডজনও নেই। অথচ রঙ কতো রকম হতে পারে তার উত্তর ভাষার ওপর নির্ভর করে না, উত্তর হচ্ছে 'অগুনতি'।

●—○—●—○—●

এই অগুনতি রঙের জন্য কি অগুনতি নাম দরকার? দরকার থাকলেও সে দাবি মেটানো সম্ভব নয়, কেননা সত্যি সত্যি অগুনতি বা অসীম সংখ্যক শব্দ কোনো ভাষাতেই থাকে না। 'অসীম' কথাটার একেবারে আক্ষরিক অর্থ না ধরেও বলা যায়, কয়েক অযুত বা কয়েক হাজার রঙের নামও নিশ্চয়ই অভিপ্রেত নয়। অল্পস্বল্প শব্দ দিয়েই কাজ চালাতে হবে। তবে শুধু গুটিকতক মুখ্য বর্ণনাম নিয়েও যে কাজ চলে না, সে কথাও বলা বাহুল্যমাত্র। দুটো নীল রঙের জামা থাকলে দুটোর মধ্যে তফাত বোঝাবার জন্য আমরা একটাকে হয়তো বলি 'হালকা নীল', অন্যটাকে 'গাঢ় নীল'। অনেক সময়ে তাতেও হয় না, রঙিন জিনিশের সংখ্যা আরো বেশি হলে আরো

জমকালো বিশেষণ লাগাতে হয় — হয়তো বলতে হয় 'তুঁতে রঙ' বা 'আসমানি রঙ'। ইংরিজিতে এর পরেও 'তুর্কি নীল', 'প্রাশিয়ান্ ব্লু' ইত্যাদি করে বলা হয়।

এ রকম সূক্ষ্ম ভাগবিভাগ যেখানে সবচেয়ে কাজে লাগে, তা হলো রঙ করার সময়ে। আঁকা ছবিতে রঙ করাই হোক, কাপড়ের কারখানায় কাপড় ছোপানোর কাজেই হোক, বা বাড়ির দরজায় জানলায় কলি ফেরানোই হোক, কী রঙ চাওয়া হচ্ছে তা খুঁটিয়ে বলবার জন্য রঙের সূক্ষ্ম নাম প্রয়োজন। চিত্রশিল্পী কয়েক ডজন রকমের রঙ কিনতে পারেন দোকান থেকে, তারপর সেই রঙগুলো উপযুক্ত পরিমাণে মিলিয়ে মিশিয়ে আরো নানা রকমের রঙ তাঁরা নিজেরাই তৈরি করে নেন। মুশকিল হচ্ছে, এই মেশানো রঙগুলোর কোনো নির্দিষ্ট নাম নেই, আজ যে রঙ তৈরি করা হলো ভবিষ্যতে কেউ ঠিক সেই রঙটিই বানাতে পারবেন কিনা তার কোনো নিশ্চয়তা নেই। কিম্বা একটি বিখ্যাত ছবি দেখিয়ে যদি প্রশ্ন করা যায় সেটির বাঁ দিকের কোনায় কী রঙ ব্যবহার করা হয়েছে, সে প্রশ্নের উত্তর দেওয়াও মুশকিল হবে, কেননা সে রঙটির সর্বজনমান্য কোনো নাম নাও থাকতে পারে।

রঙের নাম বোঝানো তাই প্রায়শই মুশকিল হয়ে পড়ে। বাড়িতে রঙ করতে হলে কোন রঙ চাইছি তা আমরা বলে বোঝাবার চেষ্টাও করি না, রঙের কোম্পানির ক্যাটালগ থেকে তাদের তৈরি একটি রঙ বেছে নিয়ে, তার পাশে যে নাম বা নম্বরটি লেখা থাকে সেইটি উল্লেখ করে বলে দিই, ওই রঙটি ব্যবহার করতে হবে। আমরা যা চাইছি ঠিক সেই রঙটি যদি তালিকায় নাও থাকে, তবুও কাছাকাছি কিছু একটায় সন্তুষ্ট হই, ক্যাটালগে নেই এমন রঙের নাম বলে ঝুঁকি নিই না। অবশ্য তাতেও ঝামেলা শেষ হয় না। এক কোম্পানির বাক্সে যে রঙটিকে 'কমলা' বলা হয়, অন্য কোম্পানির বাক্সের 'কমলা' রঙের সঙ্গে তা হুবহু মেলে না। একটি নির্দিষ্ট কোম্পানির ক্যাটালগ অনুসরণ না করলে তাই বিপর্যয় হওয়ার সম্ভাবনা থেকে যায়।

এ কথা ঠিক যে কিছু কিছু রঙের বিচিত্র নামের উৎস সন্ধান করে অনেক জ্ঞানের কথা জানা যায়। যিনি কোনোদিন অপরাজিতা ফুল দেখেননি, তাঁকে যদি একটি রঙ দেখিয়ে বলা হয় যে এটি অপরাজিতা রঙ, তাহলে ফুলটি সম্পর্কে তাঁর কিছু একটা ধারণা জন্মায়। মনে আছে, ইশকুলে পড়ার সময়ে কেমিস্ট্রি বইতে দেখতাম, কীসের সঙ্গে কী যেন মেশালে কী একটা জিনিশ তৈরি হয় যার রঙ ক্যানারি পাখির মতো। পরে যখন পরীক্ষাগারে হাতে হাতে সেই সব মিশিয়ে দেখলাম, তখন রসায়নশাস্ত্র সম্পর্কে আমাদের জ্ঞানবৃদ্ধি হয়েছিলো কিনা জানি না, তবে ক্যানারি পাখি সম্পর্কে কিঞ্চিৎ অবান্তর জ্ঞানলাভ হয়েছিলো তাতে সন্দেহ নেই। এখন যে ভূভাগকে জার্মানি বলা হয়, তার যে প্রাশিয়া বলে একটা অংশ ছিলো, সে অংশটা যে একটা আলাদা রাজ্য ছিলো, এবং সেই রাজ্যের সৈন্যরা যে একটি বিশেষ ধরনের নীল রঙের উর্দি পরতেন, শুধু 'প্রাশীয় নীল' রঙটির নামের উৎস সন্ধান করেই সে সব আমরা জেনে

ফেলতে পারি। কিন্তু এ সব সান্ত্বনাবাক্যের আড়ালেও আসল কথাটা ঢাকা পড়ে না। সে কথাটা হলো, গৌণ বর্ণনাম এতো বেশি আর এতো বিচিত্র যে এক জনে রঙের যে নাম ব্যবহার করেন তা অন্য জনের পক্ষে বোঝার পথে বেশ কিছু অন্তরায় থেকে যায়।

এই সব বিপর্যয় বা অসুবিধার কথা বেশ বড়ো হয়ে দেখা দিলো সাম্প্রতিক কালে, যখন কম্পিউটারের পর্দায় রঙিন লেখা ও ছবি দেখানো সম্ভব হলো। কম্পিউটারকে তো শুধু গুটিকতক মুখ্য রঙের নাম জানলেই চলবে না, ছবিতে রঙের বাহার ফোটানোর জন্য অনেক রঙের অনেক আভার কথা জানতে হবে। কী করে কম্পিউটারকে বোঝানো হবে এই সব রঙের নাম? প্রথমদিকে কম্পিউটারে খুব বেশি রকমের রঙ ফোটানো যেতো না, ৬৪ রকমের রঙ দিয়ে শুরু হয়েছিলো। তখন মুখ্য বর্ণনাম, তার সঙ্গে কিছু বিশেষিত নাম, আর কিছু বস্তুবাচক নাম দিয়েই চেষ্টা করা হয়েছিলো। তাতেই অবশ্য এমন অদ্ভুত অদ্ভুত নাম তৈরি হলো যে সকলেরই গুলিয়ে যেতে লাগলো। 'গম রঙ' বা 'ইঁট রঙ' তবু চেষ্টা করলে মনে রাখা যায়, কিন্তু 'সাগরনীল' বললে কোন সাগরের কোন জায়গার জলের নীলিমার কথা বলা হচ্ছে তা মনে রাখা কঠিন। তার ওপরেও আমদানি করতে হলো 'sienna' 'fuchsia' 'burnt orange' জাতীয় নাম। এর কিছু কিছু নাম আগে চিত্রশিল্পীদের চেনা ছিলো, কিন্তু নতুনও যোগ করতে হলো বেশ কিছু।

কিন্তু এভাবে তাল রাখা যাবে না তা আগেই বোঝা গিয়েছিলো। অল্প কিছুদিনের মধ্যেই কম্পিউটার আরো অনেক সূক্ষ্ম তারতম্য উপস্থাপনার জন্য প্রস্তুত হলো। আরো নতুন নতুন বস্তুবাচক নাম তৈরি না করে এবারে তাই সম্পূর্ণ নতুন রাস্তা ধরা হলো — সংখ্যা দিয়ে রাখা হলো রঙের নাম। এ একেবারে নতুন ধরনের নাম, একে বলা যেতে পারে *সংখ্যাবাচক বর্ণনাম* বা *সাংখ্য বর্ণনাম।* এই নামকরণের পদ্ধতিই বাকি অংশের আলোচ্য বিষয়।

● — ○ — ● — ○ — ●

সংখ্যার কথা আগেও একবার বলা হয়েছিলো। রঙের কোম্পানির ক্যাটালগে যে কোনো রঙের পাশেই একটা করে সংখ্যা দেওয়া থাকে সাধারণত। কিন্তু এই সংখ্যাগুলোর সঙ্গে রঙের প্রকৃতির কোনো সম্পর্ক নেই, কোম্পানিগুলো নিজেদের কাজের সুবিধের জন্য এক একটা রঙের সঙ্গে এক একটা সংখ্যা লাগিয়ে দেয়। অনেকটা মানুষের নাম দেওয়ার মতো ব্যাপার — নামটার দ্বারা মানুষটি সম্পর্কে কিছু জানা যায় না, কিন্তু কাজের সুবিধে হয়।

কম্পিউটারে ব্যবহারের জন্য রঙের যে সব সাংখ্যনাম দেওয়া হয়েছে, সেগুলো কিন্তু অন্য রকম। যে কোনো নাম থেকে সত্যিই রঙটা কী রকম তা বোঝা যায়, কারণ

নামগুলোর সঙ্গে রঙের প্রকৃতির একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। সম্পর্কটা বোঝার জন্য একটা কথা মনে করে নেওয়া যাক।

থিয়েটারের মঞ্চে যাঁরা আলোকসম্পাত করেন, একটাই সাদা আলোর সামনে বিভিন্ন রঙের পাতলা প্লাস্টিক ধরেন তাঁরা। লাল রঙ করতে হলে ধরেন লাল প্লাস্টিক, নীল করতে হলে নীল প্লাস্টিক, সবুজ করতে হলে সবুজ। হলুদ বা অন্যান্য রঙের আলো ফেলার জন্য কিন্তু তাঁদের কাছে ওই সমস্ত রঙের প্লাস্টিক থাকে না। লাল নীল সবুজ, এই তিনটি রঙ মিলিয়ে মিশিয়েই তাঁরা সব কাজ করেন। লাল আর সবুজ আলো মেশালে হয় হলুদ, লাল আর নীল মেশালে ময়ূরপঙ্খী, নীল আর সবুজ মিশে হয় সবুজাভ নীল রঙ, অনেকটা তুঁতে রঙের মতো। লাল নীল আর সবুজ, এই তিনটে রঙকে তাই বলা হয় *মৌলিক রঙ*। এদেরকে মিশিয়ে পাওয়া যায় অন্যান্য রঙ। রঙিন বই ছাপার সময়েও এই একই পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়, তাই ছাপার ভাষায় ত্রিবর্ণ ছবি মানেই বহুবর্ণ ছবি, কেননা তিনটে মৌলিক রঙ মিশিয়ে সব রঙের অনুভূতিই তৈরি করা যায় আমাদের চোখে।

এইটাই হচ্ছে মোদ্দা কথা। লাল সবুজ আর নীল এই তিনটে হলো মৌলিক রঙ, অন্যান্য সব রঙই এদের মিশিয়ে বানানো সম্ভব। এইবার তাহলে যে কোনো একটা রঙের কথা ভাবা যাক। রঙটা কম্পিউটারকে বোঝানোর জন্য আমাদের বলতে হবে কতোটা লাল কতোটা সবুজ আর কতোটা নীল মেশালে সে রঙ তৈরি হয়। পরিমাণের এই আনুপাতিক সংখ্যাগুলো যদি পরপর সাজিয়ে বলে দেওয়া হয়, তাহলে সেই সংখ্যাগুলো দিয়ে রঙটার একটা পরিচিতিও হয়। এই ব্যাপারটাকে কাজে লাগিয়েই সংখ্যাবাচক নাম তৈরি করা হয়েছে রঙের। কী করে, ক্রমশ তা বলছি।

ময়ূরপঙ্খী রঙের কথা ধরা যাক। সমান পরিমাণে লাল আর নীল মেশালে হয় ময়ূরপঙ্খী, সবুজ থাকে না। আমরা ঠিক করে নিলাম, আগে লাল, তারপরে সবুজ, শেষে নীলের পরিমাণ বলবো। তাহলে ময়ূরপঙ্খী বোঝাতে মাঝখানের নম্বরটা শূন্য হবে, দু পাশের দুটো সমান হবে। অর্থাৎ যদি লিখি (১,০,১), তাহলে বোঝাবে ময়ূরপঙ্খী। তেমনি যদি লিখি (১,১,০), তাহলে বোঝাবে লাল আর সবুজের সমানুপাতিক মিশ্রণ, অর্থাৎ হলুদ। যদি (১,১,১) হয়, তাহলে তিনটে মৌলিক রঙই মিশে যাচ্ছে। রামধনুর সব রঙ মিশে যেমন তৈরি হয় সাদা সূর্যালোক, এ ক্ষেত্রেও তেমনি তিনটে মৌলিক রঙ মিশে তৈরি হবে সাদা রঙ। আর (০,০,০) হলে কোনো রঙই নেই, কোনো আলোই নেই, তাই কালো।

(১,১,১) বা (০,০,০) কোনোটাই না বলে যদি বলি (০·৫,০·৫,০·৫)? এখানেও তিনটে মৌলিক রঙই সমান গুরুত্ব পাচ্ছে, কিন্তু তাদের পরিমাণ শূন্য নয় বলে রঙটা কালো হবে না, আবার পুরোপুরি রঙ দেওয়া হচ্ছে না বলে সাদাও হবে না। হবে মাঝামাঝি, ছাই রঙ। যদি (০·৩,০·৩,০·৩) বলতাম, তাহলেও ছাই রঙই

থাকতো, তবে আরো কালোর দিকে ঘেঁষে। যদি (০·৭,০·৭,০·৭) বলতাম, তাহলে হতো আরো ফিকে ছাই রঙ, অর্থাৎ আরো সাদার দিক ঘেঁষে।

তেমনি, ময়ূরপঙ্খী বোঝাতে গিয়ে (১,০,১) না লিখে যদি লিখতাম (০·৭,০,০·৭), তাহলেও লাল আর নীলের পরিমাণ সমান থাকতো, কিন্তু দুটোর পরিমাণই খানিকটা কম থাকতো বলে ময়ূরপঙ্খীটার ঔজ্জ্বল্য কম হতো, অর্থাৎ একটু গাঢ় ভাব বা কালচে ভাব আসতো ময়ূরপঙ্খীতে। (০·৮,০·৮,০) দিলে পুরো খোলতাই হলুদ হতো না, একটু ম্লান হতো। (০·৬,০·৬,০) দিলে হতো আরো ম্লান। কমাতে কমাতে লাল আর সবুজের পরিমাণ যদি শূন্য করে দিতাম, তাহলে তিনটে সংখ্যাই শূন্য হয়ে যেতো, রঙটা দাঁড়াতো কালো।

এবারে অন্য রকম ধরা যাক। তিনটে সংখ্যার কোনোটাই যদি কোনোটার সঙ্গে সমান না হয় তাহলে কী রকম হবে? (০·৮,০·৮,০) ছিলো একটু ম্লান হলুদ। তার জায়গায় যদি (০·৮,০·৭,০) করি? তাহলে লাল একটু বেশি থাকবে, সবুজ তার তুলনায় কম। অর্থাৎ হলুদের মধ্যে যে অনুপাতে লাল আর সবুজ ছিলো, তার চেয়ে এটায় লাল একটু বেশি। হলুদের তুলনায় একটু লালের দিকে হবে এই রঙ, অর্থাৎ কমলা। (০·৯,০·৭,০) করলে আরো লালচে কমলা। (০·৯৫,০·৭,০) করলে আরো লালচে কমলা। তেমনি যদি লাল আর সবুজের মধ্যে সবুজটা বাড়িয়ে দিই, তাহলে রঙ যাবে ক্রমশ কচি কলাপাতার দিকে, বা নজরুল যাকে কামরাঙা রঙ বলেছিলেন তার দিকে।

আর বলবার দরকার নেই, আশা করি বোঝা গেছে কী করে তিনটি মৌলিক রঙ মিশিয়ে সমস্ত রঙ তৈরি করা সম্ভব, এবং সেই রঙ অন্য কাউকে বোঝানো সম্ভব। কম্পিউটারে ঠিক এই পদ্ধতিটাই ব্যবহার করা হয়, তবে অনুপাতগুলো বোঝানো হয় একটু অন্য রকমভাবে। লাল সবুজ এবং নীল, প্রতিটি মৌলিক রঙের ঔজ্জ্বল্যকে কম্পিউটারে ভাগ করে নেওয়া হয় ২৫৬টি ভাগে - ০ থেকে ২৫৫ পর্যন্ত নাম দেওয়া হয় তাদের। অর্থাৎ কোনো মৌলিক রঙ যদি অনুপস্থিত থাকে তাহলে তার পরিমাণকে বলা হয় শূন্য, আর যতোখানি লাল বা সবুজ বা নীল দেওয়া সম্ভব পুরোটাই যদি দেওয়া হয় তাহলে তাদের পরিমাণকে বলা হয় ২৫৫। যে কোনো রঙ লেখা হয় ছ ঘরের একটি সঙ্কেতে। প্রতিটি মৌলিক রঙের পরিমাণের জন্য দুটো করে ঘর, প্রথম দু ঘরে লালের পরিমাণ, পরবর্তী দু ঘরে সবুজের, শেষ দু ঘরে নীলের। এই ছ ঘরের সঙ্কেতটিই হলো রঙের সংখ্যাবাচক নাম।

একটা খটকা থেকে যাচ্ছে, ২৫৫ পর্যন্ত সংখ্যা দুটো ঘরে লেখা হবে কী করে? এর জন্য একটা কায়দা করা হয়। সাধারণত সংখ্যা লেখার সময়ে আমরা দশটা সংখ্যাচিহ্ন ব্যবহার করি, ০,১,২ ইত্যাদি করে ৯ পর্যন্ত। তারপরে আরো বড়ো সংখ্যা লিখতে গেলে দু অঙ্কের বা আরো বেশি অঙ্কের সাহায্য লাগে। যখন ৭২ লিখি, বুঝে নিই তার

অর্থ হলো ৭ × ১০ + ২, ৯৮ মানে ৯ × ১০ + ৮, ইত্যাদি। সোজা কথায়, ডান দিক থেকে দ্বিতীয় যে ঘরটি সেটিতে যে সংখ্যা থাকে তাকে ১০ দিয়ে গুণ করে ভাবতে হয়। এইজন্যই এই পদ্ধতিকে আমরা বলি দশমিক পদ্ধতি।

কম্পিউটারে রঙ বোঝানোর সময়ে এই পদ্ধতিটা মেনে চলা হয় না। সেখানে ১৬-র হিসেব। অর্থাৎ সেখানে ৭২ লিখলে তার অর্থ দাঁড়াবে ৭ × ১৬ + ২ বা একশো চোদ্দো, যাকে দশমিকের ভাষায় আমরা লিখি ১১৪। ৯৮ লিখলে বুঝতে হয় ৯ × ১৬ + ৮ বা একশো বাহান্ন।

এইবার আবার প্রশ্ন উঠতে পারে, তাহলে এগারো বারো এই সব সংখ্যা লেখা হবে কী করে? একের পিঠে এক দিয়ে ১১ লিখলে তো এই পদ্ধতিতে বোঝাবে ১ × ১৬ + ১ বা সতেরো, ১২ লিখলে আঠেরো। ঠিক কথা। দশমিক পদ্ধতিতে যেমন দশের চেয়ে ছোটো সংখ্যা বোঝাবার জন্য শূন্য থেকে নয় এই দশটা সংখ্যাচিহ্ন লাগে, এই ষোলোমিকের হিসেবে লিখতে গেলেও শূন্য থেকে পনেরো পর্যন্ত মোট ষোলোটা সংখ্যাচিহ্ন লাগবে। শূন্য থেকে নয় যেমন ব্যবহার করি তেমনই করতে পারি, কিন্তু দশ থেকে পনেরোর জন্য ছটি নতুন চিহ্ন প্রয়োজন। এর জন্য ব্যবহার করা হয় *a* থেকে *f*, রোমক বর্ণমালার প্রথম ছটি বর্ণচিহ্ন। অর্থাৎ এই সঙ্কেতে *a* মানে দশ, *b* মানে এগারো, এমনি করতে করতে *f* মানে পনেরো। দু অঙ্কের সংখ্যাও বানানো যেতে পারে এদের দিয়ে। যদি বলি একটা সংখ্যা হচ্ছে *a3*, তাহলে বুঝতে হবে সেটা হচ্ছে 'দশ × ষোলো + তিন' বা একশো তেষট্টি, দশমিক পদ্ধতিতে যাকে আমরা লিখি ১৬৩। তেমনি *3a* লিখে বোঝানো হবে আটান্ন, *3b* লিখলে উনষাট, ইত্যাদি।

এইভাবে দুটি অঙ্ক লিখলে সবচেয়ে বড়ো কতো সংখ্যা লেখা যাবে? অবশ্যই *ff*, কেননা এক অঙ্কের সবচেয়ে বড়ো সংখ্যা *f* বা পনেরো। তাহলে *ff* মানে হলো 'পনেরো × ষোলো + পনেরো', অর্থাৎ দুশো পঞ্চান্ন। আগেই বলেছিলাম, এই পর্যন্ত সংখ্যাই আমাদের দরকার প্রতিটি মৌলিক রঙের পরিমাণ বোঝানোর জন্য। তাহলে এই ষোলোর হিসেবে দুটো অঙ্ক ব্যবহার করেই দুশো পঞ্চান্ন পর্যন্ত সংখ্যা লেখা সম্ভব। তিনটে মৌলিক রঙের জন্য এই রকম দুটো করে ঘর, তাই মোট ছ ঘরে লেখা যাবে রঙের নাম।

উদাহরণ দেওয়া যাক। যদি বলি *000000*, লাল সবুজ নীল সবই শূন্য, অর্থাৎ কোনো রঙ নেই, কালো। যদি বলি *ff0000* , তাহলে লাল পুরোপুরি, অন্য দুটো মৌলিক রঙ শূন্য, অর্থাৎ এ একেবারে টকটকে লাল। *00ff00* হলো পুরোপুরি সবুজ, *0000ff* একেবারে নীল। লালে সবুজে মিশিয়ে *ffff00* হচ্ছে সবচেয়ে উজ্জ্বল হলুদ, লালে নীলে *ff00ff* উজ্জ্বল ময়ূরপঙ্খী, তিন রঙে মিশে *ffffff* ধবধবে সাদা। তিনটে রঙ সমান রেখে যদি তাদের ঔজ্জ্বল্য কমাতাম, *cccccc* বা *ababab* বা *979797* ইত্যাদি করতাম, পাওয়া যেতো ছাই রঙ, ক্রমশ কম ঔজ্জ্বল্যের। আবার তিনটে রঙের পরিমাণই

আলাদা হতে পারে, যেমন *ab9c80*, সে ক্ষেত্রেও ওই অনুপাতে মিশে পাওয়া যাবে একটি রঙ। এইভাবে সব রঙের জন্যই ছ ঘরের সঙ্কেত তৈরি করা যাবে, সেগুলোই হবে রঙের নাম, সংখ্যাবাচক নাম।

প্রশ্ন উঠতে পারে, সমস্ত রঙ কি হবে এভাবে? ধরা যাক দুটো রঙ নিলাম, *990000* আর *980000*, অর্থাৎ লালের ৯৯ আর ৯৮। এতে বোঝানো হচ্ছে কতো পরিমাণে লাল ব্যবহার করা হচ্ছে এই রঙ দুটিতে। কিন্তু এর মাঝামাঝি পরিমাণ লাল যদি নিতাম তাহলেও তো একটা রঙ হতো! সে রঙটিকে কী নামে ডাকা হবে? যেভাবে ছ ঘরের সঙ্কেত করা হয়েছে, তাতে তো ভগ্নাংশের স্থান নেই!

যুক্তির দিক থেকে কথাটায় ভুল হবে না কোনো, কিন্তু কার্যত এটা কোনো সমস্যাই নয়। সাড়ে ৯৮ পরিমাণ লাল দিলে একটা নতুন রঙ হবে তাতে সন্দেহ নেই। প্রশ্ন হচ্ছে, আমাদের চোখ কি এই নতুন রঙটির সঙ্গে ৯৮ বা ৯৯ নম্বর রঙের তফাত ধরতে পারবে?

উত্তর হচ্ছে — না। সাড়ে ৯৮-এর কথা তো দূরস্থান, ৯৮ আর ৯৯-এর তফাতও চোখে ধরা যায় না, সত্যি বলতে কি ৯৮-এর সঙ্গে ৯২-এর তফাত ধরাও দুঃসাধ্য। অর্থাৎ, আমরা চোখে যতো রকমের রঙের তফাত করতে পারি, তার চেয়েও আরো অনেক বেশি নাম রয়েছে ছ ঘরের সঙ্কেতে। ছ ঘর দিয়েই তাই দিব্যি কাজ চলবে, এর চেয়ে সূক্ষ্ম ভাগবিভাগ অবান্তর।

বেশ ভালো নাম হয়েছে। এখানে মুখ্য নাম নেই, গৌণ নাম নেই। বিশেষিত নাম নেই, বস্তুবাচক নাম নেই। উপরন্তু ভাষার ঝামেলাও নেই, সারা পৃথিবীর মানুষ একই নাম ব্যবহার করতে পারেন। সংখ্যা দিয়ে রঙের নাম। দেশ-মহাদেশের গণ্ডি অতিক্রম করে সার্বজনীন নাম দেওয়ার এ ছাড়া আর উপায় ছিলো না।

কেমনে বুঝবে কী যে রঙ কার?
তা ভেবে কারণ নেই শঙ্কার।
কোন্ রঙ কারে কয়
দিতে তার পরিচয়
প্রয়োজন শুধু তিন সংখ্যার।

৩০ : রঙের ভালোমন্দ

পলাশ বরন পাল, শেখর গুহ

কোন রঙ ভালো, কোন রঙ খারাপ?

বলা বাহুল্য, এ প্রশ্নের কোনো উত্তর হয় না। আসলে প্রশ্নটার কোনো মানেই হয় না। গরমের দিনে কোন রঙের জামা পরা ভালো, বা মূর্তি বানানোর জন্য কোন রঙের মাটি নিলে ভালো হয় - এ সব জিজ্ঞেস করলে তার অর্থ হয়। কিন্তু প্রসঙ্গ প্রয়োজন বাদ দিয়ে রঙের আবার ভালোমন্দ কী? তবু মানুষ যে কী পরিমাণে রঙের ওপর অকারণ ভালো-খারাপের তকমা এঁটেছে, নানান সদগুণ-বদগুণ কল্পনা করেছে বিভিন্ন রঙের মধ্যে, তা ভাবলে তাজ্জব হয়ে যেতে হয়।

গৌরীপ্রসন্ন মজুমদারের লেখা অতিপরিচিত বাংলা গানে মেঘ, আঁধার আর কন্যার চুলের সঙ্গে সঙ্গে বিনোদিনীর কুলহানির কলঙ্ককে বলা হয়েছে কালো। কলঙ্ক নিঃসন্দেহে খারাপের পর্যায়ে পড়ে, তা বোঝানোর জন্য কালো রঙের প্রসঙ্গ। আবার অন্যদিকে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন,

> ক্ষীর সাদা, নবনী সাদা, সাদা মালাই রাবড়ি --
> তাহার অধিক সাদা তোমার পষ্ট ভাষার দাবড়ি।

স্পষ্ট কথার দাবড়ি খেতে কারুরই নিশ্চয়ই ভালো লাগে না। তবু স্পষ্ট ভাষায় সত্যি কথা বলাটা ভালো জিনিশ বলেই গণ্য করা হয়। তার জন্য সাদা রঙ।

কেন বাংলাতে ভালো জিনিশটাকে সাদা আর খারাপটাকে কালো বলে ধরা হয়? ইংরিজি অবশ্য এ বিষয়ে আরো এককাঠি এগিয়ে। ইংরিজি ভাষায় কালো বলতে বোঝায় অস্পষ্ট, নিরানন্দ, ভয়ঙ্কর, নিষ্ঠুর, ক্রূর, কুটিল, মলিন, অসাধু, অপরাধী। এছাড়াও, ব্ল্যাক আর্ট বা ব্ল্যাক ম্যাজিক বলতে অনিষ্টকর জাদু, ব্ল্যাক হার্টেড মানে ক্রূরহৃদয়, ব্ল্যাক-লেগ মানে ইতরব্যক্তি, ব্ল্যাকমেল মানে ভয় দেখিয়ে টাকা চাওয়া চিঠি, ব্ল্যাক-মার্কেট মানে চোরাকারবার আর ব্ল্যাক-শিপ মানে কুলাঙ্গার — এসব তো আছেই। আবার ইংরিজিতে সাদা মানে বিশুদ্ধ, নিরপরাধ, বিশ্বাসী, সৎ। 'হোয়াইট ম্যাজিক'

বলতে বোঝায় নির্দোষ জাদু, 'হোয়াইট-ওয়শ' মানে দোষ ঢাকার চেষ্টা, এমনকি 'হোয়াইট লাই' মানেও 'ক্ষতিহীন' মিথ্যা! পুরো ব্যাপারটার মধ্যেই সাদা রঙটার প্রতি বেশ খানিকটা নির্লজ্জ পক্ষপাতিত্ব হয়ে যাচ্ছে না কি?

● — ○ — ● — ○ — ●

মানুষের গায়ের রঙের কথাটাও ধরা যাক না কেন! কোত্থেকে যেন শ্বেতাঙ্গ মানুষদের মধ্যে ধারণা হয়ে গেলো যে কালো চামড়ার লোকেরা ঘৃণার পাত্র। তারপর থেকে আজ পর্যন্ত নানা ক্ষেত্রে নানা রূপে বর্ণবৈষম্যের বিষদাঁত নানা ভাবে আত্মপ্রকাশ করছে — এর কোনো শেষ আছে কিনা কে জানে!

অনুমান করা যেতে পারে, মানুষ যখন ছোটো ছোটো দলে জীবনযাপন করতো, তখন অন্য কোনো দলের মানুষ দেখলে তারা নিদেনপক্ষে অপ্রসন্ন হতো, হয়তো বা আতঙ্কিতও হতো। এই বোধ থেকে সেই অন্য রকম মানুষদেরকে অবাঞ্ছিত বা অসহ্য মনে হতো, সে কথাতেও আশ্চর্য কিছু নেই। কিন্তু এ দিয়ে বর্ণবৈষম্যের ব্যাখ্যা হয় না। সভ্যতা যখন রীতিমতো যাকে বলে বিকশিত, সেই সময়েও কৃষ্ণাঙ্গ মানুষদের দাস হয়ে জীবনধারণ করতে হয়েছে, পাশবিক অত্যাচার করা হয়েছে তাদের ওপর। মার্কিন দেশে দাস প্রথার বিলোপ ঘটেছে ১৮৬৫-তে, তাদের সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনের মাধ্যমে, কিন্তু তার পরেও কৃষ্ণাঙ্গদের অধিকার ছিলো খুবই সীমিত। বাসে-ট্রেনে-রেস্টুরেন্টে শ্বেতাঙ্গদের জন্য চিহ্নিত থাকতো আলাদা জায়গা, সেখানে অন্য রঙের মানুষ বসতে পারতো না। বসতে গেলে কী বিপত্তি হতো, তার চমৎকার বর্ণনা আছে স্বামী বিবেকানন্দের "পরিব্রাজক" গ্রন্থে :

> ক্ষিদেয় পেট জ্বলে যায়, খাবার দোকানে গেলুম, 'অমুক জিনিশটা দাও'; বললে 'নেই'। 'ঐ যে রয়েচে'। 'ওহে বাপু সাদা ভাষা হচ্চে, তোমার এখানে বসে খাবার জায়গা নেই!' 'কেন হে বাপু?' 'তোমার সঙ্গে যে খাবে, তার জাত যাবে।'

এই অবস্থা চলেছিলো ১৯৬০-এর দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত, তার পরে বিশাল আন্দোলন করে কৃষ্ণাঙ্গরা সমানাধিকার লাভ করে। দক্ষিণ আফ্রিকায় তো কালো মানুষেরা সমানাধিকার লাভ করলো এই কিছুদিন মাত্র আগে, ১৯৯০ খ্রিষ্টাব্দে! এখন আইনের চোখে সবাই সমান, কিন্তু মন অতো তাড়াতাড়ি বদলায় না, সমাজের এই ব্যাধি তাই নির্মূল হয়নি। ২০০৮ খ্রিষ্টাব্দে মার্কিন মুলুকে সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্বেতাঙ্গরা কৃষ্ণাঙ্গ বারাক ওবামাকে রাষ্ট্রপতির পদে নির্বাচিত করে দেখিয়েছে যে সেদেশে বর্ণবৈষম্য একেবারে নিশ্চিহ্ন না হলেও নিশ্চিতভাবে পড়তির দিকে।

নৃতত্ত্বের বিচারে শ্বেতাঙ্গ এবং কৃষ্ণাঙ্গ যাদের বলা হয়, আমাদের দেশে তাদের সংখ্যা খুবই নগণ্য। তাই আমাদের দেশে বর্ণবৈষম্য থাকবে না, এটাই প্রত্যাশিত ছিলো।

কিন্তু তা নয়, আমাদের দেশে এই ব্যাধি বিকশিত হয়েছে আরো সূক্ষ্ম এক রূপে। গায়ের চামড়ার রঙের আরো সূক্ষ্ম তারতম্যের ভিত্তিতে কেউ 'ফর্সা' এবং কেউ 'কালো' বলে চিহ্নিত হয়ে যায়, এবং এই বিভাগকে সৌন্দর্যের অঙ্গ বলে বিবেচনা করা হয়। এর জন্য নানা সামাজিক অবমাননার শিকার হতে হয় কালোদের। কালো মেয়ের বিয়ে দেওয়া নিয়ে অভিভাবকদের কী রকম দুশ্চিন্তা ও অসুবিধার মুখোমুখি হতে হতো এবং হয়, তার কিছু কিছু উদাহরণ সম্ভবত সকলেরই জানা আছে।

কেন কবে কীভাবে এই মনোভাব শিকড় গাড়লো আমাদের সমাজে, তার পরিষ্কার কোনো ইতিহাস দুর্লভ। কাউকে কাউকে বলতে শুনেছি, আর্যরা যখন আমাদের দেশে এসেছিলো, তখনই নাকি এই বিভেদের উৎপত্তি। আদতে ব্যাপারটা ছিলো গোষ্ঠীবিভেদ — আর্যদের তুলনায় ভারতভূমির আদি বাসিন্দাদের গায়ের রঙ গাঢ় ছিলো বলে কোনো দলই অন্য রঙের মানুষ পছন্দ করতো না। আর্যদের প্রাধান্য যতো বিস্তৃত হয়েছে, ততোই তাদের মনোভাবটাই সমাজের সর্বস্তরে গৃহীত হয়েছে, ফর্সা-কালো নির্বিশেষে সকলেই ক্রমশ কালোদেরকে অসুন্দর ভাবতে শুরু করেছে।

অনুমান হিসেবে এটা মন্দ নয়, কিন্তু এটা প্রমাণ করা সহজ নয়। কালোদেরকে অসুন্দর ভাবাটা যদি সামাজিকভাবে স্বীকৃত হয়ে গিয়ে থাকে, তাহলে সংস্কৃত সাহিত্যে সে মনোভাব প্রকাশ পাওয়ার কথা। কাউকে কালো বলা হয়নি তা নয়, হয়েছে মহাভারতে কৃষ্ণ যেমন, দ্রৌপদী যেমন। কিন্তু কালোকে কালো বললে তো বর্ণবৈষম্য হয় না, "কালো অতএব খারাপ" বা "কালো অতএব অসুন্দর" বলাটাই হলো বৈষম্যবোধের ইঙ্গিত। সে রকম ইঙ্গিত কৃষ্ণ বা দ্রৌপদীর সম্বন্ধে কোথাও করা হয়নি, বরং উল্টোটাই দেখা যায় — শ্যামাঙ্গী দ্রৌপদী সর্বশ্রেষ্ঠা সুন্দরীরূপে বর্ণিত। কালিদাস আদর্শ নারী-সৌন্দর্যের বর্ণনা দিয়েছেন তন্বী, 'শ্যামা', শিখরিদশনা ইত্যাদি বলে। সর্বগুণান্বিত আদর্শ পুরুষ রামচন্দ্রের রূপ প্রিয়দর্শন এবং বর্ণ শ্যামল বলা হয়েছে, হেমচন্দ্র ভট্টাচার্যের অনুবাদ করা বাল্মীকি রামায়ণের প্রথম পাতাতেই। রামায়ণে বিভিন্ন অনার্য গোষ্ঠীকে বানর রাক্ষস ইত্যাদি নামে অভিহিত করা হয়েছে। সেটা কটাক্ষ হতে পারে, কিন্তু কটাক্ষের হেতু গায়ের রঙ কিনা, তা স্পষ্ট করে বলা নেই। কেউ কালো বলেই অসুন্দর বা ফর্সা বলেই সুন্দর, এ রকম বর্ণনা প্রাচীন সাহিত্যে কোথাও পড়েছি বলে মনে পড়ছে না।

এ সবের বহু শতাব্দী পরেও, এখন থেকে কয়েকশো বছর আগে লেখা বাংলার কবি চণ্ডীদাসের কাব্যেও নায়িকার রূপবর্ণনা পাচ্ছি এই ভাবে :

নয়ানের কাজল বয়ানে লেগেছে
কালোর উপরে কালো।

প্রভাতে উঠিয়া ও মুখ দেখিনু
দিন যাবে মম ভালো।

কালো মুখের ওপর কালো কাজলের সৌন্দর্য — হয় চণ্ডীদাস ব্যতিক্রমী ভাবনার অধিকারী ছিলেন, নয়তো তাঁর সময়েও ফর্সা-কালোর বাতিক সমাজে এতোটা গভীর হয়নি।

ইংরেজরা আসার খানিক পরে এ অবস্থা যে ছিলো না, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। শাসকের গায়ের রঙই সুন্দর, অন্য রঙ কুৎসিত, এ বোধ সমাজের সর্বস্তরে ছেয়ে গেলো। শরৎচন্দ্রের "অরক্ষণীয়া" উপন্যাসে মেয়ের মায়ের হাহাকারের ভাষা এই রকম :

তাই বলি, ভগবান! হতভাগীকে আমার কোলেই যদি পাঠালে, রংটা একটু ফরসা করেই পাঠালে না কেন? কালো ব'লে কেউ যে ওকে আশ্রয় দিতেই চায় না! সবাই যে চায় সুন্দরী মেয়ে।

সৌন্দর্যের যেন আর কোনো মাপকাঠি নেই, শুধু গায়ের রঙ দিয়েই নির্ধারিত হয় কে সুন্দর কে অসুন্দর। এই মনোভাব এমনই ছড়িয়ে পড়লো যে শেষ পর্যন্ত তারাশঙ্কর তাঁর 'কবি' উপন্যাসের নায়কের মুখ দিয়ে বলালেন :

কালো যদি মন্দ তবে
কেশ পাকিলে কান্দো কেনে?

অরণ্যে রোদন — এ প্রশ্নের উত্তর দিতে কেউ উৎসাহী নয়। যাদের গায়ের চামড়ার রঙ গাঢ়, তাদের এখনো নানা রকমের সামাজিক অবমাননার মুখোমুখি হতে হয়। এখনকার শহুরে গুরুজনেরা হয়তো শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের মায়ের মতো ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেন না, তবে তাঁরা মেয়েদের ফর্সা হওয়ার ক্রিম মাখতে বলেন। মেয়েদের আর্থিক স্বাধীনতা অনেক বেড়ে গেছে বলে তাদের অরক্ষণীয়া হয়ে থাকার সমস্যা শহরাঞ্চলে অনেক কমেছে, কিন্তু সৌন্দর্যের সঙ্গে গায়ের রঙের সম্পর্ক বেড়েছে বই কমেনি। গায়ের রঙ শ্যামলা বলে টেলিভিশনে চাকরি পাচ্ছে না কেউ, বা বিমানসেবিকার কাজ পাচ্ছে না, এ রকম অভিযোগ প্রায়ই শোনা যায় আমাদের দেশে।

অদৃষ্টের পরিহাসে আবার সাদা চামড়ার মানুষদের মধ্যে গায়ের রঙ কালো করবার রেওয়াজ চালু হয়েছে কয়েক দশক ধরে। যাদের গায়ের রঙ একেবারে ফ্যাটফ্যাটে সাদা, তাদের অনেকেই সারাদিন রোদ পুইয়ে ট্যানিং করে অথবা দোকানে গিয়ে অতিবেগুনি রশ্মিতে গা পুড়িয়ে নিজেদের একটু তামাটে বা কালচে করে তুলতে বদ্ধপরিকর। বিশেষজ্ঞরা বারবার সাবধান করে দিচ্ছেন যে অতিমাত্রায় অতিবেগুনি রশ্মি শরীরের পক্ষে খুবই ক্ষতিকর — কিন্তু কে শোনে কার কথা?

● — ○ — ● — ○ — ●

সাদা-কালো ছাড়া অন্য রঙ দিয়ে মনের নানা ভাব বা অবস্থা বোঝানোর আয়োজন আছে, হয়তো বা পৃথিবীর সব ভাষাতেই। এর মধ্যে কিছু কিছু প্রয়োগ খানিকটা আক্ষরিক অর্থেই হয়। যেমন, লজ্জা পাওয়ার বর্ণনা দিতে গিয়ে বলা হয় কারুর 'মুখ লাল হয়ে গেলো' -- সত্যি সত্যি তেমন লজ্জা পেলে মুখে লাল আভা দেখা দেয় বলেই। আবার, সবুজ রঙটিকে ব্যবহার করা হয় অপরিপক্ব বা অপরিণত মনের প্রতীক হিসেবে। এখানে রঙের ব্যবহার আক্ষরিক নয়, আলঙ্কারিক, তবে এই যোগাযোগের কারণ নির্ণয় করাটা খুব শক্ত নয় অনেক ফল কাঁচা অবস্থায় সবুজ থাকে, পরে পেকে গেলে অন্য রঙের হয়ে যায়। তাই 'সবুজ'-'কাঁচা'-'অবুঝ', এই সব শব্দই প্রায় সমার্থক হয়ে ওঠে রবীন্দ্রনাথের "বলাকা" কাব্যগ্রন্থের প্রথম কবিতায় :

ওরে নবীন, ওরে আমার কাঁচা
ওরে সবুজ, ওরে অবুঝ,
আধমরাদের ঘা মেরে তুই বাঁচা।

তেমনি, মনে কোনো একটা সুন্দর ভাব এলে আমরা বলি 'মনে রঙ লেগেছে', এ রকম প্রকাশও শুধু বাংলা ভাষাতেই সীমাবদ্ধ নয়। এর থেকে আরো এক ধাপ এগিয়ে কাজী নজরুল লিখেছিলেন, "মনের রঙ লেগেছে / বনের পলাশ জবা অশোকে।" অর্থাৎ মনের রঙ দিয়েই যেন বিশ্বের রঙ। রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, "আমারই চেতনার রঙে পান্না হল সবুজ, / চুনি উঠল রাঙা হয়ে।"

সবুজ বলতে এখন পরিবেশ-সচেতনতাও বোঝায়। ১৯৮০-র দশকে ইউরোপের নানা দেশে 'গ্রীন পার্টি' বা 'সবুজ দল' রাজনৈতিক সাফল্য পেতে শুরু করেছিলো — পরিবেশের উন্নতি ছিলো তাদের মুখ্য উদ্দেশ্য। পরিবেশ দূষিত হলে গাছপালার বারোটা বেজে যাবে, আর উদ্ভিদ জগতে প্রধান রঙটাই সবুজ, সে বোধ থেকেই পরিবেশের সঙ্গে জড়িত হয়েছে এই রঙ।

এ ছাড়াও অবশ্য নানা ভাবে রঙের সঙ্গে মনের ভাবের যোগাযোগ কল্পনা করা হয়েছে। তার প্রায় কোনো ক্ষেত্রেই যোগাযোগের কারণটি স্পষ্ট নয়। যেমন ধরা যাক ইংরিজিতে মনের দুঃখের রঙ নীল -- তাই এক ধরণের দুঃখের সঙ্গীতের নামই 'ব্লু-স'। 'ওথেলো' নাটকে শেক্সপিয়ার লিখেছেন ঈর্ষা হলো এক সবুজ-চোখো দানব -- তার পর থেকে ঈর্ষা বা পরশ্রীকাতরতার রঙই সবুজ বলে গণ্য করা হয়ে থাকে।

• — ○ — • — ○ — •

রঙ নিয়ে কল্পনার আর এক রকম রূপ আছে। কখনো আত্মপরিচয় প্রচারের জন্য, কখনো আত্মবিশ্বাস অর্জনের জন্য মানুষ বিশেষ কোনো রঙকে আশ্রয় করেছে। কোনো কোনো গোষ্ঠী বা জাতি-উপজাতির প্রতীক হয়ে গেছে একটি রঙ। কার কোন রঙ, তার পেছনে কোনো কার্য-কারণ সম্পর্কও অনেক সময়ে নেই।

ইসলাম ধর্মের রঙ যেমন সবুজ। কেন সবুজ, কেন অন্য কোনো রঙ নয়? কেউ কেউ বলেন, ওই ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা হজরৎ মহম্মদের পতাকা নাকি সবুজ রঙের ছিলো, তাই থেকেই নাকি সবুজের এমন কদর। হতে পারে, তবে এতে নতুন একটি প্রশ্ন মনে জাগে — হজরৎ মহম্মদের পতাকা সবুজ হওয়ার পেছনে কি কোনো বিশেষ কারণ ছিলো? ইসলাম ধর্মের জন্ম হয়েছিলো আরবের বিস্তীর্ণ মরু অঞ্চলে, যেখানে গাছপালার বড়োই অভাব। সবুজ গাছের প্রতি আকুলতা থেকেই কি ইসলামের কাছে সবুজ রঙ পবিত্র বলে বিবেচিত হয়েছে?

উল্টোদিকে, অপেক্ষাকৃত উর্বর ও সবুজ ভৌগোলিক পটভূমিকা থেকে উত্থান হয়েছিলো বলেই কি রুক্ষ মাটির গেরুয়া রঙটিকে হিন্দুধর্মে বৈরাগ্যের চিহ্ন হিসেবে ধরা হয়? তাই কি হিন্দু সাধুদের পোশাক সাধারণত হলদেটে কমলা বা গেরুয়া রঙের? বৌদ্ধ আর শিখ ধর্মে সাধুদের পোশাকের এই একই রঙ।

গেরুয়া রঙ সংসারত্যাগী সাধুদের প্রতীক বলে সংসারী হিন্দুদের ওই রঙের কাপড় পরার নিয়মই নেই। জৈনধর্মে সাধুদের পোশাক সাদা, তাঁরা শ্বেতাম্বর নামে পরিচিত। খ্রিস্টধর্মে, বিশেষ করে ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের যাজকদের লাল পোশাক পরার প্রথা চালু আছে, সম্ভবত তার কারণ সে ধর্মে বলা হয় যীশু তাঁর রক্তদান করেছিলেন মানুষের পরিত্রাণের জন্য।

হিন্দু, বৌদ্ধ, ইসলাম, শিখ, কনফুশীয় ইত্যাদি ধর্মমতে বিয়ের সময় মেয়েরা নানারঙের ঝলমলে পোশাক পরে, কিন্তু খ্রিস্টধর্মে মেয়েদের বিয়ের পোশাকের রঙ একেবারে ধবধবে সাদা · সেটা তাদের পবিত্রতার প্রতীক। খ্রিস্টানরা শোকপ্রকাশ করে কালো পোশাক পরে — আর শোক দেখানোর জন্য কেবল সাদা কাপড় পরার কড়া সামাজিক রীতি হিন্দু বিধবাদের অনেকেই এখনো মেনে চলেন।

মার্কিনদেশে অতি অল্পবয়েস থেকে শুরু করে বাচ্চা ছেলে ও মেয়েদের আলাদা করার জন্য ওদের পরানো হয় যথাক্রমে নীল ও গোলাপি পোশাক। মেয়েরা তবু কখনো কখনো হয়তো নীল কিছু পরতেও পারে, কিন্তু ছেলেদের বেলায় গোলাপি রঙ একেবারে নৈব নৈব চ। এ প্রথাটা অবশ্য কেবল মার্কিন দেশ এবং মার্কিন সংস্কৃতি প্রভাবিত দেশগুলোতেই চালু। মার্কিন দেশেও এ প্রথাটা শুরু হয়েছে ১৯৫০-এর দশক থেকে – তার আগে সর্বসাধারণের অবস্থা খুব একটা ভালো ছিলো না বলে বাচ্চাদের নিয়ে তেমন আদিখ্যেতাও করা হতো না।

● — ○ — ● — ○ — ●

নিজের দেশের পতাকায় কে আর খারাপ রঙ দিতে চাইবে? তাই কোন দেশে কোন রঙ 'ভালো' বলে গণ্য করা হয় সেটা অনেক সময়েই সে দেশের পতাকার রঙ থেকে আঁচ করা যায়। বিভিন্ন দেশের পতাকায় যে সব রঙ দেখা যায়, তাদের পেছনেও নানা

কারণ অথবা জনশ্রুতি থাকে। সেগুলি অবশ্য সব সময়ে যে পুরোপুরি সঙ্গতিপূর্ণ হয় তা নয়।

ভারতবর্ষের পতাকায় এখন যে রঙগুলি রয়েছে সেগুলি নিয়ে পতাকাটার নকশা প্রথম তৈরি করেন পিঙ্গালি বেঙ্কাইয়া নামে অন্ধ্রপ্রদেশের এক কৃষিবিশেষজ্ঞ ও স্বাধীনতা-সংগ্রামী। ১৯৩১ সালে করাচী অধিবেশনে ওই পতাকাটি কংগ্রেস দলের প্রতীক বলে স্বীকৃত হয়েছিলো, যদিও তখন সাদা রঙের মাঝখানে অশোকচক্র ছিলো না, ছিলো একটি চরকার ছবি। তখন বেঙ্কাইয়া বলেছিলেন পতাকার কমলা বা গেরুয়া অংশটি বোঝায় বীর্য, সাদা অংশটি বোঝায় সত্য ও শান্তি, আর সবুজ অংশটি ধর্মবিশ্বাস ও ঐশ্বর্যের প্রতীক। ১৯৪৭ সালে স্বাধীন ভারতের পতাকাতেও ওই রঙগুলিই রাখা হলো। ভারতের দ্বিতীয় রাষ্ট্রপতি সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন রঙগুলির মানে একটু পাল্টে লিখলেন গেরুয়া রঙটা বোঝায় ত্যাগ ও তিতিক্ষা, সাদা রঙটা হলো দেশকে সত্যের পথে পরিচালিত করার আলো আর সবুজ অংশটি বোঝায় ভূমি ও উদ্ভিদ জগৎ -- যার ওপর সব প্রাণীই নির্ভর করে। পিঙ্গালি বেঙ্কাইয়া নাকি তিরিশটি দেশের পতাকা নিয়ে পড়াশোনা করে ওই রঙগুলি পছন্দ করেন। আয়ারল্যান্ডের পতাকায় কমলা, সাদা আর সবুজ রঙ তিনটি ভারতের পতাকার রঙগুলির খুব কাছাকাছি। আয়ারল্যান্ড ও ভারত দুটো দেশেই বৃটিশ শাসন থেকে মুক্তির সংগ্রাম চলছিলো, সেটাও ওই রঙগুলি বাছার কারণ হতে পারে বলে অনেকে মনে করেন। আয়ারল্যান্ডের পতাকার সবুজ অংশটি ক্যাথলিক সম্প্রদায়, কমলা অংশটি প্রোটেস্টান্ট সম্প্রদায় ও সাদা অংশটি তাদের মধ্যে মৈত্রীর সূচক। এরকম অনেক দেশের পতাকা দেখে সেখানকার বেশিরভাগ মানুষের ধর্ম কী তা বোঝা যায় -- যেমন মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ অনেক দেশের পতাকাতে ইসলামের প্রতীক সবুজ রঙটা থাকে। ইন্দোনেশিয়া দেশটি অবশ্য এ নিয়মের ব্যতিক্রম — মুসলিম জনসংখ্যার দিক থেকে এ দেশ পৃথিবীর এক নম্বর, অথচ সে দেশের পতাকায় কোনো সবুজ রঙ নেই। সুইৎজারল্যান্ড, ডেনমার্ক ইত্যাদি বিভিন্ন দেশের পতাকায় দেখা যায় খ্রিস্টধর্মের প্রতীক ক্রুশচিহ্ন কিন্তু নানা দেশে সেটা নানা রঙের হয়।

ধর্মবিশ্বাস ছাড়া রাজনৈতিক বিশ্বাসেরও নিজস্ব রঙ থাকে অনেক ক্ষেত্রে। যে সব দেশে কমিউনিস্ট সরকার, তাদের প্রায় সবারই পতাকার জমিটা লাল রঙের হয়। লাল রঙ বিপ্লবের প্রতীক -- রক্তক্ষয়ী বিপ্লবের মাধ্যমে সামাজিক সাম্য অর্জিত হয় বলেই বোধহয়। এককালে যখন সোভিয়েত ইউনিয়ন ছিলো তখন তাদের পতাকায় ছিলো এই রঙ। এখনো চীন, ভিয়েতনাম প্রভৃতি কমিউনিস্ট দেশের পতাকায় লাল রঙই প্রায় সবটা জায়গা জুড়ে থাকে। সঙ্গে যা থাকে, তার রঙের কারণ অবশ্য অতোটা সুবোধ্য হয় না সব সময়ে। যেমন, চীনের পতাকায় পাঁচটি তারা থাকে -- তাদের কী তাৎপর্য, আর সেগুলির রঙই বা সোনালি কেন তা নিয়ে নানা মত আছে। একটা মত হলো, তারাগুলি সোনালি রঙের কেননা লালের ওপর ওই রঙটা বেশ ভালো দেখায়।